

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

একাদশিতম বর্ষ । প্রথম সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার



বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

২৪০/১, আচার্য্য ঞ্জল্লল্ল রোড

কলিকাতা-৬

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ
কলিকাতা—৭০০০০৯

স্মারক গ্রন্থ

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৭৫তম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে পঠিত মূল্যবান প্রবন্ধাবলী এবং বিগত ৭৫ বৎসরের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বঙ্গালার চিরস্মরণীয় মনীষী ও লেখকদের হৃৎপ্রাপ্য গবেষণামূলক প্রবন্ধসমূহের নির্বাচিত সংকলন।

বঙ্গালার “ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, প্রাচীন সাহিত্য, গ্রাম্য-সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে যে সকল নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত” হইয়া পরিষৎ-পত্রিকার প্রকাশিত হইয়াছিল সেগুলির পরিচর্য কোতূহলী পাঠক ও অনুসন্ধিৎসু গবেষক এই গ্রন্থে পাইবেন।

পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ, শোভন বাঁধাই, উৎকৃষ্ট কাগজ।

মূল্য পনের টাকা।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

একাদশীতিতম বর্ষ ॥ প্রথম সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার



বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

২৪৩/১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৬

ভা র ত কো ষ

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বিশ্বকোষ বা Encyclopaedia এন্সাইক্লোপিডিয়া

পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ। সুদৃশ্য বাঁধাই। সম্পূর্ণ সেট এক শত টাকা।

ভি. পি. খরচ সহ অগ্রিম পাঠাইলে ডাকযোগে প্রেরণ করা হয়। অন্যান্য ১০ খণ্ড
লইলে গ্রন্থ-বিক্রেতাদের ১০% কমিশন দেওয়া হয়।

পরিষদ প্রকাশিত প্রামাণ্য সংস্করণ

বৌদ্ধগান ও দোহা, চণ্ডীদাসের পদাবলী, রাধামোহন-গ্রন্থাবলী, মধুসূদন-গ্রন্থাবলী,
বঙ্কিম-গ্রন্থাবলী, দীনবন্ধু-গ্রন্থাবলী, হেমচন্দ্র-গ্রন্থাবলী, নবীনচন্দ্র-রচনাবলী, ভারতচন্দ্র-
গ্রন্থাবলী, অক্ষয়কুমার বড়াল-গ্রন্থাবলী, রামেন্দ্রসুন্দর-রচনাবলী, রামেশ্বর-রচনাবলী,
বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর-গ্রন্থাবলী, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী, শরৎকুমারী
চৌধুরাণী রচনাবলী

প্রতি গৃহ ও গ্রন্থাগারে রক্ষণীয় ॥

সাহিত্য-সামগ্রিক-চরিত্রমালা

১ম হইতে ১১শ খণ্ড

সাহিত্যিক-জীবনী ও প্রামাণ্য গ্রন্থসূচী

মূল্য : ১২৫'০০

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

২৪৩/১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,

কলিকাতা-৬

ফোন : ৩৫-৩৭৪৩

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

৮১ বর্ষ । প্রথম সংখ্যা ।

সূচীপত্র

Eighty-Second Foundation Day Celebrations of the Bangiya Sahitya Parisad Governor's Address.....Sri Anthony Lancelot Dias	১
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৮২তম প্রতিষ্ঠাদিবসে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণ (অনুবাদ—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়)	৬
মোহিতলাল মজুমদারের একটি অপ্রকাশিত কবিতা	১০
‘প্রকৃতিভির্লক্ষ্যাঃ করং গ্রাহিতঃ’—শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার	১৪
অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারত—শ্রীকালীকিঙ্কর দত্ত	১৯
লিপির উৎপত্তি ও বর্ণমালার বিকাশ—শ্রীমদনমোহন কুমার	৩১
পরিষৎ-সংবাদ	৫২
শুভ সংবাদ	৬৯

ক্ৰোড়পত্র

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৮২তম প্রতিষ্ঠাদিবসে সভাপতির অভিভাষণ—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	১
৮১তম বার্ষিক কার্যবিবরণ	১১
আলোকচিত্র :—দিমিত্রিঅস্ গালানস্ (১৭৬০-১৮৩৩), বঙ্গদেশ তথা ভারতে আগত প্রথম গ্রীক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত	

বাঙলা সাহিত্যের আলোচনা

অধ্যাপক শ্রীমদনমোহন কুমার প্রণীত
পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ

চর্যাপদ ; শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ; চণ্ডীদাস-সমগ্র ; বৈষ্ণব পদাবলী ; শাক্ত পদাবলী ;
রোম্যান্টিসিজম্ ; মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে মুসলমান কবিদের দান ; বাঙলা গল্পের
উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ; বাঙলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস ; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল
মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র দত্ত, হেমচন্দ্র, বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল,
শরৎচন্দ্র প্রমুখের সাহিত্যকৃতির আলোচনা ও বিশ্লেষণ ॥

ডবল ডিমাই ১০ পেজী, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৭২ ।

মূল্য দশ টাকা পঞ্চাশ পরস। বোর্ড বাঁধাই ।

দাশমুগু এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ

৫৪/৩ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-২

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

পৃষ্ঠপোষক

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল

শ্রীআর্কট লাললট্ ডিলাস্

বাক্সব

রাজা শ্রীনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর

সভাপতি

জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

সহ-সভাপতি

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ শ্রীকালীকঙ্কর সেনগুপ্ত

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীকুমারেশ ঘোষ

সম্পাদক

শ্রীমদনমোহন কুমার

সহকারী সম্পাদক

শ্রীহারাদন দত্ত শ্রীসুধীরকুমার নন্দী

কোষাধ্যক্ষ : শ্রীবিমলেন্দুনারায়ণ রায়

পত্রিকাধ্যক্ষ : শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

পুষ্টিশালাধ্যক্ষ : শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী

চিত্রশালাধ্যক্ষ : শ্রীকমলকুমার ঘটক

গ্রন্থশালাধ্যক্ষ : শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ

কার্যনির্বাহক-সমিতির সদস্য

- ১। শ্রীঅধীর দে ২। শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৩। শ্রীকানাইচন্দ্র পাল
৪। শ্রীকামিনীকুমার রায় ৫। শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র ৬। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
৭। শ্রীচণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় ৮। শ্রীজটিলকুমার মুখোপাধ্যায় ৯। শ্রীজীবনকৃষ্ণ শেঠ
১০। শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ ১১। শ্রীজ্ঞানশঙ্কর সিংহ ১২। শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়
১৩। শ্রীধীরাঙ্গ বসু ১৪। শ্রীমনসুর আলি সিদ্দিকী ১৫। শ্রীমণীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়
১৬। শ্রীমনোমোহন ঘোষ ১৭। শ্রীশিবদাস চৌধুরী ১৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়
১৯। শ্রীসুধাকান্ত দে ২০। শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

শাখা-পরিষদের প্রতিনিধি

শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন (নৈহাটি শাখা) শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য (নবদ্বীপ শাখা)

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত নাগ (বিষ্ণুপুর শাখা) শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহ রায় (কৃষ্ণনগর শাখা)



GOVERNOR OF WEST BENGAL

82ND FOUNDATION DAY CELEBRATIONS OF THE
BANGIYA SAHITYA PARISAD ON 25TH JULY, 1974.

GOVERNOR'S ADDRESS

National Professor Dr. Suniti Kumar Chatterji, Dr. Mazumdar, Minister for Education, the Vice-Chancellor, Professor Coomer, distinguished guests and friends,

I am indeed proud to have the distinction of being invited as Chief Guest to the 82nd Foundation Day Celebrations of the Bangiya Sahitya Parisad. The Parisad has been a temple of learning at which many Bengali scholars, poets, writers and savants have selflessly served in the course of the last eight eventful decades. Most of the eminent persons who were connected with this institution from its very inception are no longer with us, but their hallowed memory is still enshrined in the Bangiya Sahitya Parisad. We are fortunate that we still have amongst us eminent scholars like Dr. Suniti Kumar Chatterjee and Dr. Ramesh Chandra Mazumdar who are, in a sense, contemporaneous with the Parisad and who, in spite of their age, have shown a tremendous energy and still take exemplary interest in the development and welfare of this institution.

While expressing my sincere thanks to Dr. Chatterjee and his colleagues of the Parisad for kindly inviting me to this evening's function I feel somewhat embarrassed in not being able to speak to you in the rich and beautiful language, the cause of which has all along been upheld by this Academy. I crave your indulgence therefore for addressing you in English.

Dr. Mazumder and Dr. Chatterjee who have preceded me this evening have dwelt on various aspects of the Parisad's history and of its unique position in the life and letters of Modern Bengal. The first part of a publication on the history of the Parisad by Professor Madan Mohan Coomer has just been released. I have the opportunity of glancing through it, and with the help of my Secretary am able to get a gist of that very fascinating history of this Academy, and I do hope that it won't be long before the next two volumes of this history are published. I have little to add to the deliberations of this evening and shall therefore confine myself to what I consider to be some of the immediate and important tasks before the Parisad.

The Parisad has always stood as a symbol of self-help and self-reliance among our people in so far as our literary and linguistic heritage is concerned. Great men and women in literary and cultural fields came together in the past to build this temple of learning. Many are the illustrious names which have been closely associated with this Academy—men like Rabindranath Tagore, Binoy Krishna Deb of Sobhabazar, Ramesh Chandra Dutt, Ramendra Sunder Trivedi, Jyotirindra Nath Tagore, Gaganendra Nath Tagore, Satyendra Nath Tagore, Rajani Kanta Gupta and Hirendra Nath Dutt, to name only a few among those who had sustained and nourished this centre of learning and research in its early days of struggle and difficulty. One cannot also forget the munificent donations in the form of land and money by eminent patrons of learning like Maharaja Manindra Chandra Nandy of Cossimbazar, Raja Jogindra Narayan Roy of Lalgola, Rai Srinath Pal of Murshidabad, Prafulla Nath Tagore, Maharaja Sayaji Rao Gaekwad of Baroda and a host of others who made it possible for the Parisad to have its own building at the present site and also an annexe called "Ramesh Bhavan" dedicated to the memory of its President Ramesh Chandra Dutt.

Those were days of challenge and the pioneers had to work against heavy odds but what sustained them more than anything else was public support and sympathy. It is unfortunate that in more recent times general apathy, neglect and indifference have taken a heavy toll on the Parisad and its activities. The work of the Parisad and its precious and unique collections is truly a national trust and there is no reason why Government, at the Central and State levels, should not provide adequate funds to enable the Parisad

to conduct its affairs in a manner befitting its heritage and its tradition. Equally, it is the responsibility of the people of Bengal to come to the aid of the Parisad not only financially but also by taking keener interest in its activities. The landed gentry is no longer in a position to contribute handsomely as in the past but new classes have taken their place and it is from commerce, industry and agriculture that financial assistance can justifiably be expected.

The activities of the Parisad cover many aspects of our language, literature and culture as I was able to see for myself in the short time that I was able to go round some of the exhibition rooms. You have a priceless collection. At the same time, I must say that I was depressed and saddened to find that so many precious exhibits, so many precious manuscripts, so many precious documents have no proper place in which they can be housed, that they are exposed therefore to ravages of time and climate and that there is a paramount need therefore for Government, for the public of Bengal, for the Parisad to get together and see how quick the development of the Parisad can be fostered and, above all, how best the rare collection of very old manuscripts can be preserved. The library of the Parisad which contains many rare volumes has been enriched from time to time by the addition of the personal collection of eminent persons like Iswar Chandra Vidyasagar, Ramesh Chandra Dutt, Satyendra Nath Dutt, Binoy Krishna Deb and Satyendra Nath Tagore. The manuscript museum has a rare collection of very old manuscripts in Sanskrit and Bengali. Its museum contains old coins, stone and metallic statues, copper edicts, armour of ancient times, manuscripts etc. There is need, in my opinion, for special arrangements to be made for the security of the Parisad's valuable collection. I have no doubt that the Parisad has maintained an up to date and scientifically classified inventory of all its possessions and that periodically a physical verification is done.

The Boston Museum has been extremely gracious in returning an exhibit which was stolen from the Parisad's collection to which Dr. Chatterji has just referred and told you such a fascinating story of how the Bronze, which originally was here, has now been recovered and will soon be sent to Calcutta and find its place home here. But by and large this clandestine trade in precious art objects has become an unscrupulous and ruthless operation. Therefore,

I particularly would like to caution the Parisad and its custodians to take appropriate steps to guard against pilferage and theft. There is some urgency in creating a strong public opinion against vandals and all those who steal from Museums and temples objects of great historical, sentimental or religious value. There may be need to amend the existing law with a view to mete out draconic punishment on those who acquire illegally objects of art of great historical value or who attempt to smuggle them out of the country.

After independence the Central Government has set up institutions like Sahitya Akademi, Lalit Kala Akademi and National Book Trust of India with a view to encouraging creative talent among our writers and artistes. Following this lead many of the State Governments have also set up similar akademis to serve the cause of literature and fine arts of the States concerned. These are certainly attempts in the right direction. It is however needless to point out that the proper development of art and literature requires an atmosphere free from official interference as much as possible. It is in this context that the role of Bangiya Sahitya Parisad has assumed much more importance in the post-independence period. I have no doubt that under its present leadership the Parisad will play its due role in this regard with distinction. If the Parisad with its long and glorious tradition displays in its work the spirit of change, the spirit of renewal and the spirit of revitalisation in keeping with the requirements of the present day, I am sure, its future will be even more glorious than its past.

I thank you, friends, for listening to me so patiently and once again I convey my best wishes to the President and office-bearers of the Parisad — I would specially name its energetic Secretary Professor Madan Mohan Coomer—for the very determined and concerted efforts that have been made to, shall I say, get this ancient institution a face-lift and their attempts at rejuvenating this time-honoured institution. I conclude with an extract from a letter written by Friedrich Max Muller to this Academy in 1893 : “You have plenty of work before you, and I hope you may persevere in your patriotic efforts. I call them patriotic, because all that helps to give a people a knowledge of and a pride in their history, strengthens their patriotism and places it on a true foundation”.

Finally, as a very small token of my appreciation of the excellent work that the Parisad is doing, I would like to announce, on this occasion today, a very small donation from the Governor's Fund, a sum of Rupees Ten thousand, which I would like to be devoted solely to the purchase of suitable equipment and other items of furniture that may be required to house and preserve the precious collection of documents and manuscripts.

JAI HIND.

A. L. DIAS

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৮২-তম প্রতিষ্ঠা-দিবস

মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণ

[অনুবাদ]

জাতীয় অধ্যাপক ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর মজুমদার, শিক্ষামন্ত্রী, উপাচার্য, অধ্যাপক কুমার, বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ ও বন্ধুগণ,

আজ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৮২-তম প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রধান অতিথিরূপে আমন্ত্রণ ক'রে আপনারা আমাকে গৌরবান্বিত ক'রেছেন। পরিষৎ দীর্ঘকাল ধরে জ্ঞানসাধনার একটি মন্দির। এই সারস্বত-মন্দিরে বিগত আট দশকে বহু বাঙালী লেখক, কবি, মনীষী এবং জ্ঞানতপস্বী নিঃস্বার্থভাবে বাণীর সেবা ক'রে গিয়েছেন। এর প্রতিষ্ঠাকাল থেকে যে-সব প্রখ্যাত ব্যক্তি এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের অনেকেই আজ আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু তাঁদের পুণ্য স্মৃতি আজও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্তরে দীপ্যমান। সৌভাগ্যবশতঃ এখনও আমাদের মধ্যে আচার্য্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং আচার্য্য রমেশচন্দ্র মজুমদারের মত প্রসিদ্ধ মনীষী বিদ্যমান—যাঁরা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সমবয়সী এবং বয়সের ভার সত্ত্বেও তাঁরা এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ও কল্যাণ সাধনে প্রচণ্ড উৎসাহী এবং এখনও অসামান্যরূপে কর্ম-তৎপর।

আজকের এই সাক্ষ্য অনুষ্ঠানে অনুগ্রহ ক'রে আমাকে আমন্ত্রণ করার জন্য আচার্য্য চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর সহকর্মীদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তবে এতে আমি একটু বিভ্রতও বোধ করছি, কারণ, আপনাদের যে সুন্দর সমৃদ্ধ ভাষার চর্চা ও সাধনায় দীর্ঘকাল এই পরিষদ ব্যাপৃত, সে ভাষায় আমি আপনাদের কাছে আমার বক্তব্য নিবেদন করছি না। ইংরেজীতে ভাষণ দিচ্ছি, সেজন্য আশা করি আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন।

আমার পূর্ববর্তী বক্তা ডক্টর মজুমদার ও ডক্টর চট্টোপাধ্যায় পরিষদের ইতিহাসের নানা দিক্ এবং আধুনিক বঙ্গের জীবনে ও সাহিত্যে তার অতুলনীয় প্রভাবের কথা বর্ণনা করেছেন। অধ্যাপক শ্রীমদনমোহন কুমার-রচিত পরিষদের ইতিহাসের প্রথম খণ্ড-ও আজ এইমাত্র প্রকাশিত হল। এই বইখানির বিভিন্ন অংশ দেখবার আমার সুযোগ হয়েছে এবং আমার সচিবের সহায়তায় এই গ্রন্থে বর্ণিত পরিষদের অতিশয় চিত্তাকর্ষক ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমি লাভ করেছি। আজকের এইসব আলোচনায় আমার নতুন ক'রে বলবার বিশেষ-কিছু নেই। সুতরাং পরিষদের পক্ষে অব্যবহিত এবং জরুরী কর্তব্য বলে মনে করি এমন কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখই আমার আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখছি। আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহ্য ও রিক্ত অমুসন্ধান সম্পর্কে পরিষৎ চিরদিন স্বাবলম্বন ও আত্মনির্ভরতার প্রতীক রূপে কাজ করে এসেছে। সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির একদিন

এই সারস্বত-মন্দির প্রতিষ্ঠার সম্মিলিত হয়েছিলেন। প্রথম পর্বের দুঃখদৈন্য অভাব অভিযোগ ও সংগ্রামের দিনে বহু কীর্তিমান ব্যক্তি জ্ঞানচর্চার ও গবেষণার এই কেন্দ্রটিকে সম্বলিত রক্ষা ও পোষণ করবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। মাত্র কয়েকজনের নাম উল্লেখ করি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শোভাবাজারের বিনয়কৃষ্ণ দেব, রমেশচন্দ্র দত্ত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রজনীকান্ত গুপ্ত, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। আরও অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, লালগোলায় রাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়, মুর্শিদাবাদের রায় শ্রীনাথ পাল, প্রফুল্লনাথ ঠাকুর, বড়োদার গায়কবাড় মহারাজা সয়াজী রাও প্রভৃতির মত যে-সকল বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি এই প্রতিষ্ঠানের সাহায্যকল্পে মুক্তহস্তে অর্থ ও ভূমি দান করেছেন, তাঁদেরও আমরা ভুলতে পারি না। তাঁদেরই আনুকূল্যে বর্তমান স্থানে পরিষদের নিজস্ব ভবন প্রতিষ্ঠা এবং এরই সংলগ্ন—পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি রমেশচন্দ্র দত্তের স্মৃতি-পুত—‘রমেশ-ভবন’ নির্মাণ সম্ভব হয়েছে।

সে যুগ ছিল সংগ্রামের যুগ। বহু বাধা-বিঘ্নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই চলতে হয়েছিল পথিকৃৎদের। কিন্তু সবচেয়ে বেশী বল তাঁরা পেয়েছিলেন জনসাধারণের সমর্থন ও সহানুভূতি থেকে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ইদানীং জনগণের অনীহা, অবহেলা ও ঔদাসীণ্যের ফলে পরিষদের সংরক্ষণ এবং কাজকর্ম বহুলাংশে ব্যাহত হয়েছে। পরিষদের নানা কীর্তি এবং অতুলনীয়, অমূল্য সংগ্রহ বস্তুতঃ একটি জাতীয় ‘গ্রান্থ’ এবং এর মহৎ উত্তরাধিকার ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সজ্জতি রক্ষা করে পরিষদের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার কেন যথোপযুক্ত অর্থ সাহায্য করবেন না তার কোনও হেতু নেই। সমভাবেই কেবল অর্থ দিয়ে নয়, এর কাজে সাগ্রহ সহযোগিতা করে পরিষদকে সাহায্য করা বঙ্গবাসিগণের দায়িত্ব। অতীতের মত জমিদারদের বদান্যতালাভের সুযোগ আজ আর নেই, কিন্তু শিল্পে, বাণিজ্যে, কৃষিক্ষেত্রে নূতন যে সকল শ্রেণী তাঁদের স্থান গ্রহণ করেছেন তাঁদের কাছ থেকে গ্রান্থসম্বন্ধে ভাবেই অর্থসাহায্য আশা করা যেতে পারে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কাজ আমাদের ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত ও প্রসারিত। আজ অল্প সময়ের মধ্যে আমি স্বচক্ষে এখানের কয়েকটি প্রদর্শনী-কক্ষ দেখলাম। আপনাদের সংগ্রহ অমূল্য। সেই সঙ্গে আমি একথাও বলব যে আমি বিষমতা ও বেদনা বোধ করছি—এত মূল্যবান নিদর্শন, এত মূল্যবান পুঁথি, এত মূল্যবান দলিলপত্র যথোপযুক্তভাবে সংরক্ষণের জন্য আপনাদের যথেষ্ট স্থান নেই, ফলে কালের ও আবহাওয়ার আক্রমণে এগুলি বিপন্ন। অতএব সর্বাগ্রে প্রয়োজন সরকারের, বঙ্গের জনসাধারণের এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্মিলিত হয়ে কত দ্রুত পরিষদের উন্নয়ন করা যায় এবং সর্বোপরি এখানে রক্ষিত অতি প্রাচীন হুঁড় পুঁথিগুলির সংগ্রহ সর্বোত্তম-ভাবে রক্ষা করা যায় তার প্রচেষ্টা করা। পরিষদের গ্রন্থাগারে বহু দুস্প্রাপ্য গ্রন্থ

আছে, এবং বিভিন্ন সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রমেশচন্দ্র দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, বিনয়কৃষ্ণ দেব এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত সুধীজনের ব্যক্তিগত সংগ্রহ লাভ করে সে গ্রন্থাগার আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। পুথিশালায় সংস্কৃত ও বাংলা বহু দ্রষ্টব্য পুথির সঞ্চয় এবং চিত্রশালায় প্রাচীন মুদ্রা, প্রস্তর ও ধাতুমূর্তি, তাম্রশাসন, প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্র এবং পুরাতন পুথি প্রভৃতি সংরক্ষিত আছে। আমার মনে হয়, পরিষদের এই সব মূল্যবান সংগ্রহের নিরাপত্তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন। সন্দেহ নেই, পরিষৎ এ পর্য্যন্ত সংগৃহীত সমস্ত বস্তুর বৈজ্ঞানিকভাবে সজ্জিত শ্রেণীবদ্ধ তালিকা রক্ষা করে আসছেন এবং মধ্যে মধ্যে সেগুলি প্রত্যক্ষভাবে মিলিয়েও দেখেছেন।

পরিষদের সংগ্রহশালা থেকে অপহৃত একটি মূর্তি প্রত্যর্পণের ব্যাপারে বোস্টন মিউজিয়াম অসামান্য সৌজন্য প্রদর্শন করেছেন, এবিষয়ে ডক্টর চট্টোপাধ্যায় ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছেন এবং পরিষদে রক্ষিত ঐ ব্রোঞ্জের মূর্তিটি কিভাবে পুনরুদ্ধার করা হয়েছে তার চিত্তাকর্ষক কাহিনী আপনাদের বলেছেন; মূর্তিটি শীঘ্রই কলকাতায় প্রেরিত হবে এবং পরিষদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু মূল্যবান শিল্পকীর্তি নিয়ে যখন ন্যায়-অন্যায়-বোধ-হীন নির্মম, গোপন ব্যবসায় চলেছে, তখন চৌর্যা ও অপহরণের হাত থেকে এগুলিকে বাঁচাবার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা পরিষৎকে করতেই হবে। তাই বিশেষ করে এই বিষয়ে আমি পরিষদ ও তার তত্ত্বাবধায়কদের আরও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানাই। ঐতিহাসিক, ধর্মগত এবং ভাবগত কারণে পরম মূল্যবান আমাদের প্রত্ন-বস্তুগুলিকে যে বর্বর ও তস্করেরা যাদুঘর ও মন্দির থেকে অপসারণ করছে, তাদের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত-গঠন জরুরী ও অপরিহার্য কর্তব্য। যারা অবৈধভাবে মহামূল্যবান শিল্প সামগ্রী ও ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলিকে আত্মসাৎ করছে অথবা বিদেশে চালান করে দেবার চেষ্টা করছে, তাদের অতি কঠোর শাস্তি দেবার জন্য প্রচলিত আইনের সংশোধন আবশ্যক। স্বাধীনতার পর কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের লেখক ও শিল্পীদের সৃজনী প্রতিভাকে উৎসাহিত করবার জন্য সাহিত্য আকাদেমী, ললিতকলা আকাদেমী এবং ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়া প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন। সেই দৃঢ়ান্ত অনুসরণে নিজ নিজ রাজ্যে সাহিত্য ও ললিত-কলার পৃষ্ঠপোষকতার উদ্দেশ্যে কোন কোন রাজ্য-সরকারও অনুরূপ আকাদেমী বা প্রতিষ্ঠান গঠন করেছেন। এগুলি অবশ্যই সংপ্রচেষ্টা। এ কথা বলা বাহুল্য যে শিল্প ও সাহিত্যের যথার্থ উন্নতির জন্য যথাসম্ভব সরকারী হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত আবহাওয়ার প্রয়োজন। এই পরিবেশে স্বাধীনতা-উত্তর যুগে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ভূমিকা আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে। আমার সংশয় নেই যে বর্তমান নেতৃত্বে পরিষদ কৃতিত্বের সঙ্গে আপন দায়িত্ব পালন করবে। দীর্ঘ গৌরবময় ঐতিহ্যসম্পন্ন এই পরিষদ যদি যুগের প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তন, নবায়ন এবং নবজীবনের ভাবধারার পরিচয় দিতে পারে তবে তার ভবিষ্যৎ অতীতের চেয়েও মহত্তর হয়ে উঠবে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

বন্ধুগণ ! আমার ভাষণ ধৈর্যসহকারে শুনেছেন, সেজন্য ধন্যবাদ জানাই। আবার আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ও কর্মকর্তাদের—বিশেষভাবে, বর্তমান উৎসাহী সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীমদনমোহন কুমারকে—দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও সমবেত চেষ্ঠায় এই প্রাচীন প্রতিষ্ঠানটির নবরূপায়ণের এবং দীর্ঘদিনের গৌরবমণ্ডিত এই সারস্বত-সদনের পুনরুজ্জীবনের প্রয়াসের জন্য। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে এই একাডেমির কাছে লেখা—ফ্রীড্রিখ্ মাক্স ম্যুলরের একখানি চিঠির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করি: “আপনাদের সামনে অনেক কাজ। আমি আশা করি, আপনাদের স্বদেশপ্রেমপূর্ণ কর্মপ্রচেষ্টায় আপনারা অধ্যবসায়ের সঙ্গে অগ্রসর হবেন। ‘স্বদেশপ্রেমপূর্ণ’ বলছি এই কারণে, যে যা-কিছু দেশের ইতিহাস সম্পর্কে দেশবাসীর জ্ঞান এবং গৌরব-বোধ জাগায়, তাই তার দেশান্নবোধকে দৃঢ় করে এবং স্বদেশপ্রেমকে সত্যকার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে।”

সর্বশেষে, পরিষদ যে চমৎকার কাজ করছেন তা উপলব্ধি করে আজকের এই অনুষ্ঠানে আমার একটি বিনীত ঘোষণা : রাজ্যপালের তহবিল থেকে খুব সামান্য একটি অঙ্ক, দশ হাজার টাকা, আপনাদের হাতে দিতে চাই। আমার ইচ্ছা, পরিষদের বহুমূল্য-বান্ দলিলপত্র ও প্রাচীন পুথিপত্র সংরক্ষণের উপকরণ ও সেইজন্য প্রয়োজনীয় আসবাবাদি ক্রয়েই এই অর্থ ব্যয়িত হবে।

জয় হিন্দ ॥

১ই শ্রাবণ ১৩১১ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত আর্টুর লাললট্ ডিয়ার্সের ভাষণ। টেপেরকর্ডে গৃহীত মূল ইংরেজী ভাষণটি অধ্যাপক শ্রীযোক্তব্য নাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক অনুদিত।

মোহিতলাল মজুমদারের একটি অপ্রকাশিত কবিতা

[মোহিতলাল মজুমদার (জন্ম ২৬ অক্টোবর ১৮৮৮, মৃত্যু ২৬ জুলাই ১৯৫২) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলা সাহিত্যের অধ্যাপক রূপে যোগ দেন ; ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে মোহিতলালের সহিত প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার, ক্ষেত্রপাল দাস ঘোষ, প্রফুল্লকুমার গুহ, হীরেন্দ্রলাল দে, ধীরেন্দ্রচন্দ্র গাঙ্গুলী, সুরেশকুমার মিত্র প্রমুখের অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতা হয়। প্রায় প্রত্যহ অপরাহ্ন হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাঁহারা রমনার নীলক্ষেত-প্রান্তরে সাক্ষাৎসঙ্গকালে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা ও হাস্য-পরিহাসে আনন্দ-উচ্ছল অবসর মুহূর্তগুলি উপভোগ করিতেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ১লা জুলাই ১৯৪২ অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার কলিকাতা চলিয়া আসার পূর্বদিন মোহিতলাল, রমেশচন্দ্রের উদ্দেশে নিম্নলিখিত কবিতাটি রচনা করেন। ১৫ই আষাঢ় ১৩৪৯ (৩০শে জুন ১৯৪২) সন্ধ্যায় নীলক্ষেত-পদচারী-দলের পক্ষ হইতে মোহিতলাল স্বরচিত কবিতাটি আবৃত্তি করিয়া সাক্ষাৎসঙ্গের নিত্যসঙ্গী শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদারের হাতে অর্পণ করেন। রমেশচন্দ্র, মোহিতলালের এই কবিতাটি সুদীর্ঘ ৩৩ বৎসর ক্রাল সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। বঙ্গের বিভিন্ন কবি ও মনীষীর পত্র, পাণ্ডুলিপি, ব্যবহৃত দ্রব্যাদি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে রক্ষার জন্য সংগ্রহকালে পরিষদের বর্তমান সম্পাদক মোহিতলালের এই কবিতাটি প্রার্থনা করিলে রমেশচন্দ্র কবিতাটি পরিষদে দান করিয়াছেন।

১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৮১ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে আচার্য্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কবি মোহিতলালের চিত্রপ্রতিষ্ঠা উৎসবে রমেশচন্দ্র এই কবিতাটি শ্রোতৃ-মণ্ডলীকে স্বয়ং পাঠ করিয়া শোনান। কবিতাটি পরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত হইয়াছে।

মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত “বাক্সালী” নাটকের কবি মোহিতলাল মজুমদার-কৃত ইংরেজী অনুবাদের একটি পাণ্ডুলিপি এবং মোহিতলালের কয়েকখানি চিঠিও সংগৃহীত হইয়া ঐ দিন পরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত হইয়াছে।

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯২১—১৯৩৬ ইতিহাসের অধ্যাপক, ১৯৩৭ জানুয়ারি হইতে ৩০শে জুন ১৯৪২ উপাচার্য্য ছিলেন ; শ্রীহীরেন্দ্রলাল দে অর্থনীতি বিভাগের প্রধান, শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র গাঙ্গুলী গণিতের অধ্যাপক, স্বর্গত ক্ষেত্রপাল দাস ঘোষ টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ, স্বর্গত প্রফুল্লকুমার গুহ ইংরেজীর অধ্যাপক এবং স্বর্গত সুরেশকুমার মিত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসক ছিলেন।

—পরিষৎ সম্পাদক।]

নীলক্ষেত-পদচারীদের পথ-সহচর
পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের
বিদায়-উপলক্ষে
প্রীতি-নিবেদন

পথের প্রান্তে, আজিকে বন্ধু, তোমারে বিদায় দিন—
যেখান হইতে প্রতি-সন্ধ্যায় তোমা সাথে ফিরেছি;—
আজিকে সে পথে ফিরিব সকলে একা,
হয় ত' ইহাই পথিকের সাথে পথিকের শেষ দেখা !

না জানি কখন কেমনে হ'ল যে এমন পথের প্রীতি,
নূতন সমাজ গড়িছে আমরা—নূতন মিলন-রীতি ;
মুক্ত আকাশে, নীলক্ষেত-প্রান্তরে,
একটি সে পথ মিলাইল সবে—মিলে নাই যারা ঘরে !

এ পথের এই ছায়াতরুবাধি—কোথাও বা খোলা-মাঠ—
গৃহকোণে বসি'—দিল না সাধিতে নিজ নিজ পূজা-পাঠ।
কেহ ছেড়ে এল গাঢ়তর আলাপন,
কেহ বা বাঁচিল কিছুখন তরে কান্ত রাখিয়া রণ !

প্রতি-সন্ধ্যায় পথের সে ডাকে ঘর হ'তে বাহিরিয়া
আলাপে-প্রলাপে হাসি-উচ্ছ্বাসে গেল সবে পাসরিয়া—
কোন্ সাজে মোরা সাজি সারা দিনমান,
পথের কূহকে পথচারীদের থাকে নাক' সেই জ্ঞান !

সে কথা বুঝি আরো ভাল করি', তোমারে লভি যবে,—
সেও কি পথের কূহক, অথবা নিজেই সে গৌরবে
মোদের ললাটে পরাইলে জয়টীকা,
হেরি নু মাঠেরো ললাটে বলিছে তাহার স্বর্ণ-শিখা !

পদে পদে পদ মিলায়ে চলিতে, পথের ছন্দে তবু
তোমার প্রাণের শোনাতে যে সুর—সে আর শুনি নি কভু !
তব হৃদয়ের সেই শোভা সুন্দর—
যেন সে আকাশে অন্ত-মেঘের বর্ণের নিব্বর ।

হেথা সকলেই পরবাসী মোরা—ঘরে নয়, পথে দেখা ;
পথ ফুরালেই সাথীরা সবাই চলে' যাবে একা একা ।

তবু দিনে-দিনে সেই সে পথেরি মাঝে,
মানুষে মানুষে হয় পরিচয় কত কাজে কত সাজে !

কোন' কাজ নয়—অকাজের মত আমাদের পথ-চলা,
চলিতে চলিতে যার যাহা ধুলী, প্রাণ খুলে' তাই বলা,—

উচ্চকণ্ঠে, কভু বা উচ্চহাসে ;
হিলোল তার মিলাইয়া যায় হাওয়ার হহ-শ্বাসে ।

এমনি করিয়া কত না সন্ধ্যা, কত সায়াহ্ন-বেলা
যাপিনু, বন্ধু,—তুমি সে আমোদে কভু কর নাই হেলা ।

আজ দেখি একি !—পথের ধুলার কঁাদে
ধরা দিগেছিল কোন্ প্রাণখানি ? পথ যে আজিকে কঁাদে !

বেলা পড়ে' এলে, শিরীষ-তরুণী রহিবে যে বাহ মেলি'—
দাঁড়াতে যেথায় সেই ভূমি' পরে সুশীতল ছায়া ফেলি',

জানিবে না সে ত'—চলে' গেছ বহুদূরে,
আর হেরিবে না হাস্য-বদন পষচারী বন্ধুরে !

কক্ষচূড়া লাল শামিয়ানা ছ'ধারে বিধারি' হোথা
ভাবিবে, এখনি দিবে দরশন—দাঁড়ায়েছে পথে কোথা' ;

ঈশৎ-বেগুনী জারুলের ফুল-বীধি
প্রতি বৈশাখে বহিবে তোমার পদচারণের স্মৃতি ।

আর আমাদের ?—প্রথম ছ'দিন ভুল হবে বার বার—
যেন একজন এখনো যে বাকি, দেখা নাই কেন তার !

না কহিতে কিছু, সহসা পড়িবে মনে,
আর হেরিব না তোমারে, বন্ধু, এইখানে, এই ক্ষণে !

হেরিব না সেই যুগপতি-সম দৃঢ় ভব পদচার,
শুনিব না সেই গাঢ়কণ্ঠের সংযত উৎসার—

অন্তর হ'তে আত্মীয়তার বান্ধি !
কভু সে গভীর, কভু লঘুভাবে ঘূচা'ত মনের মানি ।

হয় ত তুমিও পেয়েছিলে কিছু মোদের সঙ্গ করি' ;
 ধুতি ও পিরান, হাতে লাঠিখানি—খড়া-চুড়া পরিহরি'—
 দিনান্তে শুধু অর্দ্ধদণ্ড তরে
 খোলা-মাঠে বুঝি প্রাণের মুক্তি লাভিতে তৃপ্তিভরে ?

পদ-পদবীর তুঙ্গশিখরে ঝড়ের ঝাপট সহি',
 ওই শিরে তব চূর্ভর-ভার—লোক-সম্মান বহি'—
 উচ্চে-ওঠার শাস্তিও প্রতি পদে,
 তবু মধুহীন কর নাই কভু তব মন-কোকনদে !

এইচ্-এন্ দে, কে-ডি, গুহ, আর—মিত্র, গান্ধুলী, কবি,
 (সর্বশেষের নামটাই সার,—বিপরীত তাঁর সবই !)
 একসাথে হাতে দিয়েছিলু বেঁধে মোরা
 একটু মোহের একটু স্নেহের রঙীন রাখীর ডোরা ।

তারি ভরসায় মিনতি মোদের, এই শেষ সন্ধ্যায়—
 যেখানেই থাকো, ভাবিয়ে বারেক—এই তরুবাধি-ছায়,
 এই নীলক্ষেতে, গোখুলির প্রান্তরে,
 তোমারে, বন্ধু, খুঁজিতেছি মোরা আরেক পথের 'পরে ।

সে পথে আমরা ছরিতে মিলিব—মধুর স্বপ্নবৎ—
 সে যে নিশ্চল মনের আকাশে স্মরণের ছায়া-পথ !
 'সে পথে এমনি দাঁড়াইবে তুমি আসি'—
 নমস্কারের পরেই হেরিব সেই মুখে সেই হাসি !

নীলক্ষেতের পদচারী বন্ধুদল

নীলক্ষেত, রমনা ;
 ঢাকা, ১৫ই আষাঢ়, ১৩৪২ ।

বীরেন্দ্রলাল দে, ক্ষেত্রপাল দাস ঘোষ, প্রফুল্লকুমার গুহ,
 সুরেশকুমার মিত্র, ধীরেন্দ্রচন্দ্র গান্ধুলী,
 মোহিতলাল মজুমদার

‘প্রকৃতিভির্লক্ষ্ম্যাঃ করং গ্রাহিতঃ’

শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার

বাঙলা-বিহারের পালবংশীয় সম্রাট ধর্মপাল আনুমানিক ৭৭০-৮১০ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার খালিমপুর তাম্রশাসনে তদীয় পিতৃদেব এবং বংশের আদি নরপতি গোপাল (আনুমানিক ৭৫০-৭০ খ্রীষ্টাব্দ) সম্পর্কে বলা হইয়াছে—

মাংসান্যায়মপোহিতুং প্রকৃতিভির্লক্ষ্ম্যাঃ করং গ্রাহিতঃ
শ্রীগোপাল ইতি ক্ষিতীশশিরসাং চূড়ামণিস্তৎসুতঃ ।

অর্থাৎ দেশের অরাজক অবস্থা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে প্রকৃতি বা প্রজাগণ শ্রীযুক্ত গোপালের সহিত রাজলক্ষ্মীর বিবাহ দিয়াছিল। ‘রাজলক্ষ্মীর সহিত বিবাহ দেওয়া বলিতে অবশ্যই রাজা নির্বাচিত করা বুঝিতে হইবে।’ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রণীত ‘গৌড়লেখমালা’, পৃষ্ঠা ১২, শ্লোক ৪ দ্রষ্টব্য।

প্রজাবর্গ কর্তৃক ব্যক্তিবিশেষকে রাজাক্রমে নির্বাচনের এইরূপ উল্লেখ ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে এবং আদি মধ্যযুগের গ্রন্থাদি ও লেখাবলীতে আরও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃতি বা প্রজা বলিতে ঠিক কি বুঝায়, সে সম্পর্কে ঐতিহাসিক সমাজে মতবৈধ আছে। প্রথমে ঐ ধরনের দুই চারিটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া আমরা ঐ মতবৈধের আলোচনা করিব।

রামায়ণে (১।৪২।১) আছে—

কালধর্মং গতে রাম সগরে প্রকৃতিজনঃ ।

রাজানং রোচয়ামাসুরংস্তমস্তং সুধার্মিকম্ ॥

অর্থাৎ ইন্দ্রাকুবংশীয় নরপতি সগরের যুত্মার পর প্রকৃতিজনেরা তৎপুত্র অংশুমানকে রাজা নির্বাচিত করিয়াছিল।

কাঞ্চীর পল্লব-বংশে পালবংশীয় গোপালের সমকালে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে দ্বিতীয় নন্দিবর্মা পল্লবমল্ল (৭৩০-২৬ খ্রীষ্টাব্দ) রাজত্ব করিয়াছিলেন। কশাকুড়ি তাম্রশাসনে তৎসম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, প্রজাগণ তাঁহাকে রাজপদে বরণ করিয়াছিল—‘বৃত্তঃ প্রজাভিঃ’। South Indian Inscriptions, Vol. III, Part II, p. 349 দ্রষ্টব্য।

অনুরূপভাবে প্রাচীন প্রাগজ্যোতিষ বা আসামের পালরাজবংশের আদি নরপতি ব্রহ্মপাল সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—‘প্রকৃতয়ো ভূভাররক্ষণক্ষমং……পরিচক্রিরে নরপতিং শ্রীব্রহ্মপালং হি যম্’। অর্থাৎ ভৌমবংশের একবিংশতিতম নরপতি ত্যাগসিংহ অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগমন করিলে প্রকৃতিবর্গ ঐ বংশেরই কোনও শাখায় উদ্ধৃত ব্রহ্মপালকে রাজা নির্বাচিত করিয়াছিল। পদ্মনাথ ভট্টাচার্যকৃত ‘কামরূপশাসনাবলী’, পৃষ্ঠা ৯৪ (রত্নপালের তাম্রশাসন, ৫।ক ১০) দ্রষ্টব্য।

পূর্বে পণ্ডিতসমাজে যে মতভেদের উল্লেখ করিয়াছি, তাহার কারণ দুইটি। প্রথমতঃ, উল্লিখিত দৃষ্টান্তসমূহে প্রজাকর্তৃক রাজা নির্বাচনের উল্লেখমাত্র পাওয়া যায়, উহার কোন বিশদ বিবরণ মেলেনা। দ্বিতীয়তঃ, যে সকল বিবরণে এ বিষয়ে কিছু আলোকপাত হইতে পারে, তাহাতে অনেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। তাই প্রজাদ্বারা রাজা নির্বাচন সম্পর্কে আমরা বিভিন্ন সিদ্ধান্ত দেখিতে পাই।

বর্গীশ রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় তাঁহার ‘গৌড়রাজমালা’র (পৃষ্ঠা ২১) স্থির করিয়াছিলেন যে, “বঙ্গালায় জনসাধারণ কর্তৃকই অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে গোপালের নির্বাচনসূত্রে মাৎস্যন্যায় বিদূরিত এবং গৌড় রাষ্ট্র পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল।” অবশ্য ঘটনাটির তারিখ অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে, শেষভাগে নহে। যাহা হউক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিতগণও চন্দ মহাশয়ের অনুরূপ মত পোষণ করিতেন। মৈত্রেয় মহাশয়ের ‘গৌড়লেখমালা’, পৃষ্ঠা ১৯ (পাদটীকা) এবং বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ‘বঙ্গালায় ইতিহাস’, প্রথম ভাগ (১৩৩০ সন), পৃষ্ঠা ১৫১, ১৬৩ ও ১৭১ দ্রষ্টব্য।

অপরদিকে আবদুল মোমিন চৌধুরীর *Dynastic History of Bengal* (Dacca, 1967) গ্রন্থে বলা হইয়াছে, “The verse in question does not seem to speak of any election or selection by the Prakritis, in whatever sense the word may be taken. What it says is that the Prakritis made Gopala take the hands of fortune in order to put an end to the state of *Matsyanyaya*. The metaphorical information can be taken to mean simply that Gopala was assisted by a few Prakritis to gain power or, in other words, Gopala with the support of a few Prakritis (possibly some ruling chiefs or officials who were his camp-followers) succeeded in mastering power and thus put an end to the state of lawlessness.” পৃষ্ঠা ১১ দ্রষ্টব্য। এই ব্যাখ্যার সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক রাজ্যই ঐভাবে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অগণিত রাজ্যপ্রতিষ্ঠাপকদের মধ্যে কেবলমাত্র দুই চারি ব্যক্তিকে প্রজাগণদ্বারা নির্বাচিত বলা হইয়াছে। অবশ্যই ইহার কোন কারণ ছিল এবং প্রমাণ ব্যতীত এইরূপ অসাধারণ দাবিকে উড়াইয়া দেওয়া সম্ভব মনে করি না। মোমিন সাহেবের ব্যাখ্যা সত্য হইলে নির্বাচনের দাবির কোনই মূল্য থাকে না।

ক্রীষক রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের *History of Ancient Bengal* (Calcutta, 1971) গ্রন্থে বলা হইয়াছে, “According to the couplet referred to above, Gopala was made king by the Prakritis. The common meaning of the word is ‘subject’, and it has consequently been held that Gopala was elected king by the general body of people. Although this view has met with general acceptance, it is open to doubt whether the passage refers to anything like a regular election by the

general mass of people, and, if so, whether this was at all practicable in those days and in such abnormal times. It would, perhaps, be more reasonable to hold that the choice was originally made by the leading chiefs, and was subsequently endorsed and acclaimed by the people.” পৃষ্ঠা ৯৫ দ্রষ্টব্য। অবশ্য চন্দ মহাশয় এবং অন্যান্যেরাও আধুনিক প্রথায় জনসাধারণ কর্তৃক ভোট দ্বারা রাজা নির্বাচন বুঝিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহারাও সম্ভবতঃ “acclaimed by the people” বুঝিয়াছিলেন। যাহা হউক, এই ধরনের নির্বাচনের যে দুই একটি ঐতিহাসিক বিবরণী আমাদের জানা আছে, তাহা অনুসরণ করিলে বিষয়টি বুঝিবার জন্য বোধ হয় আমাদের কাছে বেশী মাত্রায় অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয় না।

পূর্বে আমরা পল্লববংশের কাঞ্চীপতি দ্বিতীয় নন্দিবর্মা পল্লবমল্লের প্রজা দ্বারা রাজপদে বরণের উল্লেখ করিয়াছি। ঘটনাটির অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বিবরণ কাঞ্চীপুরের বৈকুণ্ঠ পেরুমাল মন্দিরের তামিল শিলালেখাবলীতে পাওয়া যায়। পল্লববংশীয় সম্রাট দ্বিতীয় পরমেশ্বরবর্মা নিঃসন্তান অবস্থায় অকস্মাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করায় রাজ্যে অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়। দেশের সেই মাংস্রাত্যাজনিত দুর্দিনে মাত্র (মন্ত্রী) ও মূলপ্রকৃতিগণ এবং ‘ঘটকয়্য’ এই বংশের হিরণ্যবর্মা নামক মহারাজের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং দেশের দুর্ব্যবস্থার কথা নিবেদন করিয়া একজন রাজা চাহিলেন। হিরণ্যবর্মা তখন ‘কুলমল্ল’গণকে আহ্বান করিয়া জানিতে চাহিলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে কেহ পল্লব-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইতে চাহেন কিনা। কিন্তু তাঁহারা সকলেই ঐ গুরুভার গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। অতঃপর হিরণ্যবর্মা তাঁহার শ্রীমল্ল, রণমল্ল, সংগ্রামমল্ল এবং পল্লবমল্ল নামক চারি পুত্রকেও ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রথম তিন জন সিংহাসনের দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকার করিলে সর্বকনিষ্ঠ পল্লবমল্ল বিনম্রভাবে তাঁহার সম্মতি জানাইলেন। তাঁহার বয়স তখন মাত্র ১২ বৎসর। হিরণ্যবর্মা প্রথমে তাঁহার নাবালক পুত্রকে ঐ সুকঠিন কার্যের জন্য ছাড়িতে রাজী হন নাই। পরে ধর্মণিকোণ্ড পোশর নামক জনৈক নায়কের বিশেষ অনুরোধে তিনি পুত্রকে পল্লবসিংহাসন গ্রহণে অনুমতি দিয়াছিলেন। তখন পল্লবমল্ল কাঞ্চীপুর অভিযুগে যাত্রা করিলেন। তিনি রাজধানীর নিকট পৌঁছিলে, পল্লবদি-অরৈয়ন্ন নামক জনৈক নায়ক বৃহৎ একদল সেনা লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হন এবং পল্লবমল্লকে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া কাঞ্চীপুরে লইয়া যান। সেখানে তিনি সামন্তবর্গ, বণিকসংঘ, মূল প্রকৃতিসমূহ এবং কাডক মুত্তেরয়ন্ন নামক নায়কের অভ্যর্থনা লাভ করিলেন। অতঃপর মন্দিরাল, সামন্তবর্গ, ‘ঘটকয়্য’ এবং উভয়গণ (স্বদেশী ও পরদেশী বণিক সংঘদ্বয়) কর্তৃক তিনি নন্দিবর্মা নামে সিংহাসনে অভিষিক্ত হন এবং ‘বিডেলবিড়ু’, সমুদ্র বোম, খট্টাধ্বজ ও বৃষভলাঞ্জন

সংজ্ঞক রাজচিহ্ন লাভ করেন। South Indian Inscriptions, pp. 10 ff. (No. 135) এবং Epigraphia Indica, vol. XVIII, p. 117 দ্রষ্টব্য।

উপরের বর্ণনা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, পল্লববংশীয় কাঞ্চীপতি দ্বিতীয় নন্দিবর্মা পল্লব-মল্লের রাজপদে নির্বাচনে পল্লবরাজ্যের সমুদয় প্রজা অংশগ্রহণ করে নাই, ইহা সত্য; কিন্তু উহা নিতান্ত কাঁকা দাবি নহে। অধিকন্তু ঐভাবে নির্বাচনের দাবি সাধারণ কোনও নরপতির পক্ষে মোটেই সম্ভব ছিল না।

এই প্রসঙ্গে আমরা কল্‌হনকৃত, ‘রাজতরঙ্গিণী’র পঞ্চম তরঙ্গে বর্ণিত রাজা যশস্করের নির্বাচনের কাহিনীর উল্লেখ করিতে পারি। উহার বর্ণনা বৈকুণ্ঠ পেরুমাল মন্দিরের লেখাবলীর বর্ণনা হইতে অনেকটা অনুরূপ এবং উহাতে বুঝা যায় যে, রাজা নির্বাচনের প্রথা সর্বত্র সর্বক্ষেত্রে একরূপ ছিল না।

১৩৯ খ্রীষ্টাব্দে অত্যাচারী কাশ্মীররাজ অবন্তিবর্মা বা উন্নাতাবন্তি ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুশয্যায় শায়িত হন। তখন দাসীরা কোথা হইতে শূরবর্মা নামক একটি শিশুকে আনিয়া উহাকে রাজার ঔরসজাত পুত্র বলিয়া রটাইয়া দিল এবং মৃত্যুপথযাত্রী নরপতি তাহাকে রাজাসনে অভিষিক্ত করিলেন। সামন্ত, মন্ত্রী, একাদ্র এবং তন্ত্রী প্রভৃতির হস্তে শিশু রাজার রক্ষণাবেক্ষণের ভার ন্যস্ত করিয়া অবন্তিবর্মা মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই সংবাদ পাইয়া বিদ্রোহী সেনাপতি কমলবর্ধন রাজধানী শ্রীনগর আক্রমণ করিলেন। একাদ্র, তন্ত্রী, সামন্ত ও অশ্বরোহী সেনাদল তাঁহাকে বাধা দিতে গিয়া পরাজিত হইল। নিজের অল্পসংখ্যক অশ্বসেনার সাহায্যে রাজপক্ষের সহস্র সহস্র অশ্বরোহী সৈন্য বিতাড়িত করিয়া কমলবর্ধন রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। তখন শিশুরাজার পক্ষ ত্যাগ করিয়া রাজপক্ষীয় সেনাদল পলাইয়া গেল। রাজমাতা নিঃসহায় পুত্রকে লইয়া কোন গুপ্তস্থানে আশ্রয়গোপন করিলেন।

রাজ্যাভিলাষী হইয়াও রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ এবং ভীকুপ্রকৃতি কমলবর্ধন তৎক্ষণাৎ সিংহাসন অধিকার করেন নাই। পরদিন তিনি ব্রাহ্মণদিগকে সমবেত করিয়া সরলভাবে বলিলেন, “আপনারা স্বদেশবাসী যে যুবককে কার্যক্ষম বুঝিতেছেন, সেই উপযুক্ত ব্যক্তিকেই রাজা নির্বাচিত করুন।” কমলবর্ধনের ধারণা ছিল যে, ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকেই উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া রাজপদের জন্য নির্বাচিত করিবেন। কিন্তু সমবেত বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ পাঁচ ছয় দিন ধরিয়া রাজা হিসাবে বিভিন্ন ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করিয়া বাগবিতণ্ডা চালাইতে লাগিলেন। কমলবর্ধন তাঁহাদের সভায় উপস্থিত হইলে তাঁহারা ইঁট ছুঁড়িয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া দিলেন। ইতিমধ্যে অবন্তিবর্মার মহিষীগণের অনুচরেরা যশস্কর নামক জনৈক সুপণ্ডিত ও সুবক্তা ব্রাহ্মণ যুবককে ঐ ব্রাহ্মণদিগের সভায় উপস্থিত হইবার সুযোগ করিয়া দিলেন। অদৃষ্টের প্রভাবে ব্রাহ্মণেরা যশস্করকে দেখিবামাত্র একমত হইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে একযোগে ঘোষণা করিলেন, “এই ব্যক্তিই আমাদের রাজা হউক।” কল্‌হন পণ্ডিত মন্তব্য করিয়াছেন, “পার্শ্বের পুত্র (অবন্তিবর্মা) যদি ভৃত্যগণের

কুব্ধি-প্রভাবে নিজের বংশকে নষ্ট না করিতেন এবং পরে কমলবর্ধন আসিয়া যদি আবার তাঁহার পুত্রকে বিদূরিত না করিতেন, তবে অনুচ্চবংশসম্ভূত ও দারিদ্র্যপীড়নে ভূ-পর্যটনকারী এই অভাগ্য যশস্করদেবের পক্ষে রাজ্যলাভ কিরূপে সম্ভব হইত ?” দ্রষ্টব্য ‘রাজ-তরঙ্গিণী’, তরঙ্গ ৫, শ্লোক ৪৪৫ হইতে।

উল্লিখিত বর্ণনাটি পড়িয়া প্রথমেই আমাদের মনে হয়, কমলবর্ধনের পক্ষে সম্ভবতঃ সৈন্য সাহায্যে ব্রাহ্মণদিগকে বিতাড়িত করিয়া বলপূর্বক সিংহাসন অধিকার অসম্ভব ছিল না। বোধ হয় তিনি ভীক্সভাব ছিলেন বলিয়াই তাহাতে সাহসী হন নাই। কিন্তু যশস্কর কমলবর্ধন অপেক্ষা বুদ্ধিমান ও নীতিজ্ঞ ছিলেন দেখা যায়। তিনি রাজ-প্রাসাদে প্রবেশ করিয়াই দৌবারিকগণকে আদেশ দিলেন, “ঐ ব্রাহ্মণদিগকে ওখান হইতে দূরে সরাইয়া দাও।” দৌবারিকেরা যখন ভীতিপ্রদর্শনপূর্বক ব্রাহ্মণদিগকে তাড়াইয়া দিতেছিল, তখন নবীন রাজা কৃতাজলিপুটে তাঁহাদিগকে বলিতেছিলেন, “আপনারা আমাকে রাজ্যদান করিয়াছেন, সেজন্য আপনাদিগকে দেবতার মত পূজা করিব। কিন্তু রাজ্যদানের জন্য আপনারা অভিমানে উদ্ধত হইয়া থাকিবেন, সেটি হইবে না। কার্যকাল ব্যতীত অন্যসময়ে আপনারা কেহই আমার নিকটে আসিবেন না।” ‘রাজতরঙ্গিণী’, তরঙ্গ ৬, শ্লোক ২-৪ দ্রষ্টব্য।

ঘটনাটি হইতে যশস্করের সুবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। রাজনীতিজ্ঞানের জন্যই দীনদরিদ্র যশস্কর কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি হইতে সমর্থ হন। আর উহার অভাবেই হাতে আসিয়াও কাশ্মীর-সিংহাসন সেনাপতি কমলবর্ধনের হস্তচ্যুত হইয়া গেল।

যাহা হউক, যশস্করের কাহিনী হইতে দেখা যায়, দেশের ব্রাহ্মণেরা কখনও কখনও রাজা নির্বাচন করিতেন। খুঁজিলে এই ধরনের এবং অন্যান্য প্রকারের আরও কিছু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং যে সকল প্রাচীন ভারতীয় নরপতি প্রজা কর্তৃক নির্বাচিত হইয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহাদের দাবি উপেক্ষণীয় নহে। তবে সকলের নির্বাচনপদ্ধতি এক ধরনের না হইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলিয়াই আমরা এই ক্ষুদ্র আলোচনা সমাপ্ত করিব। এই বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেই বা ‘জনসাধারণের নির্বাচন’ কথাটির অর্থ কি ? আজিও গণ্য করিবার মত আয়তনবিশিষ্ট এমন কোন রাষ্ট্র নাই যেখানে বালক, স্ত্রীলোক, নিরক্ষর, উন্মাদ প্রভৃতি সমুদয় অধিবাসীর ভোটদানের অধিকার আছে। সুতরাং এযুগেও নির্বাচন ঠিক জনসাধারণের নহে, রাষ্ট্রের অধিবাসীদিগের মধ্যে অনেকের মনোনীত প্রতিনিধিবর্গের দ্বারা নির্বাচন। আবার নির্বাচিত ব্যক্তি যে প্রতিনিধিগণের সকলেরই মনোনয়ন লাভ করেন, তাহা নহে। তাই বর্তমান কালের নির্বাচনকে যদি জনসাধারণের নির্বাচন বলিতে বাধা না থাকে, তবে প্রাচীনকালের নির্বাচনকেও জনসাধারণের বলিয়া উল্লেখ করায় কোন ক্ষতি আছে বলিয়া বোধ হয় না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারত

উচ্চের কালীকিঙ্কর দত্ত

ভারতের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতাব্দী একটি বেদনাদায়ক অধ্যায়। এই যুগের আরম্ভে প্রায় আড়াই শ' বছরের পুরাতন রাজনৈতিক ও সামাজিক শৃঙ্খলা বিনষ্ট ক'রে, প্রগতিশীল সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থার সব আশা ধূলিসাৎ ক'রে দিয়ে মোগল সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা। সমস্ত শতাব্দী ধরে দেশে যে ভয়াবহ রাজনৈতিক মাৎস্যন্যায়, সামাজিক অরাজকতা ও অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা বিরাজমান ছিল, তার তুলনা ইতিহাসে বিরল।

৩রা মার্চ ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে আহমদনগর কাম্পে আউরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর আগে থেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক কারণে মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পথ পরিষ্কার হয়েছিল এবং তাঁর দুর্বল বংশধরদের অলসতা ও অকর্ষণ্যতার জন্য এই পতন অবশ্যম্ভাবী রূপ ধারণ করেছিল। হারেমের বিলাস-ব্যসনে লিপ্ত মূর্থ ফারুখ সিয়র ও মুহম্মদ শাহ-এর এমন সাধ্য ছিল না যাতে এই পতন রোধ হয়। এই সব কাণ্ডগোলহীন নির্বীৰ্য্য সম্রাটদের শাসনকার্য্যে অবহেলার দরুণ চারিদিকে দুর্নীতি ও অসাধুতা ব্যাপকরূপে দেখা দিয়েছিল। যে শাসনব্যবস্থা দেশ ও জাতির স্বার্থরক্ষায় পরাভূত ও অপারগ, তার বিলুপ্তি অনিবার্য্য। ইতিহাসের এই অলঙ্ঘনীয় নিয়ম অনুযায়ী মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংস স্বাভাবিক ও সমর্থনীয়। ইংরেজ ঐতিহাসিক ডঃ স্টাবস্, ল্যাক্সটার রাজবংশ সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছিলেন, মোগল সম্রাটদের অষ্টাদশ শতাব্দীর আচরণ বিচার করে আমাদেরও তাই বলতে ইচ্ছা করে, “The dynasty that had failed to govern must cease to reign”।

এই পতনোন্মুখ মোগল সাম্রাজ্যের অভিজাত সম্প্রদায় তথা আমীর-ওমরাহবর্গের চরিত্রও তাদের সম্রাটদের চরিত্রের অনুরূপ নিম্নগামী ছিল। সম্রাটের ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে যে অভিজাত শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল, এবং বাবর, আকবর ও আউরঙ্গজেবের সময়ে যারা সাম্রাজ্যের সকল সেবায় পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেছিল, পরবর্ত্তীকালে তাদেরকে সঠিকভাবে চালনা করার, শাসনকার্য্যে লাগানোর ও তাদের আনুগত্য অর্জন করার জন্য চারিত্রিক দৃঢ়তাসম্পন্ন ও কূটনীতিবিশারদ কোনো মোগল সম্রাটের আবির্ভাব হয় নি। এই প্রসঙ্গে উজীর সতুল্লাহ খান-এর একটি উক্তির মধ্যে যে ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে, সে কথা মনে পড়ে। তাঁর কথায় বলতে গেলে— “কোনো যুগেই দক্ষ ব্যক্তির অভাব হয় না। তাদেরকে খুঁজে বার করা, নিজের দলভুক্ত করা এবং স্বার্থায়েষীদের মিথ্যা অভিযোগ কানে না তুলে তাদেরকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া বিচক্ষণ শাসকের কর্তব্য”। “No age is wanting in able men ; it is

the business of wise masters to find them out, win them over, and get work done by means of them, without listening to the calumnies of selfish men against them.”^১

কিন্তু, উপযুক্ত শাসক ও শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার অভাবে মোগল অভিজাত সম্প্রদায় অধিক উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে উঠেছিল এবং তাদের অসাধু কার্যকলাপে দেশ শ্বাশানে পরিণত হয়েছিল। অভিজাত শ্রেণীর অধিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার দরুণ যে রাজনৈতিক দলাদলি সৃষ্টি হয় এবং পুষ্টিলাভ করে, তার ফল কোনো দেশে কোনো কালে ভালো হয় না। অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারত অভিজাতবর্গের প্ররোচনায় অসংখ্য স্বার্থান্বেষী যুদ্ধে, বিশ্বাসঘাতকতায়, ষড়যন্ত্রে, গুপ্তহত্যায় ও নির্বিচার নির্ধাতনে শোকে ভয়ে মুক হয়ে গিয়েছিল। যে নিষ্ঠুরতার সঙ্গে ১৭১৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সম্রাট ফারুখ সিয়রকে প্রথমে অন্ধ ও পরে বন্দী অবস্থায় হত্যা করা হয়, যে নীচ ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার ফলস্বরূপ ২রা জুন, ১৭৫৪ তারিখে আহমদ শাহ সিংহাসনচ্যুত ও বন্দী হন, এবং যে ভাবে উজীর ইমাদ-উল-মুলক্‌এর হাতে ১৭৫৯ সালের ২৯শে নভেম্বর দ্বিতীয় আলমগীর নিহত হন ও দ্বিতীয় শাহ আলম রাজ্যচ্যুত হন—সে সব কথা শুনলে আজও শিউরে উঠতে হয়।

চক্রান্তকারী উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও অভিজাতবর্গ তিনটি দলে বিভক্ত ছিল। প্রথম দলে, উচ্চপদস্থ হিন্দু ও ভারতীয় মুসলমানগণ; দ্বিতীয় দলে, তুরান বা ট্রান্সক্সিয়ানার সূন্নী মুসলমানগণ; এবং শেষোক্ত দলে, পারস্য দেশের শিয়া মুসলমানগণ। এই সব দলের পারস্পরিক কলহ বিবাদে সারা দেশের নাগরিক জীবন বিপর্যাস্ত হয়েছিল। তখন দেশে এমন কোনো দুরদৃষ্টিসম্পন্ন বিচক্ষণ নেতা ছিলেন না যিনি আকবরের মতো জাতীয় জীবনে প্রগতির জন্য কোনো পরিকল্পনাকে রূপ দিতে পারেন, এমন কোন রাজনৈতিক মহাপুরুষ এই যুগে আবির্ভূত হন নি যিনি দেশকে সমৃদ্ধিশালী করার জন্য পথনির্দেশ দিতে পারেন।^২ তাই সমসাময়িক একটি স্মৃতিচারণে সিরাজউদ্দৌলার দরবারের প্রসঙ্গে, আমরা দেখতে পাই, লেখা আছে যে সকলে যেন স্বার্থপরতা জীবনের একমাত্র ব্রত বলে মেনে নিয়েছিল। নিদারুণ হতাশায় ও দুঃখে ফরাসী ভাগ্যান্বেষী জঁ ল’ (Jean Law) ১৭৫৯ সালের এপ্রিল মাসে ইতিহাসকার গোলাম হোসেনকে বলেছিলেন,—“আমি বাংলা থেকে দিল্লী পর্যন্ত সব জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি, কিন্তু এমন স্থান আমার নজরে পড়েনি যেখানে গরীবের উপর নির্ধাতন ও পথচারীদের সর্বস্বাপহরণ হয় না। আমি চেয়েছিলাম যে সুজা ও ইমাদ-এর মতো রাজা বা আমীর দেশের সম্মান ও স্বার্থ রক্ষার জন্য বাংলার রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করুন এবং ইংরেজদের দমন করুন, কিন্তু তাঁরা কেউই সে বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন না। তাঁদের নিশ্চেষ্টতার ফল যে কি হতে পারে তাঁরা তা কোনোদিন

বিচার করেননি। ভারতীয় অভিজাত সম্প্রদায় দুর্নীতিপরায়ণ অস্থিচিহ্নিত নির্বোধের দল ও ভারতীয় জীবনে সকল হুঃখের মূল।”^৩ ১৭৬৮ সালে সম্রাট শাহ আলম ঠিক ইতিয়া কোম্পানীকে লিখেছিলেন, “অভিজাত ও সামন্তবর্গের বিশ্বাসঘাতকতা এই অরাজকতা সৃষ্টি করেছে। তারা প্রত্যেকে নিজের এলাকায় আপন সার্বভৌমত্ব প্রচার করে এবং একে অন্নের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত থাকে। সবল দুর্বলের উপর প্রভুত্ব করে।.....মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার এই যুগে মহামহিম [মোগল] বাদশাহ ইংরেজ প্রধানগণ ছাড়া আর কারো সেবা বা আনুগত্যে আস্তা রাখেন না।” “Through the perfidiousness of the nobility and vassals this anarchy has arisen, and every one proclaims himself a sovereign in his own place, and they are at variance with one another, the strong prevailing over the weak.....In this age of delusion and deceit, His Majesty places no dependence on the services or professions of loyalty of any one but the English chiefs.”^৪ ফলতঃ জাতীয় স্বার্থ-বিরোধী অন্তর্বিরোধ বিদেশী শক্তিকে কোনো দেশে অধিকার বিস্তারে প্রলোভিত করে। দুর্বল শরীরে যেমন সহজে রোগ প্রবেশ ও বিস্তার লাভ করে, তেমনই গৃহবিবাদে শক্তিহীন ভারত বিদেশী শক্তির কাছে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হলো এবং বিদেশীদের করকবলিত হলো। অষ্টাদশ শতাব্দীর পোल्याণ্ডের মতো ভারত তার অভিজাতবর্গের স্বার্থান্ধতার কারণে পরাধীন হলো।

বহিঃশত্রুর ক্রমাগত আক্রমণে প্রায় ত্রিশ বছর ধরে সারা উত্তর ভারত বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন লিখে গেছেন যে দেশে তখন নাম মাত্র শাসন-ব্যবস্থাও ছিল না। “সীমান্ত রক্ষীদের বেতন খুবই কম ছিল এবং তারা তাদের নির্দিষ্ট স্থানে কর্তব্যে উপস্থিত থাকতো না। অবহেলিত দুর্গগুলি বিদেশীদের আক্রমণ করতে সাহসী করেছিল। রাজসরকারের শক্তিহীনতা ও মন্ত্রীবর্গের অমনোযোগিতা সব জায়গায় আলোচিত হতো। প্রশাসনিক কোনো ভয় বা বন্ধন না থাকায় প্রত্যেকে ভবিষ্যৎ পরিশ্রমের কথা না বিচার করে বর্তমান স্বার্থসিদ্ধির কথায় কেবল চিন্তা করতো। রাস্তা ও গিরিপথগুলি সুরক্ষিত না থাকায় যে কেউ বিনা বাধায় যাওয়া-আসা করতো। কোথায় কি ঘটেছে তার গুপ্ত-সংবাদ দিল্লীর দরবারে পাঠানো হতো না এবং সম্রাট বা তাঁর ওমরাহরা কখনও এমন জিজ্ঞাসা করতেন না যে কেন কোন সামরিক গুপ্তসংবাদ তাঁদের কানে কখনও পৌঁছায় না।” “Hence the guards being ill-paid, abandoned their posts, and the garrisons being utterly neglected, invited the invaders, and the report of the Ministers' indifference and the weakness of

^৩ *Siyar-ul-mutakherin*, Vol. II, p. 257.—Quoted in Sarkar, J. N., *Fall of the Mughal Empire*, Vol. II, p. 528.

^৪ *Calendar of Persian Correspondence*, Vol. II., pp. 1101, 1836.—Quoted by J. N. Sarkar, *ibid*.

the Government being rumoured everywhere, everyone without fear of control thought only of his personal interests without minding any consequences. The roads and passes being neglected, everyone passed and repassed, unobserved; no intelligence was forwarded to court [of Delhi] of what was happening; and neither Emperor nor the nobles ever asked why no intelligence of that kind ever reached their ears.”

পারস্যের আক্রমণ কম্পমান মোগল সাম্রাজ্যের উপর নিক্ষিপ্ত প্রথম মৃত্যুবাণ। এককালে এই পারস্য দেশ বাবরকে ভারতে সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করতে সাহায্য করেছিল এবং রাজ্যহীন হুমায়ুনকে আশ্রয় দিয়েছিল। কিন্তু ১৭৩৯ সালে নাদির শাহ-এর নেতৃত্বে পারসিকদের আক্রমণে মোগল সাম্রাজ্যের দুর্দিন এতো চরমে উঠেছিল যে তার মৃত্যুর দিন ঘনিষে এলো। সমস্ত মে মাস ধরে রাজধানী দিল্লীর পথঘাট নির্বিচারে নিষ্ঠুর হত্যার রক্তে প্লাবিত হয়েছিল এবং রাজধানীর ৩০।৪০ মাইলের মধ্যে সব শহর ও গ্রাম শ্মশানে পরিণত হলো। অনেক প্রামাণিক ইতিহাসকারের মতে নাদির শাহ-এর দুর্দান্ত কিজিলবাস্ (Qizilbash) সেনাদের হাত থেকে নিজেদের সম্মান বাঁচানোর জন্য বহু সম্ভ্রান্ত ভারতীয় নিজেদের স্ত্রী কন্যাদের প্রথমে হত্যা করে, তারপরে নিজেরা আত্মহত্যা করে অথবা স্বেচ্ছায় শত্রুর তরবারির সামনে মাথা পেতে দেয়। বহু নারী অসম্মানের চেয়ে মরণকে শ্রেয়ঃ ভেবে বাড়ীর কুয়োতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে।^১ ১৫ কোটি টাকা নগদ, ৫০ কোটি টাকা মূল্যের অলঙ্কার, জহরৎ ও বহুমূল্য সামগ্রী, বিখ্যাত কোহিনূর হীরা ও ময়ূর সিংহাসন এবং, এমন কি, হিন্দু সংগীত সম্বন্ধে সম্রাট মহম্মদ শাহ-রচিত বহুবর্ণে চিত্রিত বিখ্যাত ফারসি গ্রন্থ সঙ্গে নিয়ে নাদির শাহ যখন ভারত ত্যাগ করলেন, তখন এই আক্রমণের চরম আঘাতে, নিষ্ঠুর হত্যা ও অপহরণের নিদাকরণ অসম্মানে মোগল বাদশাহের গৌরবের দিন চিরতরে শেষ হলো।

নাদির শাহ-এর আক্রমণ ভারতে বহিঃশত্রুর অভিযানের পথ উন্মুক্ত করে দিলো। ২২ জুন, ১৭৪৭ সালে বিশ্বাসঘাতকের হাতে নাদির শাহ-এর হত্যার পর তাঁর একজন আফগান ওমরাহ আহমদ শাহ অবদালী (যিনি ১৭৩৭ সাল থেকে নাদির শাহ-এর সঙ্গে ছিলেন) পারস্যের সিংহাসন অধিকার করেন। ১৭৪৮ থেকে ১৭৬৭ সালের মধ্যে^২, এই কুড়ি বছরে আবদালী কয়েকবার ভারতে অভিযান চালান। নাদির শাহ-এর মতো তাঁর অভিযান কেবল হত্যা ও লুণ্ঠ-তরাজে সীমাবদ্ধ ছিল না। এই অভিযানগুলির পিছনে ভারতে ও ভারতের বাইরে আফগান প্রভুত্ব স্থাপন করার উদ্দেশ্যও নিহিত ছিল। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিপুল সংখ্যক আফগানদের

^১ Irvine, op. cit., vol—II, p. 369.

^২ কিছু ইংরেজী দলিলে বলা হয়েছে যে আবদালী ১৭৬৯ সালে আরও একবার পাঞ্জাবে অভিযান চালান। জটব্য, *Indian Historical Quarterly*, December, 1934.

ভারতে আগমন এবং তাদের এই দেশে আগত পূর্ববর্তী আফগান বসবাসকারীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ায় আফগান প্রভুত্ব বিস্তারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আফগান ভাগ্যান্বেষণ অর্গণত সংখ্যায় ভারতের বিভিন্ন স্থানে সৈনিক বৃত্তি গ্রহণ করে, এবং কোথাও কোথাও, যেমন রোহিলখণ্ডে, নিজেদের রাজ্য-স্থাপন করে। আবদালীর আক্রমণের পূর্বেও আফগানদের প্রভাব উত্তর ভারতে এতো প্রবল ছিল যে প্রতিবৎসর ভারতে আফগান বিদ্রোহ, অভ্যুত্থান ও সাম্রাজ্য স্থাপনের আশঙ্কা করা হতো। রোহিলা-অধিপতি আলি মুহম্মদ ১৭৪৮ সালে ধোলাখুলিভাবে মোগল সম্রাট মুহম্মদ শাহ-এর সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করেন। ঠিক তার পরেই আবদালী ভারতে প্রথম অভিযান চালনা করেন এবং বিহারে আফগানরা নবাব আলিবর্দী খান-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তিন মাস (১৩ই জানুয়ারী থেকে ১৬ই এপ্রিল) পাটনা অধিকার করে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে এটাও উল্লেখযোগ্য যে উত্তর ভারতের রোহিলা-আফগানরা ও অযোধ্যার আফগান নবাব, আবদালীকে ভারত-অভিযানে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতে আফগান প্রভুত্ব স্থাপনের প্রচেষ্টা একটি সম্ভাবনাপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। এই প্রচেষ্টা মোগল সাম্রাজ্যের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন পরিস্থিতির আরও অবনতি সাধন করেছিল, মারাঠাদের উত্তর ভারতে অগ্রগতি পাণিপথের প্রান্তরে ১৭৬১ সালের জানুয়ারী মাসের যুদ্ধ দ্বারা রোধ করেছিল, এবং বাংলায় ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বহু বছরের জন্য দুর্ভাবনায় রেখেছিল। পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠা শক্তির পরাজয়ে ইংরেজ কোম্পানী উল্লসিত হয়েছিল। কিন্তু, যদি আবদালী তাঁর নিজের দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য ঈর্ষা ফিরে যেতে বাধ্য না হতেন, তা হলে ভারতে ইংরেজ অধিকার বিস্তারের ইতিহাস হয়তো বিপরীত হতো। আবদালী ভারতে আরও কিছুকাল থাকলে বিহার ও বাংলার আফগান শক্তি সমবেত ও সংগঠিত হতো এবং ইংরেজদের সঙ্গে পূর্বভারতে ক্ষমতা লাভের জন্য নিশ্চয়ই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন। ষোড়শ শতাব্দীতে শেরশাহ-এর আকস্মিক অভ্যুত্থান ও ১৭৪৮ সালে বিহারে আফগান বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া ইতিহাসের দিক থেকে অসম্ভব ছিল না। বস্তুত: ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর ও আরও নিশ্চিতভাবে ১৭৬৪ সালে বঙ্গারের যুদ্ধের পর যখন ইংরেজ ক্ষমতা অযোধ্যার আফগান নবাবের রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়—তখন থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ভারতস্থিত ইংরেজ রাজপুরুষগণ আফগান অভ্যুত্থানের আশঙ্কায় সর্বদা ত্রস্ত থাকতেন। সমসাময়িক ইংরেজী খবরের কাগজে ও সরকারী নথিপত্রে এই আফগান-ভীতির বহুল উল্লেখ পাওয়া যায়। অন্যান্য আরও অনেক কারণের সঙ্গে আফগান-ভীতির জন্য সিরাজউদ্দৌলা পলাশীর যুদ্ধের কিছুদিন আগে পর্যন্ত ইংরেজদের সঙ্গে সম্প্রীতি স্থাপনে সচেষ্ট ছিলেন এবং যখন ইংরেজরা চন্দননগর থেকে ফরাসীদের বিতাড়িত করে তখন তিনি নিরপেক্ষ থাকেন। আবদালীর প্রত্যাভর্তন তাঁর কাছে দৈন্যের আশীর্বাদ

বলে মনে হয়েছিল। ১৭৫৭ সালে ১৭ই মে তারিখে সিরাজউদ্দৌলা ক্লাইভকে একটি চিঠিতে লেখেন, “.....by the favour and goodness of God, Abdali is returning by continual marches to his own country.”^১

১৭৭৩ সালের জুন মাসে আহমদ শাহ আবদালীর যুদ্ধের পর ভারতে আফগান অভ্যুত্থানের আশঙ্কা যদিও অনেক কমে গিয়েছিল, তবুও ভারতস্থিত ইংরেজরা সর্বদা আতঙ্কে থাকতো।^২ আবদালীর পৌত্র জামন শাহ-এর সময়ে দ্বৈত ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট হেনরী ডাণ্ডাস লর্ড ওয়েলেসলীকে আফগানদের উপর সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখতে বলেন।^৩ ওয়েলেসলী সেজন্য পারস্যের দরবারে প্রথমে মেহদী আলি খান ও পরে ক্যাপ্টেন ম্যালকমকে দূত হিসাবে পাঠান। ১৮০১ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বরের চিঠিতে কোম্পানীর লণ্ডনস্থিত সিলেক্ট কমিটিকে তিনি জানান: “The active measures adopted by the court of Persia against Zemaun [Zamun Shah] which were subsequently encouraged by Captain Malcolm, produced the salutary effect of diverting the attention of Zemaun Shah from his long projected invasion of Hindusthan during three successive seasons.....The assistance afforded by Mehdi Ali Khan under my orders, to the Prince Muhammad Shah, originally enabled that Prince to excite these commotions which have recently terminated in the defeat of Zemaun Shah, in his deposition from the throne and in the active extinction of his power; to the consolidated and active Government of Zemaun Shah has succeeded a state of confusion in the country of the Afghans highly favourable to our security in that quarter.”

এই সঙ্গে ভারতের সেই যুগের ঘটনাবলীকে পেশোয়ারদের নেতৃত্বে মারাঠা শক্তির পুনরুত্থান যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। পর্যুদন্ত মোগল শক্তির উপর বিগত পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে ও ভারতে হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপন করতে মারাঠা নেতৃবর্গ বদ্ধপরিকর হয়েছিল। শীঘ্র তারা দাক্ষিণাত্য, গুজরাট, রাজপুতানা, মধ্যভারত, বাংলা, দিল্লী ও পাঞ্জাবে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করলো। মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপরে হিন্দু একাধিপত্যের ভিত্তি স্থাপনের প্রথম পরিকল্পনা করেন পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথ, যখন ১৭১৯ সালে দিল্লীতে মারাঠা অভিযানের পর মোগল শক্তির দুর্বলতার পূর্ণ বিবরণ তিনি জানতে পারেন। পেশোয়া প্রথম বাজীরাত সেই পরিকল্পনাকে রূপ দিতে অগ্রসর হন এবং ১৭৭২ সালে মারাঠাধিপতি শাহ’র কাছে দিল্লী আক্রমণের প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন,

^১ Proceedings of the Select Committee, 21st February and 26th December, 1757.

^২ ইন্ডিয়া, Kaye, *History of the War in Afghanistan*, vol. I

^৩ Owen, *Wellesley Despatches*, p. 638.

“Let us strike at the trunk of the withering tree (the Mughal Empire) ; the branches will fall of themselves. Thus should the Maratha flag fly from the Krishna to the Indus.”। ১৭৩১ সালের মধ্যে বাজীরাজ গৃহশত্রুদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বিনষ্ট করেন এবং সেনাপতি শম্ভুজী (কোলহাপুর) ও দাভাদে মালব্য, গুজরাট ও ও বৃন্দেলখণ্ড অধিকার করেন। ১৭৩৭ সালে তাঁর শক্তিশালী অশ্বারোহী-বাহিনীর অগ্রগতি দিল্লী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং পরের বছর হুসাইন-সরাই’এর সন্ধি অনুযায়ী তিনি মারাঠাদের পরম শত্রু নিজামের কাছ থেকে নর্মদা ও চম্বলের মধ্যকার বিস্তৃত অঞ্চলের অধিকার আদায় করেন। ১৭৫৮ সালে পেশোয়া রঘুনাথ রাও-এর সময়ে মারাঠাশক্তি চরম উৎকর্ষ লাভ করে এবং দুর্ভেদ্য আটক-এর দুর্গে মারাঠা পতাকা উত্তোলিত হয়। কিন্তু মারাঠাশক্তির এই বিস্তার তাদের আফগানদের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করতে বাধ্য করলো। ১৭৬১ সালের ১৬ই জানুয়ারী, পাণিপথের প্রান্তরে অন্যান্য বারের মতো ভারতের ভাগ্য পুনরায় নিৰ্দ্ধারিত হলো। মারাঠা কর্তৃক ভারতে হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনের আশা ধূলিসাৎ করে দিয়ে আইমদ শাহ আবদালী বিজয়ী হলেন। লোককল্যাণকারী এই যুদ্ধের পরিণাম-স্বরূপ অর্থ-সম্পদ মান-মর্যাদা হারিয়ে মারাঠা প্রভাব ভারতে স্তান হলো এবং কয়েকমাস পরেই ২৩শে জুন তারিখে পেশোয়া বালাজী বাজীরাজ ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করলেন।

কিন্তু, দশ বছরের মধ্যেই প্রতিভাশালী পেশোয়া প্রথম মাধো রাও-এর আমলে মারাঠারা পাণিপথে পরাজয়ের গ্লানি কাটিয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠলো এবং ১৭৭২ সালে নির্বাসিত মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমকে তাঁর পিতৃপুরুষের মসনদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলো। আরও কয়েক বছরের মধ্যে মাধোজী সিন্ধিয়া একনায়করূপে রাজনীতিতে দোখা দিলেন এবং ১৭৮৯ সালে দিল্লীর বাদশাহ পর্য্যন্ত তাঁর করতলগত হতে বাধ্য হলেন। স্যার জন ম্যালকম-এর ভাষায়—Sindhia remained “as the nominal slave but the rigid master of the unfortunate Shah Alam, Emperor of Delhi.”^{১০} ভারতের রাজনীতিতে এই সময়ে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কারণ, সম্রাট করতলগত হলে সাম্রাজ্যের উপর অধিকার বিস্তার করার পথ প্রশস্ত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ভারতে প্রভুত্ব স্থাপনে প্রতিদ্বন্দ্বী ইংরেজ ও মারাঠা শক্তিদ্বয় মোগল সম্রাটকে কুক্ষিগত করে এবং তাঁর নাম ভাঙ্গিয়ে নিজেদের ক্ষমতা বিস্তারে নিযুক্ত ছিল। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার শেষ ১৮০৩-০৪ সালে ইংরেজদের হাতে মারাঠাদের ক্রমাগত পরাজয়ে এবং ১৮১৮ সালে স্যার জন ম্যালকম-এর কাছে পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাজ-এর আত্মসমর্পণে।

মারাঠা শক্তির পরাজয়ের প্রধান কারণ তার নেতৃবর্গের মধ্যে মতানৈক্য। স্বার্থপরতা

ও ঈর্ষার কারণে তারা কখনও একতাবদ্ধ হয়ে ইংরেজদের সম্মুখীন হয়নি। সুদৃঢ় শাসনব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক কাঠামো না থাকায় মারাঠা অধিকৃত অঞ্চলগুলি সহজে ইংরেজদের হস্তগত হলো। তা ছাড়া ইউরোপীয় গোলন্দাজদের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় মারাঠা সেনাপতিগণ যুদ্ধক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে সৈন্য পরিচালনা করতে পারতেন না এবং মারাঠা সৈনিকরা এই পরমুখাপেক্ষিতার কারণে হীনমুগ হয়েছিল। ফলে ইংরেজদের সাহস ও সম্মিলিত সেনাবাহিনী এবং সুশিক্ষিত গোলন্দাজ-বাহিনীর কাছে মারাঠা শক্তি পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হলো।

বাণিজ্যে নিযুক্ত ইউরোপীয় কোম্পানীগুলির ভারতের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ অষ্টাদশ শতাব্দীর আরও একটি প্রধান ঘটনা। ওলন্দাজ কোম্পানী ১৭৫৯ সালের ২৪শে নভেম্বর বেদারার যুদ্ধে ইংরেজদের হাতে পরাজয় বরণ করে ভারতের রাজনীতি থেকে বিদায় নিল। কিন্তু, ভারতে প্রভুত্ব স্থাপনের প্রতিযোগিতায় ইংরেজ ও ফরাসীদের বিবাদ পঞ্চাশ বছরেরও বেশী স্থায়ী হয়েছিল। ২২শে জানুয়ারী ১৭৬০ সালে বন্দীবাস-এর যুদ্ধে লালী'র ভাগ্য বিপর্যয়ের পরেও ফরাসীরা ভারতে তাদের রাজনৈতিক উচ্চাশা ত্যাগ করেনি।^{১১} তারা ইংরেজদের প্রতিদ্বন্দ্বী মারাঠা নেতৃবর্গ, হায়দার আলি ও টিপু'র সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে। ১৭৭৭ সালে সেন্ট লুভিন ইংরেজদের শক্তি হ্রাস করার উদ্দেশ্যে নানা ফড়নবিশের সঙ্গে এক সন্ধি করেন।^{১২} এই একই কারণে তারা মহীশূরের রাজার সঙ্গে সখ্য স্থাপন করে।^{১৩} আমেরিকায় ইংরেজ উপনিবেশগুলির বিদ্রোহে ভারতে ইংরেজ শক্তিকে চরম আঘাত করার প্রত্যাশিত সুযোগ ফরাসীরা পেয়েছিল। ফরাসী সরকার ইংরেজ উপনিবেশগুলির বিদ্রোহকে সমর্থন জানায় এবং বুসী'র নেতৃত্বে ৩,০০০ সৈন্য ও গ্র্যাডমিরাল সুফেন-এর নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী হায়দার আলিকে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে সাহায্য হিসাবে পাঠায়। কিন্তু ফরাসীদের সব চেষ্টা বিফল হলো। ইংরেজরা পুনরায় পণ্ডিচেরী দখল করে নিলো। ফরাসীরা ১৭৮৩ সালের ভার্সাই সন্ধির শর্ত অনুযায়ী পণ্ডিচেরী ফিরে পেলে, কিন্তু তারপরেও তারা নিজাম ও টিপুকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সর্বদা প্ররোচিত করতো। কন'ওয়ালিস পুনরায় রেসিডেন্ট সি. ডব্লিউ. ম্যালেটকে সাবধান করে দিয়ে ১০ই মার্চ, ১৭৯৩ সালের একটি চিঠিতে লেখেন : "I look upon a rupture with Tipoo as a certain and immediate consequence of a war with France"।

১১ *Bengal: Past & Present*, July-Sept., 1931, p. 25.

১২ *ibid.*

১৩ *ibid.*, also; Letter from Earl of Cornwallis to the Secret Committee, dated Fort William, 12th April, 1790 (Forrest, *Selection from the State Papers of the Governor-General of India*, vol. II, Lord Cornwallis, p. 14)

ইউরোপে ফরাসী বিপ্লবের পরবর্তী কালে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হলে ইংরেজরা ভারতে ফরাসী উপনিবেশগুলি অধিকার করতে অগ্রসর হলো। বহু ফরাসী ফ্যাক্টরী ও বাণিজ্য জাহাজ আটক করা হলো।^{১৪} চন্দননগর ও পণ্ডিচেরী ফরাসীদের হাতছাড়া হলো। ভারতে ইংরেজ বিজয়ের খবর জানিয়ে কর্ণওয়ালিস্ কোম্পানীর কোর্ট অফ্ ডিরেক্টরস্কে ১৭৯৩ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখের চিঠিতে লেখেন, “I have great satisfaction in congratulating your Honourable Court on the reduction of the fortress of Pondichery and of all other French Settlements and Factories on the continent of India”। পরবর্তী গভর্নর জেনারেল স্যার জন শোর-এর সময়ে ফরাসীরা অবশ্য ভারতে তাদের প্রভাব পুনরায় বাড়তে সক্ষম হয়; কিন্তু লর্ড ওয়েলেসলী যখন লোহিত সাগর অঞ্চলে অভিযান পাঠিয়ে ফরাসীদের স্থলপথে ভারতে আসার পথ বন্ধ করে দিলেন এবং ফরাসীদের মিত্র ভারতীয় রাজ্যবর্গকে ইংরেজের অনুগত হতে বাধ্য করলেন, তখন ভারতে ফরাসীদের সকল আশা আকাঙ্ক্ষা চিরদিনের জন্য নিমূল হলো।

ইউরোপীয় জাতিগুলির ভারতে নিজেদের মধ্যে বিবাদ ইউরোপে ও আমেরিকায় তাদের শত্রুতাকে কেন্দ্র করে বেড়ে উঠেছিল। অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধ (১৭৪০-৪৮), সপ্তবর্ষ যুদ্ধ (১৭৫৬-৬৩), আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম ও নেপোলিয়ন-এর যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে ভারতেও রণদামামা বেজে উঠেছিল। এই প্রথম সমুদ্রপারে বহির্দেশীয় রাজনৈতিক উত্থান-পতনের সঙ্গে ভারতের ভাগ্য জড়িত হলো। চ্যাথাম, পিট, ওয়েলিংটন ও নেলসনের মতো ক্লাইভ, ওয়ারেন হেস্টিংস, ওয়েলেসলী ও লর্ড ময়রা সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন এবং তাঁদের প্রচেষ্টার যৌথ ফল হিসাবে ভারতে ইংরেজ রাজত্বের বুনিনাদ তৈরী হলো।

ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্য বিস্তারের পিছনে ইংলণ্ডীয় শিল্পবিপ্লবের চাহিদা মিটানোর দাবী খুব বেশী কাজ করেছিল। তাই, নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে চালানোর জন্য এদেশে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করা ইংরেজদের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। এতদিন পর্যন্ত ভারতের অর্থনীতি কৃষি ও হস্তশিল্পের সহ-যোগিতায় ভারসাম্য বজায় রেখে দেশের সকল অভাব মোচন করতো এবং তার উপরে ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে কৃষিজাত, শিল্পজাত ও খনিজ দ্রব্য রপ্তানী করে দেশকে সমৃদ্ধ করেছিল। বাংলাদেশের বাণিজ্য সমৃদ্ধির কথা উল্লেখ করে কর্ণেল আলেকজান্ডার ডে লিখে গেছেন, “It was a sink where gold and silver came without the best protest of return.”। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর অগণিত রাষ্ট্রবিপ্লব, রাজ-

^{১৪} Letter from the Governor-General in Council to the Court of Directors, dated Fort William, August 1, 1793. (Ross, Cornwallis Correspondence Vol. II, pp. 224-26)

নৈতিক মাৎস্যন্যায়, সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও সেই সঙ্গে বিদেশী ইংরেজ বণিকদের অর্থগৃধ্রুতা ভারতের শিল্প ও বাণিজ্যকে ধীরে ধীরে পত্ন করে ফেলেছিল এবং তার ফলে যে অর্থনৈতিক পরমুখাপেক্ষিতা ভারতকে মেনে নিতে হয়েছিল তার কবল থেকে আজও সে নিস্তার পায়নি। রাজনৈতিক কারণে ভারতের বাণিজ্য বিদেশীদের হাতে চলে যাওয়ার ফলে এদেশ থেকে যে পরিমাণ স্বর্ণ-সম্পদ বিদেশে চালান হয়েছিল তাতে ভারত চিরকালের জন্য গরীব হয়ে গেলো। ১৭৬৫ সালে বাংলাদেশের অবস্থা পর্যালোচনা করার জন্য ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে সিলেক্ট কমিটি গঠন করে, তার রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, “We beheld a presidency divided, headstrong and licentious, a government without nerves, a treasury without money and service without subordination, discipline or public spirit.....amidst a general stagnation of useful industry and of licensed commerce, individuals were accumulating immense riches, which they had ravished from the insulted prince and his helpless people, who groaned under the united pressure of discontent, poverty and oppression”। এই রিপোর্ট ১৭৬৭ সালে পেশ করা হয়। জনসাধারণের দুর্দশা ও আর্ডনাদ কোম্পানীর একজন উচ্চপদস্থ অফিসার বিচার্ড বেচার’কেও বিচলিত করেছিল। ১৭৬৯ সালের ২৪শে মে তারিখের চিঠিতে তিনি লণ্ডনস্থিত কোর্ট অফ ডিরেক্টরসকে লেখেন, “It must give pain to an Englishman to have reason to think that since the accession of the Company to the Diwani the condition of the people of this country, has been worse than it was before ; and yet I am afraid the fact is undoubted ;... this fine country, which flourished under the most despotic and arbitrary Government, is verging towards ruin”. বস্তুতঃ ওয়ারেন হেস্টিংস-এর শাসন সংস্কারও দেশকে সেই ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারলো না। কোর্ট অফ ডিরেক্টরসকে ২রা আগস্ট ১৭৮৯ সালে লেখা কর্ণওয়ালিস-এর একটি চিঠি থেকে আমরা জানতে পারি “agriculture and internal commerce have for many years been gradually declining, that at present, excepting the class of shroffs and benias... the inhabitants of these provinces [of Bengal, Bihar and Orissa] were advancing hastily to a general state of poverty and wretchedness.”। এই সময়ে ইংলণ্ডীয় শিল্পবিপ্লবের ও ইউরোপীয় পুঁজিবাদের ঘাত-প্রতিঘাতে ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামো একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিল এবং পরবর্তী শতাব্দীতে ১৮১৩ ও ১৮৩৩-এর চার্টার অ্যাক্টের মাধ্যমে সেই পুঁজিবাদ এদেশে কায়মী স্বার্থ স্থাপন করেছিল। ভারতীয় শাসন ব্যবস্থার পারদর্শী হেনরী টাকার ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডাইরেক্টর হওয়ার পর ১৮২৩ সালে মন্তব্য করেন, “What is the commercial policy which we have adopted in this country with relation to India ? The silk manufactures and its piecegoods made of silk and cotton intermixed, have long since been excluded altogether from

our markets and of late particularly in consequence of the operation of a duty of 67 per cent. but chiefly from the effects of superior machinery, the cotton fabrics which hitherto constituted the staple of India have not only been displaced in this country but we actually exported our cotton manufactures to supply a part of the consumption of our Asiatic possessions. India is thus reduced from the state of a manufacturing to that of an agricultural country”। ভারতের শিল্প ও বাণিজ্যিক অবনতির কারণ হিসাবে একজন বিশিষ্ট ইংরেজ রাজপুরুষের এই স্বীকারোক্তি উল্লেখযোগ্য। ইংরেজ কবি ক্যুপারের একটি কবিতার নিম্নোল্লিখিত অংশটি সেইজন্য স্বতঃই মনে উদয় হয় :

Hast thou, though suckled at fair freedom's breast
Exported slavery to the conquered East,
Pulled down the tyrants India served with dread,
And raised thyself, a greater in their stead ?
Gone thither, armed and hungry, returned full,
Fed from the richest veins of the Moghul,
A despot big with power ordained by wealth,
And that obtained by rapine and by stealth ?
With Asiatic vices stored thy mind,
But left their virtues and thine own behind ;
And having trucked thy soul, brought home the fee
To tempt the poor to sell himself to thee ?

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতের কালিমালিপ্ত ভয়াবহ অধ্যায়ে এই সব হলো বিশিষ্ট ঘটনা ও ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু মানবজীবনের ইতিহাসের নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন দিনেও খুঁজে দেখলে এমন সব উপদেশ ও শিক্ষামূলক উদাহরণ পাওয়া যায় যেগুলি আমাদের চিন্তায় ও কর্মে উৎসাহিত করতে এবং আমাদের জাতীয় জীবনকে সংযত ও সুসংবদ্ধ করতে প্রেরণা দেয়। এই ঐতিহাসিক সত্য চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দেশ ও জাতির প্রতি কর্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধ করে ও ভবিষ্যতের পরিকল্পনার রূপায়ণে প্রত্যেককে সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হতে নির্দেশ দেয়। আচার্য্য যত্নাধ সরকার সেজন্য তাঁর একটি জ্ঞানগর্ভ বাণীতে স্পষ্ট করে বলেছেন, “And yet our immediate historic past, while it resembles a tragedy in its course, is no less potent than a true tragedy to purge the soul by exciting pity and horror. Nor is it wanting in the deepest instruction for the present. The headlong decay of the age-old Muslim rule in India and the utter failure of the last Hindu attempt at empire-building by the new-sprung Marathas, are intimately linked together and must be studied with accuracy of detail as to facts and penetrating analysis as to the causes if we wish to find out the true solutions of the problems of modern India and avoid the pitfalls of the past.”^১

যেখানকার আকাশে বিদ্যুৎ চমকের মতো অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতের তমসাবৃত জাতীয় জীবনের মাঝে কোথাও কোথাও আশার আলো দেখতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ এই যুগে কালরাত্রি শেষ হয়ে নতুন ভারতের উষাকাল আরম্ভ হলো। এই যুগেই রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতি নানা পথে ভারতে অনুপ্রবেশ করেছিল। তার ফলে মধ্যযুগীয় সকল ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে আধুনিকতা, মানবিকতা, জাতীয়তা ও যুক্তিবাদী দর্শনের ভারতের মাটিতে পদার্পণ ও প্রসার সম্ভব হয়েছিল। তারাই প্রভাবে পরবর্তীযুগে ভারতবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামে উৎসাহী হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে জীবনের সকল দিকে বিপর্যয় একরূপ চরমে না উঠলে ভারতীয় জীবনের সকল ব্যবস্থা ও প্রথার মধ্যে যে কি পরিমাণ দুর্নীতির বিষ ও দুর্বলতা জন্ম হয়েছিল তার নথরূপ ও সঠিক পরিচয় আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারতাম না এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে জাতীয় পুনর্জাগরণ দেখা দিয়েছিল, তারও সূচনা হতো না।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় নব্য ইউরোপীয় সংস্কৃতি ও শিক্ষা ভারতকে নবজীবন দান করলো। বেকন লক্, ভলটেয়ার, বার্ক, বেঙ্কাম, মিল ও নিউটনের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও রাজনীতি-দর্শন, এবং উইলবারফোর্স ও তাঁর বন্ধুদের মানবতাবাদ ভারতে আমদানী হলো এবং একটি সম্ভাবনাপূর্ণ নতুন যুগের আগমন ঘোষণা করলো। সংঘাত, সংমিশ্রণ ও নির্ধ্যাতনের আশুনে পুড়ে ভারতের অন্তর্নিহিত গুণাবলী আসল ও খাঁটি রূপ লাভ করে পুনরায় প্রকাশ পেলো এবং ভারতের চিরন্তন সংস্কৃতি আধুনিক রূপ ধারণ করলো। সুবিধাজনক ঐতিহাসিক তারিখ হিসাবে ১৭৮৪ সালে কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে এই নবজাগরণের উন্মেষের সূচনা। উইলিয়ম জোন্স, কোলব্রুক প্রমুখ মনীষীদের জ্ঞান, শুভেচ্ছা ও সহানুভূতির কারণে ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও গৌরবের কাহিনী পৃথিবীর কাছে প্রথম প্রকাশ পেলো। কিন্তু এই সময়কার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা ১৭৭২ সালে ভারতের নবজাগরণের জনক ও প্রথম উদ্গাতা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব, এবং সেই সঙ্গে একথাও স্মরণীয় যে অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতেই তিনি শিক্ষা ও মানসিক বিকাশ লাভ করেন।

লিপি উৎপত্তি ও বর্ণমালার বিকাশ

শ্রীমদনমোহন কুমার

প্রাচীন পারসীক ‘দিপি’ শব্দ ভারতীয় আৰ্য্যভাষায় পরিগৃহীত শব্দ বা loan-word রূপে প্রবেশ করে। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে শব্দটি ভারতীয় আৰ্য্য ভাষায় প্রচলিত ছিল, উত্তর-পশ্চিমা প্রাকৃতে ব্যবহৃত হইত, তাহার প্রমাণ ‘খরোষ্ঠী’ লিপিতে উৎকীর্ণ সম্রাট অশোকের শাহবাজগটী ও মানসেহরা গিরি-অনুশাসনে ‘দিপি’ শব্দটির একাধিকবার প্রয়োগে। ‘দিপি’ শব্দের ভারতীয় আৰ্য্য প্রতিক্রম ‘লিপি’ শব্দটি ব্রাহ্মী হরফে উৎকীর্ণ অশোকের গিনার, কালসী, ধৌলি, জৌগড় গিরি-অনুশাসনে, ধৌলি-জৌগড়ে অশোকের দুইটি স্বতন্ত্র কলিঙ্গ-অনুশাসনে, অশোকের দিল্লী-তোপরা স্তম্ভলিপিতে—অর্থাৎ দক্ষিণ-পশ্চিমা, প্রাচ্যমধ্য ও প্রাচ্যা প্রাকৃতে—এবং পালিভাষায় ‘লিপি’, ‘লিপী’, ‘লিবি’, ‘লিবী’ রূপে পাওয়া যায়—‘ধংম-লিপি’, ‘ধংম-লিপী’, ‘ধংম-লিবি’ অশোকের অনুশাসনে উৎকীর্ণ; পালি ভাষায় ‘লিবি’, ‘লিবী’, জীলিঙ্গে দুই রূপই দেখা যায়। পূর্বতন মহীশূর রাজ্যের (বর্তমান কর্ণাটকের) চিতলদুর্গ জেলার ব্রহ্মগিরিতে, ব্রহ্মগিরি হইতে দুই ক্রোশ দূরে জটিঙ্গ-রামেশ্বরে, এবং ব্রহ্মগিরি ও জটিঙ্গ-রামেশ্বর উভয় স্থান হইতেই দুই ক্রোশ দূরে সিদ্ধপুরে—সন্নিকটবর্তী তিনটি স্থানে—প্রাপ্ত ব্রাহ্মী লিপিতে উৎকীর্ণ অশোকের ক্ষুদ্র গিরি-অনুশাসনের শেষে সংযোজিত “চপডেন লিখিতে লিপিকরেণ” (চপড নামক লিপিকর কর্তৃক লিখিত) অংশটির সর্বশেষে “লিপিকরেণ” শব্দটি খরোষ্ঠী হরফে উৎকীর্ণ। লিপিকর সম্ভবত উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল হইতে খোদাই কার্যের জন্য মহীশূর অঞ্চলে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

সংস্কৃত √ लिष्-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ‘লিখতি’ শব্দের ‘দাগ কাটে, আঁচড় কাটে’ (scratches) অর্থে প্রয়োগ অর্থববেদে এবং ‘লেখে’ (writes) অর্থে প্রয়োগ যাজ্ঞবল্ক্যে। বিদ্বশালভজিকায় ‘লিখিত্’ অর্থে চিত্রকর।

১ প্রাচীন সিরীয় বা আরামীয় লিপি হইতে উদ্ভূত, পারস্য সাম্রাজ্যে সুপ্রচলিত। খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ-৫ম শতাব্দীতে দক্ষিণ-পশ্চিম ইরানের ইরামনীযীর Achaemenian বংশের সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কুরুশ বা সাইরুস Cyrus (৫৫৮—৫৩০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ), দরিউস বা দারয়বুস Darius (৫২২—৪৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ), খ্শয়র্শা বা ক্ষার্বা Xerxes (৪৮৬—৪৬৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) কর্তৃক ভারত আক্রমণ এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে, গন্ধার হইতে আরব সমুদ্র পর্য্যন্ত, পারস্য অধিকার বিস্তৃত হইলে পারস্য হইতে আগত এই লিপি ঐ অঞ্চলে প্রসৃত হয় এবং বহু শতাব্দী ধরিয়া প্রচলিত থাকে (খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে অশোকের সময় হইতে খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দী পর্য্যন্ত খরোষ্ঠী ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে); ভারতীয় বর্ণিক, ধর্ম-প্রচারক ও ঔপনিবেশিকগণ কর্তৃক খ্রীষ্টীয় ৩য় শতাব্দীতে খরোষ্ঠী লিপি মধ্য-এসিয়ায় (চীনের তুর্কিস্তানে) নীত; বর্তমানে লুপ্ত। হিব্রু ভাষায় ব্যবহৃত সেমীয় শব্দ Kharosheth (অর্থ ‘লিখন’, ‘writing’) হইতে ‘খরোষ্ঠী’ শব্দের উৎপত্তি। যতান্তরে, সংস্কৃত ধর+ওষ্ঠ (গর্দভের ওষ্ঠের দ্বারা বক্রাকৃতি) হইতে ‘খরোষ্ঠী’ নাম।

সংস্কৃত √লিপ্, ধাতুর অর্থ ‘বিস্তার করা, লেপন করা’ (to smear); √লিপ্, ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ‘লিম্পতি’ শব্দের অর্থ ‘বিস্তার করে, লেপন করে’ (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে); ভাববাচ্যে ‘লিপাতে’ (ঈশোপনিষদে); এবং ‘লিম্পি’- অর্থ ‘লেখা’ (পঞ্চরাত্রে)।

সং লিপাতে lipyate > পালি লিপ্পতি lippati, প্রাকৃত লিপ্পই lippai, মধ্য ভারতীয় আৰ্য্যভাষায় বহুল ব্যবহৃত।

ঋগ্বেদে ‘রিপ্ত-’ ripta-, অথর্ববেদে ‘লিপ্ত-’ lipta- অর্থ ‘লেপিত, বিস্তারিত’।

প্রাচীন ভারতীয় আৰ্য্য ‘লিখতি’ (√লিখ্), ‘লিম্পতি’ (√লিপ্) শব্দের সহিত প্রাচীন পারসীক হইতে পরিগৃহীত ‘দিপি’ (√দিপ্) শব্দের সংমিশ্রণে (contamination) ভারতীয় আৰ্য্য ভাষায় “লিপি” শব্দটির উৎপত্তি। মধ্য ভারতীয় আৰ্য্য ভাষায়— পালি ও আশাক প্রাকৃতে—ঘোষীভবনের (vocalization) ফলে ধ্বনি-পরিবর্তনে ‘লিবি’ ‘লিবি’ শব্দের প্রয়োগ।

অশোকের কালসী, গিনার, ধৌলি, জৌগড় প্রভৃতি গিরি-অনুশাসনে ও দিল্লী-তোপরা স্তম্ভলিপিতে “ধংমলিপি”, “ধংমলিনী”, “ধংমলিবি” ব্রাহ্মী হরফে উৎকীর্ণ হইয়াছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে শাহ-বাজগটী ও মানসেহরা-য় অশোকের গিরি-অনুশাসনে ‘ধ্রমদিপি’ খরোষ্ঠী হরফে উৎকীর্ণ।

ইরানের হখামনীষবংশীয় (Achaemenian) সম্রাটগণের (খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ হইতে ৪র্থ শতক) শিলালিপিতে ‘দিপি’ শব্দ ‘লিখন’ অর্থে ব্যবহৃত। ব্রাহ্মী হরফে উৎকীর্ণ অশোক-লিপিতে ‘লিখিত’, ‘লেখিত’, ‘লেখাপিত’ শব্দগুলি খরোষ্ঠী প্রতিলিপিতে ‘নিপিস্ত’, ‘নিপেসিত’, ‘নিপেস্পিত’ রূপে ব্যবহৃত। প্রাচীন পারসীক ‘নিপিস্’ শব্দের অর্থ ‘লেখা’ (to write)। হখামনীষীয় শিলালিপিতেও ‘নিপিস্’ একই অর্থে ব্যবহৃত। ‘লিপি’ শব্দের উৎপত্তিতে প্রাচীন পারসীক ‘দিপি’^১ ও ‘নিপিস্’ শব্দের সাদৃশ্য ও প্রভাব রহিয়াছে। √লিপ্ > লিম্পতি, লিম্পি- শব্দের সহিত প্রাচীন পারসীক ‘দিপি’-শব্দের সংমিশ্রণে ‘লিপি’।

সংস্কৃত √লিপ্, ধাতুর অর্থ ‘লেপন করা, বিস্তার করা’। প্রাচীন ভারতবর্ষে ভূর্জত্বকে ও তালপত্রে ধাতুনির্মিত সূক্ষ্মগ্র লেখনীদ্বারা আঁচড় কাটিয়া তাহার উপর রঞ্জক-পদার্থ বা কালি মাখাইয়া দেওয়া হইত। এই রঞ্জক-পদার্থ বা বর্ণ (বর্ণ) লেপন করা বা বিস্তার করা হইতে ‘লিপি’ ও ‘বর্ণ’ শব্দের উৎপত্তি। √ব্ > বর্ণ; যাহা আবরণ করে সেই বাহিরের রূপ বা আকৃতি ‘বর্ণ’। ধ্বনির আবরণ-বা আচ্ছাদন-রূপ ‘বর্ণ’, ধ্বনির লিখিত রূপ ‘বর্ণ’। ‘বর্ণ্যতে রজ্যতে ইতি বিলেপনম্’, ভূর্জত্বকে বা তালপত্রে অঙ্কিত

১ ডু° দবির খাস=Private Secretary. [দিপিবর > দবির; পারসীক দবীর dabir (writer)+আরবী খাস khāṣṣ (personal Secretary)] ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের মধ্যযুগের বাকলা ভাষায় ‘দবির খাস’ সুপ্রচলিত ও সুপ্রচলিত শব্দ।

রেখার উপর উপর রঞ্জকদ্রব্য বা কালির বিলেপনের বাহিরের রূপ বা আকৃতি ‘বর্ণ’। সংস্কৃত ‘বর্ণ’ শব্দের সহিত তুলনীয় শ্রাব্ Vranu, (‘black’, ‘a crow’); লিথুয়ানীয় Varnas, (‘a crow’).

বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত সার্থক ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি ‘শব্দ’। বিশেষ জনসমাজে ব্যবহৃত অর্থবোধক শব্দসমষ্টি ‘ভাষা’। মুখের ভাষায় প্রকাশিত শব্দকে স্থায়ী রূপ দিবার চেষ্টায় লিপির উৎপত্তি বা আবিষ্কার। ভাষার তুলনায় লিপি অনেক অর্বাচীন। লিপির ইতিহাস মাত্র ছয় হাজার বছরের।

মুখের কথা বা ধ্বনিসমষ্টি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে হারাইয়া যায়, অনুপস্থিত ব্যক্তি বা অনাগত কালের নিকট তাহা পৌঁছাইয়া দিবার জন্য প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে মানুষ নানা চেষ্টা করিয়াছে। নানা স্মারক-পদ্ধতির সাহায্যে মানুষ ভাবকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে; দক্ষিণ-আমেরিকার পেরুর প্রাচীন অধিবাসীরা নানা রঙের সরু-মোটা দড়ির গুছি বিভিন্ন ধরণে ও কৌশলে, বিভিন্ন দৈর্ঘ্যে, বিভিন্ন দূরত্বে, গিঁঠ বাঁধিয়া নানা ঘটনার কাল, পণ্যদ্রব্যের সংখ্যা-মূল্য-লেনদেনের হিসাব, নিজ নিজ বিভিন্ন শ্রেণীর পশু, শস্য ও সম্পদের হিসাব রাখিত। দক্ষিণ-আমেরিকার ইনকা (Inca) সাম্রাজ্যে এই গ্রন্থি-পদ্ধতিতে বিভিন্ন অঞ্চলে রাজকীয় আদেশ ও রাজকীয় হিসাব রাখা হইত, এজন্য গ্রন্থি-পাঠ-কুশলী উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী নিযুক্ত হইত। পেরুর পুনা (Puna) পশু-পালকদের, ক্যালিফোর্নিয়ার পলোনি (Paloni) রেড ইণ্ডিয়ানদের, মেজিকোর জুনি (Zuni) উপজাতিদের, জাপানের রিউকিউ (Riukiu) দ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে এই পদ্ধতির প্রচলন দেখা যায়। ইউরোপে পুরুষেরা ক্রমালে গিঁট বাঁধিয়া এবং এদেশে পুরুষেরা কোঁচার খুঁটে ও মেয়েরা আঁচলে গিঁট বাঁধিয়া এই স্মারক-পদ্ধতির সাহায্যে আগামী দিনের কৃত্যলিপির (diary) কাজ চালাইতেছে। পেরুর ভাষায় কুইপু (Quipu) শব্দটির অর্থ ‘গ্রন্থি’, শব্দটি গ্রন্থি-লিখন-পদ্ধতি অর্থে বহু ইউরোপীয় ভাষায় গৃহীত। উত্তর-আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানরা মৃগচর্মের কোমরবন্ধে (wampum belt-এ) নানা বর্ণের বিন্দুক, গুটি, পুঁতি গাঁধিয়া একই পদ্ধতিতে অতীত ঘটনা, যুদ্ধবিগ্রহের সন-তারিখ, সন্ধির সর্ত, জমির সীমানা চিহ্নিত করে। দশ হাজার বছর পূর্বেও মানুষ গিরিগুহায় চিত্র অঙ্কন করিয়া শিকার, যুদ্ধ, প্রেম, গৃহজীবন ও দাবানলের ছবিকে ধরিয়া রাখিয়াছে। ‘কুইপু’ গ্রন্থিবন্ধন, ‘ওয়াম্পাম’ কোমরবন্ধ, প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্র—লিপি-আবিষ্কারের দিকে মানুষের পদক্ষেপ, লিপির প্রাকরূপ, কিন্তু শব্দ বা ধ্বনির লিখিত প্রতীক—‘লিপি’—নয়, ধ্বনির আবরণ-রূপ নয়।

লিপি আবিষ্কারের চারটি স্তর। প্রথম স্তরে মানুষ শব্দভোজিত বস্তুর রেখাচিত্র অঙ্কন শুরু করে। এই ‘চিত্রলিপি’ (Pictogram)—শব্দের প্রতীক হওয়ায়—লিপির প্রথম স্যোপান। ক্রমে ভাব, বস্তু, ঘটনা বুঝাইতে রেখাচিত্র অঙ্কন না করিয়া গোষ্ঠীমধ্যে

সুপ্রচলিত প্রতীকচিহ্ন আঁকিয়া শব্দের ছোতনা শুরু হয়। এই দ্বিতীয় স্তরের প্রচেষ্টা ‘ভাবলিপি’ (Ideogram)—প্রতীকচিহ্ন দ্বারা শব্দের ভাব বা অর্থছোতনা ইহার বৈশিষ্ট্য। তৃতীয় স্তরে শব্দের প্রতীকরূপে সুনির্দিষ্ট চিহ্নমাত্র অঙ্কনের দ্বারা ‘শব্দলিপি’ (Phonogram)—এই স্তরে রেখালিপির সাহায্যে শব্দ প্রকাশিত। চতুর্থ স্তরে শব্দের সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্র ক্রমে শব্দের আত্মধ্বনির প্রতীক হইয়া দাঁড়ায়। হিব্রু ‘আলেফ’ (aleph) অর্থ ‘বৃষ’, বৃষমূণ্ডের সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্র ফিনিশীয় বর্ণমালার মাধ্যমে আত্মধ্বনির প্রতীকচিহ্নের রূপান্তরে গ্রীক alpha (আল্ফা) বর্ণ। এই আত্মধ্বনি-নির্দেশের ফলে ‘অক্ষরলিপি’-র (Syllabic Script) এবং পরবর্তীকালে আধুনিক ‘বর্ণলিপি’-র (Alphabetic Script) উদ্ভব।

চিত্রলিপির নিদর্শন উত্তর-আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের লিপিতে। চিত্রলিপি হইতে ভাবলিপিতে বিকাশের নিদর্শন মেস্কিকোর আজটেক (Aztec) লিপিতে এবং ইউকাটন (Yucatan) ও গুয়াতেমালার (Guatemala) ‘মায়’ (Maya) লিপিতে। শব্দলিপির নিদর্শন প্রাচীন মিশরের পুরোহিতদের হিয়েরোগ্লিফিক [hieroglyphic, hiero=sacred, glypho=to carve] লিপিতে এবং প্রাচীন চীনা লিপিতে। চিত্রলিপি, ভাবলিপি, শব্দলিপি তিনটিই চীনদেশের লিপিতে ক্রমবিকশিত। চীন, জাপান, কোরিয়া তিন প্রতিবেশী দেশে তিনটি পৃথক লিপি-পদ্ধতি—চীনে ‘ভাবলিপি’, জাপানে ‘অক্ষরলিপি’ (খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে চৈনিক সভ্যতার সহিত সংস্পর্শে চীনা লিপি-পদ্ধতির রূপান্তরে), এবং কোরিয়ায় ‘বর্ণলিপি’ (সংস্কৃত বর্ণমালা হইতে গৃহীত)।

খ্রীষ্ট-পূর্ব তিন সহস্রাব্দের পূর্বে মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণাংশে সুমেরীয় জাতির লিপি এখনও পর্যন্ত প্রাচীনতম লিপির নিদর্শন। এই লিপি বাণমুখ (cuneiform)^১, কীলকাকৃতি (wedge-shaped)। সুমেরীয়দের নিকট হইতে ব্যাবিলোনিয়েরা এই বাণমুখ লিপি গ্রহণ করে। সুমেরীয় প্রভাবে আনুমানিক ৩০০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে মিশরীয় লিপির উদ্ভব। মিশরীয় লিপির প্রভাব প্রাচীন ইজিপ্তিয়ানদের মধ্যে পড়ে এবং অনুমান ২০০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে ক্রীটদ্বীপে মিনোয়ান লিপির (Minoan Script) উদ্ভব হয়। ইহার কিছুকাল পরে আনাতোলিয়ায় হিট্টী (Hittite) সাম্রাজ্যে হিট্টী হিয়েরোগ্লিফিক লিপির উদ্ভব, পরে হিট্টী বাণমুখ লিপির বিকাশ। চীনদেশে চীনা, পশ্চিম-ইরানে শূশা অঞ্চলে প্রত্ন-এলামীয় (Proto-Elamite), সিন্ধু-অঞ্চলে প্রত্ন-ভারতীয় (Proto-Indian) লিপির উদ্ভব ২০০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে ঘটে।

পৃথিবীর ৭টি প্রাচীন লিপি—সুমেরীয়, মিশরীয়, ক্রীটদ্বীপীয়, হিট্টী, চীনা, প্রত্ন-

১ Latin *cuneus*, a wedge+*forma*, a shape=*cuneiform*. ব্যাবিলনের চতুর্দিকে প্রচুর যুক্তি ও পলিমাটি সহজলভ্য ছিল, যৎকলকে সূচীমুখ শলাকা (stylus) দ্বারা লিখনের সময় হরকগুলি সূচীমুখ ও ক্রমশঃ শূলাকারভাবে কীলকাকৃতি হইত, সেইজন্য এই নাম।

এলামীয়, প্রত্ন-ভারতীয়। এগুলির মধ্যে প্রথম পাঁচটির পাঠোদ্ধার হইয়াছে, প্রত্ন-এলামীয় ও প্রত্ন-ভারতীয় লিপির পাঠোদ্ধার এখনও পর্য্যন্ত হয় নাই। মোহেন-জো-দড়ো ও হড়প্পার প্রাপ্ত প্রত্ন-ভারতীয় লিপিই অথবা ভারতে প্রাপ্ত প্রাচীনতম লিপির নিদর্শন।

চারিটি সুপ্রাচীন লিপি-পদ্ধতি হইতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বর্তমানে ব্যবহৃত লিপিগুলির বিবর্তন ঘটিয়াছে—(১) মেসোপোটেমিয়ায় সুমেরীয়-বাবিলোনীয় বাণমুখ লিপি (cuneiform writing); (২) মিশরীয় পুরোহিতদের প্রাচীন লিপিচিত্র (hieroglyphic writing) ও তাহা হইতে উদ্ভূত শিফ্ট জনের সংক্ষিপ্ত লিপিচিত্র (demotic writing; *demotic*=of the people, Greek *demotikos*=of the people); (৩) প্রত্ন-ভারতীয় লিপি; (৪) চীনীয় লিপি।

মিশরের সংক্ষিপ্ত লিপিচিত্রে ২৪টি—মতান্তরে ২৫টি—প্রতীক-চিহ্নের সাহায্যে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি চিত্রিত। ফিনিশীয় বণিকগণ এই ২৪/২৫টি ধ্বনিচিত্ররূপ গ্রহণ করেন ও সেগুলির রূপান্তর সাধন করেন। ফিনিশীয় বণিকদের নিকট হইতে গ্রীকেরা এই বর্ণমালা গ্রহণ করেন, তাহা হইতে গ্রীক ও রোমক বর্ণমালার উদ্ভব। হিব্রু-আরবী-আরামীয় প্রভৃতি শেমীয় (Semitic) বর্ণমালাও মিশরীয় সংক্ষিপ্ত লিপি হইতে উদ্ভূত। শেমীয় বর্ণমালা দক্ষিণ হইতে বামে লিখিত হয়।

চীনীয় লিপিচিত্র হইতে চীন ও জাপানের লিপির উদ্ভব ও বিবর্তন হয়।

মোহেন-জো-দড়ো ও হড়প্পার আবিষ্কৃত বহু শত মুদ্রা বা সীলমোহরে উৎকীর্ণ, প্রায় চার হাজার বছরের প্রাচীন, প্রত্ন-ভারতীয় লিপির এখনও পর্য্যন্ত পাঠোদ্ধার না হওয়ায় পরবর্তী ভারতীয় লিপির সহিত তাহার যোগসূত্র নিঃসংশয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই প্রত্ন-ভারতীয় লিপির পর খ্রীষ্ট-পূর্ব তৃতীয় শতকে অশোকের উৎকীর্ণ গিরি-অনুশাসনে প্রাচীন ভারতীয় লিপির দুইটি পদ্ধতি পাইতেছি—উত্তরপশ্চিম-সীমান্ত-অঞ্চলে খরোষ্ঠী আর ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে ব্রাহ্মী লিপি। খরোষ্ঠী শেমীয়গোষ্ঠীর আরামীয় লিপি (Aramaic Script) হইতে উদ্ভূত বাণমুখ লিপি, দক্ষিণ হইতে বামে লিখিত। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে খরোষ্ঠী ভারতবর্ষ হইতে চীনীয় তুর্কীস্তান পর্য্যন্ত প্রসৃত হয়। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পর আর ভারতবর্ষে খরোষ্ঠী লিপির সন্ধান পাওয়া যায় না, দেড় হাজার বৎসর পূর্বে খরোষ্ঠী লিপি ভারতবর্ষে লুপ্ত, ব্রাহ্মী-ই সর্ব-ভারতীয় লিপি রূপে প্রতিষ্ঠিত। অশোকের উৎকীর্ণ ব্রাহ্মী হরফের পরিণত গঠন দেখিয়া মনে হয়, ব্রাহ্মী লিপি মৌর্যযুগের কয়েক শতাব্দী পূর্বে উদ্ভূত। ব্রাহ্মী ভারতবর্ষের বাহিরের কোনও লিপি হইতে উদ্ভূত অথবা সিদ্ধ সভ্যতার প্রত্ন-ভারতীয় লিপিচিত্র হইতে বিবর্তিত, সে-সম্বন্ধে মতভেদ ও বিতর্ক আছে।

বুলরের (Buhler)-এর মতে ব্রাহ্মী শেমীয় লিপি। যুক্তিসহ প্রমাণের অভাবে এই মত গ্রাহ্য হয় নাই। প্রাক্-আর্য্য-যুগের প্রত্ন-ভারতীয় লিপির—মোহেন-জো-দড়ো-

হড়প্পায় প্রাপ্ত শত শত মুদ্রালিপির—বিকাশ ব্রাহ্মী লিপি, ইহাই আধুনিক মত। ব্রাহ্মী লিপি রূপান্তরিত হইয়া আধুনিক ভারতীয় লিপিমালার এবং ভোট (তিব্বতী), বর্মী, যবদ্বীপী, সিয়ামী, কোরিয় প্রভৃতি লিপিতে পরিণত। খ্রীষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতক হইতে ব্রাহ্মী লিপি ভারতবর্ষের বাহিরে নীত, গৃহীত ও রূপান্তরিত হইয়া স্থানভেদে নানা রূপ গ্রহণ করিতে থাকে। ব্রহ্মদেশের মোন্ এবং তাহা হইতে উদ্ভূত ব্রহ্ম বা বর্মী লিপি, কছোজের কছোজী ও তজ্জাত দৈ বা থাই বা সিয়ামী লিপি, মালয়ের মালয়ী লিপি, ইন্দোনেশিয়া (বা দ্বীপময় ভারতের) বলি, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, সেলেবেসের লিপি, ফিলিপীন দ্বীপপুঞ্জের লিপি, প্রাচীন চম্পার লিপি, ভোট বা তিব্বতী লিপি, মধ্য-এশিয়ার খোচানের লিপি, কুচা নগরীর কুচী বা তুয়ার (তুখারীয়) লিপি, কোরিয়ার লিপি ইত্যাদি ব্রাহ্মী লিপির রূপান্তর। ভারতের হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম-প্রচারক ও সমুদ্রগামী ভারতীয় বণিক্দের প্রভাবে ভারতীয় ব্রাহ্মী লিপির এই প্রচার ও প্রসার ঘটে।

উত্তর-ভারতে ও দক্ষিণ-ভারতে স্বতন্ত্র ধারায় ব্রাহ্মী লিপির বিবর্তন ঘটিয়াছে। উত্তর-ভারতে খ্রীষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতকে কুষাণ-রাজত্বকালে ও চতুর্থ-পঞ্চম শতকে গুপ্ত-যুগে ব্রাহ্মী লিপির পরিবর্তন ঘটে। ছেনী-বাটালির যুগে পাথরের উপর সযত্নে খোদাই করা অশোকের ব্রাহ্মীলিপির হরফগুলি সরল, অনাড়ম্বর, ভাস্কর্য্যগুণোপেত, জটিলতামুক্ত। পরবর্তীকালে ভূর্জত্বকে ও তালপত্রে কৃত-লিখন ও লিপিচাতুর্য্য-প্রকাশক লিপিকরগণের বিবিধ ছাঁদ ও বৈচিত্র্যের ফলে অক্ষরগুলি ক্রমশঃ জটিল ও কুণ্ডলাকৃতি হইতে থাকে, ভাস্কর্য্যসুলভ অনাড়ম্বর সারল্য হারাইতে থাকে। প্রাদেশিক রূপভেদে তাহাদের রূপও পান্টাইতে থাকে। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর কিছুকাল পরে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রাহ্মী উত্তর-ভারত ও পূর্ব-ভারতে অঞ্চলভেদে তিনটি বিশিষ্ট রূপ লাভ করে— (১) ‘শারদা’ (উত্তর-পশ্চিমে কাশ্মীর-পাঞ্জাবে), (২) ‘নাগর’ (দক্ষিণ-পশ্চিমে—গুজরাট-রাজপুতানা-মালবে—ও মধ্যদেশে), (৩) ‘কুটিল’ (পূর্ব-ভারতে)। গুজরাটের নাগর ব্রাহ্মণ ও রাজপুত রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় সমগ্র উত্তর-ভারতে ক্রমে নাগরীর বিপুল প্রসার ঘটে। ‘নাগর’ হইতে পরবর্তীকালে দেবনাগরী, গুজরাতী, কান্বী লিপির উৎপত্তি; ‘শারদা’ হইতে কাশ্মীরী ও পাঞ্জাবের গুরুমুখী; এবং ‘কুটিল’ হইতে বাঙ্গালা, মৈথিল, অসমীয়া, উড়িয়া ও নেপালী লিপির উৎপত্তি। প্রায় সহস্রাব্দ পূর্বে বাঙ্গালা ও দেবনাগরী লিপি নিজস্ব রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

দক্ষিণ-ভারতে ব্রাহ্মী লিপি স্বতন্ত্র ধারায় বিবর্তিত হইয়া প্রাচীন বট্টে-বুত্ত ও পল্লব লিপির মধ্য দিয়া আধুনিক তমিল, তেলুগু, কানাড়ী, মালয়ালম্ ও গ্রন্থ প্রভৃতি লিপিতে পরিণত হইয়াছে।

১ Vatta < Vatta, 'round' + ezhuttu (ইকৃত), 'Writing' = Vattezhuttu. বর্তমানে এই লিপি অপ্রচলিত।

প্রায় ৪০০ বৎসর ধরিয়া অন্যতম নব্য ভারতীয় আৰ্য্য ভাষা— দিল্লী-মীরাট অঞ্চলের হিন্দুস্থানীর অন্যতর সাহিত্যিক রূপ—উর্দুতে, আরবী-লিপি ও আরবী-ফারসী বর্ণমালা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। প্রত্নভারতীয়, ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠীর পর এই লিপি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে।

আরবের অধিবাসীরা সিরীয়দের নিকট হইতে লিপিবিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছিল। ৮০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে উত্তর-সিরীয়ায় প্রাচীন সিরীয় (Syrian) বা আরামীয় (Aramaic) লিপির ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যায়। খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম শতকে বা তাহার কিছু পূর্বে সিরীয় লিপি হইতে প্রাচীন আরবী লিপির উদ্ভব। কালক্রমে প্রাচীন আরবী লিপির বিবর্তন ঘটে। আরবের নবতীঅন্ (Nabataean বা Nabathaeen) নামক শক্তিশালী জাতি প্রাচীন আরবী লিপির পরিবর্তন ও সংস্কার সাধন করিয়া নব্য আরবী লিপির সৃষ্টি করে—৯ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ হইতে ৭৫ খ্রীষ্ট অব্দের মধ্যে ইহার বিকাশ ঘটে। খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে, মোহম্মদীয় যুগের প্রথম দিকে, দুই রীতির আরবী লিপির প্রচলন ছিল—কুফী (Kufic) ও নশ্বী (Nashki)। বিশেষ আনুষ্ঠানিক ব্যাপার ছাড়া সাধারণ কাজকর্মে বা লেখাপড়ার কাজে ‘কুফী’ লিপির ব্যবহার ক্রমে অপ্রচলিত হইয়া পড়ে। অলঙ্করণের জন্য বা বিশেষ কারুকার্য্য-যুক্ত লিখনের (Calligraphy) জন্য এখনও কচিং আরবী, ফারসী বা উর্দু ভাষা লিখিতে কুফী ব্যবহৃত হয়। নশ্বী বা নসখ্ হইতে আধুনিক আরবী বা তজ্জাত লিপিগুলির উদ্ভব। আরবী লিপি ধ্বনিবিজ্ঞানের দিক হইতে অসম্পূর্ণ হওয়ায় নানা বৈশিষ্ট্যসূচক চিহ্ন বা diacritical marks দ্বারা বর্ণের ধ্বনি বা উচ্চারণ নির্দেশ করা নসখ্ লিপির বর্ণমালায় প্রয়োজন হয়। উত্তর সিরীয়ার খ্রীষ্টানেরা এসট্রাঞ্জেলো (Estrangelo) নামে বিশেষ এক ধাঁচের আরবী লিপি টানা-হাতে-লেখায় ব্যবহার করিতেন—নেস্তোরিয়ন্ Nestorian ধর্মযাজকেরা^১ ঐ লিপি মধ্য-এসিয়ায় লইয়া যান এবং ঐ লিপির বিবর্তনে মধ্য-এসিয়া হইতে মাধুরিয়া পর্য্যন্ত বহু লিপির উদ্ভব ঘটে।

পুরাতন আরবী লিপির অপূর্ণতা পূরণ করার জন্য এবং ঐ লিপিতে হ্রস্বস্বরধ্বনি প্রভৃতির জন্য নির্দিষ্ট বর্ণমালা না থাকায় নানা অসুবিধা দূর করার জন্য কতকগুলি চিহ্ন ও বিন্দু (‘নোক্তা’) সংযুক্ত করিয়া ইহার ব্যবহারিক প্রয়োগ সুগম করা হয়। হ্রস্ব স্বর না থাকায় কেবলমাত্র ব্যঞ্জনধ্বনির সমবায়ে যে ব্যবহারিক অসুবিধা ঘটিতে পারে তাহা দূর করার জন্য এই পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়—‘KI’ ‘কন্’ ক্রত পাঠকালে ভাষার পূর্বাপর সঙ্গতি অনুধাবন করিয়া ‘কন্’ Kal, ‘কিন্’ Kil বা ‘কুল্’ Kul কি উচ্চারণ হইবে তাহা স্থির করিতে হয়। এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য হ্রস্ব স্বরধ্বনি-

১ কনস্তান্টিনোপলের ধর্মযাজক-কুলপতি (Patriarch) নেস্তোরিয়ন্স (৪২৮-৩১৩ঃ) Nestorius-এর অনুগামী খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়।

গুলির জন্ম, হসন্ত বা বিরামচিহ্নের জন্ম, দ্বিত্বব্যাঞ্জনের জন্ম, বিবিধ ধ্বনি নির্দেশের জন্ম নানা চিহ্নের উদ্ভাবন করিয়া আরবী লিপির ক্রমবিকাশ ঘটে।

আরবগণ পারস্যবিজয় করিলে কুফী ও নসখী লিপি পারস্যে প্রসৃত হয়। বর্তমানে নসখী লিপিতেই আরবী লেখা ও ছাপার কাজ চলে, ফারসী ও উর্দুতে লিখিতে এখনও কেহ কেহ নসখী লিপি ব্যবহার করেন। নসখী লিপির পরিবর্তন ও সংস্কার সাধন করিয়া নস্তু'লিক লিপির সৃষ্টি, বর্তমানে আরবী লিপি হইতে বিবর্তিত নস্তু'লিক ধ্বাচের লিপিতেই ফারসী ও উর্দু সাধারণতঃ লিখিত ও মুদ্রিত হয়।

মূল আরবী ভাষায় ২৮টি ধ্বনি, ফারসী ভাষা লেখার জন্ম যখন আরবী লিপি গৃহীত হইল তখন ফারসীর কয়েকটি ধ্বনি আরবীতে না থাকায় আরবী লিপির বর্ণমালায় ফারসী ভাষার জন্ম ৪টি নূতন বর্ণ বা হরফ সৃষ্টি করিতে হইল।

ভারতীয় ভাষা উর্দু—(অর্থাৎ, আরবী-লিপিতে আরবী-ফারসী বর্ণমালায় লিখিত হিন্দু-স্থানী ভাষা, মৌখিক ভাষা খড়ী-বোলীর ব্যাকরণ ও দৈনন্দিন সাধারণ জীবনের ব্যবহৃত পরিচিত শব্দগুলির সহিত দর্শন-বিজ্ঞান-শিল্পকলা-সাহিত্য-বিষয়ক উচ্চ কোটির ফারসী বা আরবী শব্দ-সহযোগে সৃষ্ট নব্য ভারতীয় আৰ্য্য ভাষা)—লেখার জন্ম হিন্দীর কতকগুলি ধ্বনি (যেগুলি আরবী ও ফারসীতে লেখার জন্ম ছিল না সেগুলি) প্রকাশ করার প্রয়োজনে আরও কয়েকটি নূতন বর্ণ সৃষ্টি করিতে হয়। আরবী বর্ণমালার ২৮টি বর্ণের সহিত ফারসী ভাষায় নূতন করিয়া সংযোজিত ৪টি বর্ণ ছাড়াও হিন্দীর আরও ৩টি বর্ণ যোগ করিয়া মোট ৩৫টি বর্ণ লইয়া উর্দু বর্ণমালা সৃষ্টি হয়।

উর্দুতে মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলির জন্ম পৃথক হরফ নাই; অল্পপ্রাণ বর্ণগুলির পরে 'হ' যোগ করিয়া মহাপ্রাণ ধ্বনি বুঝান হয়—খ=ক্হ Kh, ঘ=গ্হ Gh ইত্যাদি। সিন্ধী ভাষা আরবী-ফারসী বর্ণমালা গ্রহণ করিয়া মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলির জন্ম হরফ সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে। সেইজন্য উর্দু অপেক্ষা সিন্ধীর হরফের সংখ্যা বেশী।

উর্দু নব্য ভারতীয় আৰ্য্যভাষা হইলেও ভারতীয় আৰ্য্যভাষার বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে সজ্জিত বর্ণমালা গ্রহণ করে নাই; আরবী-লিপির বর্ণমালা গ্রহণ করায় ধ্বনি প্রকাশে কতকগুলি ব্যবহারিক অসুবিধা ও অপূর্ণতার সম্মুখীন হইয়াছে এবং হিন্দুস্থানী ভাষার সমস্ত ধ্বনি প্রকাশে সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়া উঠে নাই।

আরবী লিপির 'নোক্তা' বা বিন্দু, লিপির অপূর্ণতা দূরীকরণে কিছুটা সহায়ক হইয়াছে। বিভিন্ন ব্যঞ্জনধ্বনির বিশিষ্ট প্রতীকরূপে একটি, দুইটি বা তিনটি বিন্দু ব্যবহৃত হয়। একটি সরল চিহ্নের মাধ্যম অথবা নীচে এক বা একাধিক বিন্দু নির্দিষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনিকে বুঝায়। যেমন, একটি সরল চিহ্নের মাধ্যম একটি বিন্দু দিলে 'ন', তলায় বা নীচে একটি বিন্দু দিলে 'ব'; মাধ্যম দুইটি বিন্দু দিলে 'ত', তলায় দুটি বিন্দু দিলে 'ন্ন', 'এ' বা 'ঈ'; মাধ্যম তিনটি বিন্দু দিলে 'য' বা 'স', তলায় তিনটি বিন্দু দিলে 'প' হয়।

‘এ, ঐ, ঐ’ দ্ব্যক্ষর (diphthong) ও দীর্ঘস্বর (long vowel) এবং ব্যঞ্জনধ্বনি ‘য়’, ‘ব’ (v, w), এবং ‘ও, ঔ, উ’ ধ্বনিগুলির পার্থক্য আরবী লিপিমালায় প্রদর্শিত হয় না। আরবী লিপির আর একটি অসুবিধা, ইহা ডানদিক হইতে বামদিকে লেখা হইলেও ইহাতে সংখ্যাবোধক চিহ্নগুলি বামদিক হইতে ডাহিনে লেখা হয়। সংখ্যাচিহ্নগুলি ভারতবর্ষ হইতে আরবে নীত হওয়ায় সম্ভবতঃ ইহা ঘটয়াছে।

এইরূপ কতকগুলি ব্যবহারিক অসুবিধার জন্য প্রগতিশীল তুর্কী ইসলামধর্মাবলম্বী হইয়াও আরবী লিপি ও বর্ণমালা ত্যাগ করিয়া রোমান লিপি ও বর্ণমালা গ্রহণ করিয়াছে।

আরবী ও ফারসী লিপির সৌন্দর্য্য ও কারুকার্য্যময় লিখন-প্রণালী (১) দৃঢ় সবল ভাঙ্করাগুণোপেত সরলরেখায় লিখিত কুফী লিপিতে, (২) ছন্দিত নসখী লিপিতে, এবং (৩) হিল্লোলিত নস্ত’লিক লিপিতে প্রকাশিত। কিন্তু ভাষাজ্ঞান বেশ পাকা না হইলে এই লিপি বিপুলভাবে দ্রুত পাঠ করা কঠিন। দ্রুত লিখনের জন্য পাকা হাতের আরবী লিপি যাহা ‘শিকস্তা’ নামে পরিচিত তাহার বিশুদ্ধ দ্রুতপঠন সাধারণের পক্ষে সহজসাধ্য নহে। সম্ভবতঃ এই সকল কারণে আরবী লিপি এবং আরবী-ফারসী বর্ণমালা ভারতে প্রচলিত হইলেও উর্দু, কাশ্মীরী ও সিন্ধী ছাড়া অন্যান্য ভারতীয়-ভাষাভাষী মুসলমানগণ অনেকেই নিজ নিজ মাতৃভাষায় লেখার জন্য এই লিপি সাধারণতঃ ব্যবহার করেন না।

হিন্দোস্তানী বা হিন্দুস্তানী দিল্লী-মীরাত অঞ্চলের পশ্চিমা-হিন্দী কথ্যভাষা, সন্নিহিত পাঞ্জাবী ও রাজস্থানী ভাষার দ্বারা ইহা বহল-প্রভাবিত। রাজধানী ও তাহার সন্নিকটবর্তী স্থানের ভাষা হওয়ায় মুসলমান রাজত্বকালে তুর্কী, ফারসী ও পৃষ্ঠো ভাষাভাষী অভিজাতবর্গ ইহা গ্রহণ করেন। এই সহজবোধ্য বাজার-চলুতি ভাষা, সেনানিবাসের ভাষারূপে ব্যবহৃত হইতে থাকে। তুর্কী ওর্দু Ordu, (অর্থ সেনানিবাস, ছাউনী ; বাদশাহী লঙ্ঘর) > উর্দু। মোগল বাদশাহদের সময় তাঁহাদের ফৌজ লঙ্ঘরেরা যে ভাষায় সেনানিবাসে ও বাজারে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে কথোপকথন করিত সেই মিশ্রিত ভাষা (patois) উর্দু। মুসলমান শাসক ও অভিজাতদের সহায়তায় দিল্লী-মীরাত, আশ্বালা-রামপুর, পাঞ্জাব-রাজস্থান—ক্রমে উত্তর-ভারতের সর্বত্র এই হিন্দোস্তানী ভাষা ছড়াইয়া পড়ে—নাগরী ও আরবী লিপিতে লিখিত হইতে থাকে। মুসলমান শাসনের পূর্বে শৌরসেনী অবহট্টের ন্যায় ইহা ক্রমে উত্তর-ভারতের সর্বজনবোধ্য সাধারণ ভাষা *lingua franca*-র পরিণত হয়। এই মৌখিক ভাষা ক্রমে চিঠিপত্রে, দলিল-দস্তাবেজে ও সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে দাক্ষিণাত্য-প্রবাসী উত্তর-ভারতের মুসলমানগণ ইহা সাহিত্য-রচনায় ব্যবহার করিতেন। দাক্ষিণাত্যে গোলকুণ্ডার অধিপতি মুহম্মদ কুলি কুতব্ শাহ (মৃত্যু ১৬১১ খ্রী) উর্দু ভাষায় দাক্ষিণাত্যের অন্যতম বিশিষ্ট কবি। চতুর্দশ শতকে দিল্লীতে আমির খুসরো (১২৫৩-১৩২৫ খ্রী) পশ্চিমা-হিন্দী কথ্যভাষার আধারে সৃষ্ট

সাহিত্যিক ভাষা উদ্ভূত^১ কবিতা রচনা করিয়াছেন বলিয়া কেহ কেহ দাবি করেন^২। চতুর্দশ শতকে সৈয়দ মুহম্মদ বন্দ-নওয়াজ্-গেসু-দরাজ্ (মৃত্যু ১৪৪২ খ্রী) “মিরাজু-ল-‘আসিকীন” নামক সুফী গ্রন্থে উদ্ভূত ব্যবহার করিয়াছেন। T. Grahama Bailey “Urdu: the name and the Language” (Journal of the Royal Asiatic Society, London, April 1930) প্রবন্ধে উদ্ভূত ভাষা একাদশ শতকে, গজনির মামুদ কর্তৃক পাঞ্জাব অধিকারের (১০২৭ খ্রী) পর, লাহোরের পুরাতন পাঞ্জাবী হইতে উদ্ভূত এবং পরবর্তীকালে দিল্লী অঞ্চলের ‘ধড়ী-বোলী’ অর্থাৎ সাধারণে প্রচলিত হিন্দুস্তানী ভাষার দ্বারা সংস্কৃত ও পরিমার্জিত, এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

অষ্টাদশ শতকের শেষ—উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে মুসলমান লেখকদের আরবী লিপিতে লেখা আরবী-ফারসী শব্দ-মিশ্রিত হিন্দুস্তানী (উদ্ভূত)-র পাশাপাশি হিন্দু লেখকগণের দেবনাগরী লিপিতে লেখা সংস্কৃত বা সংস্কৃতায়িত শব্দ-সহযোগে হিন্দুস্তানী ভাষা সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে হিন্দুস্তানী বা উদ্ভূত ভারতবর্ষে ১৫ হইতে ১৬ কোটি লোক ব্যবহার করে, যদিও ইহা ৬ কোটি ভারতবাসীর মাতৃভাষা।^৩

স্বাধীনতা-আন্দোলনের সময় ভারতবর্ষে রাষ্ট্রভাষা বা ‘National Language’ রূপে দেবনাগরী লিপি অথবা আরবী লিপিতে লিখিত হিন্দুস্তানীকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। একদিকে সংস্কৃত অপরদিকে আরবী-ফারসী ভাষা হইতে শব্দগ্রহণ ও শব্দনির্মাণ, এবং দেবনাগরী ও আরবী উভয় লিপির এই ভাষায় ব্যবহার—হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও সম্প্রীতির সহায়ক হইবে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের মনে হয়ত এইরূপ যুক্তি কার্যকর ছিল, প্রধান কারণ অবশ্য সমগ্র উত্তর ভারতে এই ভাষার সহজবোধ্যতা ও বহুল ব্যবহার। উত্তরভারতে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ ও বুদ্ধিজীবীগণ অনেকে হিন্দুস্তানী ভাষায় লিখিতে উভয় লিপিতেই ব্যবহার করিতেন। কাশ্মীর-পাঞ্জাব-উত্তরপ্রদেশের বহু অভিজাত হিন্দু পরিবারেও উদ্ভূত মাতৃভাষারূপে কথিত হইত। জওহরলাল নেহরুর মাতৃভাষা ছিল উদ্ভূত। গান্ধীজি উত্তর-ভারতে এই সর্বজনবোধ্য সহজ হিন্দুস্তানীকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে চাহিয়াছিলেন; ১৯১৮ সালে ইন্দোরে হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলনে তাঁহার ভাষণ হইতে আয়ত্না তিনি এই মতই প্রচার করিয়াছেন। মৃত্যুর সাড়ে তিন মাস পূর্বেও ১২ই অক্টোবর ১৯৪৭ ‘হরিজনসেবক’-এ প্রকাশিত গান্ধীজির উক্তি স্মরণীয় :

১ আমির খুসরো ইহাকে ‘হিন্দী’, ‘হিন্দবী’, ‘জবানে দেহলবী’ (দিল্লীর ভাষা) বলিয়াছেন। ভারতের দক্ষিণে ইহাকে ‘দকিনী’, গুজরাতে ‘গুজবী’ (গুজরাতি উদ্ভূত) বলা হইয়াছে। পরে ইহার নাম হয় ‘জবানে উদ্ভূত’।

২ বালমুকুন্ড গুপ্ত, “হিন্দীভাষা”, কলিকাতা, সংবৎ ১৯৩৪, পৃ. ২।

৩ Suniti Kumar Chatterji—The Origin and Development of the Bengali Language, Vol. III (George Allen & Unwin, London, 1971), p. 3. See also ‘Report of the Language Commission’ (Publication Dept., Govt. of India, New Delhi, 1956) with Notes of Dissent by Suniti Kumar Chatterji and P. Subbarayan.

“This Hindustani should be neither Sanskritised Hindi nor Persianised Urdu but a happy combination of both. It should also freely admit words wherever necessary from the different regional languages as also assimilate words from foreign languages, provided they can mix well and easily with our national language. Thus our national language must develop into a rich and powerful instrument capable of expressing the whole gamut of human thoughts and feelings. To confine oneself exclusively to Hindi or Urdu would be a crime against intelligence and the spirit of patriotism”.

উভয় লিপির বন্ধনে বাঁধা হিন্দুস্তানিকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করিয়া গান্ধীজি ও নেহরু সাম্প্রদায়িক ঐক্যের যোগসূত্র অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাহিয়াছিলেন। হিন্দুস্তানী নয়, হিন্দী এবং কেবলমাত্র নাগরী লিপিতে লিখিত হিন্দী-ই রাষ্ট্রভাষা হইবে, হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলন এইরূপ উগ্র মত প্রচার করায়, গান্ধীজি হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলন হইতে পদত্যাগ করেন এবং ১৫ই জুলাই ১৯৪৫ পুরুষোত্তম দাস টাউনকে একখানি পত্রে লেখেন :

‘my definition of *Rashtra Bhasha* (national language) includes a knowledge of both Hindi and Urdu and both the Nagri and Urdu scripts. Only thus can a happy fusion of Hindi and Urdu take place.’

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের শাসনতন্ত্রে (Constitutionএ) হিন্দুস্তানী ভাষা কংগ্রেসের সরকারী ভাষারূপে প্রথম স্বীকৃতি পায়। হিন্দুস্তানীর দুই লিপিকেই স্বীকার করিয়া কংগ্রেস রাষ্ট্রভাষা-সমস্যার ও লিপি-সমস্যার সমাধান-কল্পে স্থির করেন, ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইতেছে ‘হিন্দুস্তানী’ (হিন্দুর সংস্কৃত-বহুল সাধু-হিন্দীও নয়, মুসলমানের ফারসী-বহুল উর্দুও নয়), এবং এই রাষ্ট্রভাষা দেবনাগরী ও আরবী দুই লিপির যে কোনও একটিতে ইচ্ছামতো লেখা চলিবে।

চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারি রাষ্ট্রভাষা হিন্দুস্তানী তিন লিপিতে—দেবনাগরী, আরবী ও আঞ্চলিক লিপিতে (regional scriptএ)—লেখা চলিবে মত দিয়াছিলেন।

স্বাধীনতার পূর্বলগ্নে Constituent Assemblyতে ভারতের রাষ্ট্রভাষা (‘national language’) লইয়া বহু বিতর্ক ও উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা হইয়াছে। “Constituent Assembly Debates”-এ ও “Reports of Committees of the Constituent Assembly of India”-র প্রকাশিত বিবরণগুলিতে এবং Indian National Archives-এ রক্ষিত ভাষা-বিষয়ক দুইটি গোপন বিতর্কের বিবরণে তাহার পূর্ণ ইতিহাস আছে। অনুসন্ধিসূ পাঠক সেখানে বহু বিচিত্র কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য পাইবেন।^১

১ এ বিষয়ে অতি-সংক্ষিপ্ত বিবরণ দ্র’ H. M. Seervai, *Constitutional Law of India, A Critical Commentary*, (Bombay, 1967), ch. XIII ‘Official Language’, p 971 ff.

বিদেশী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী Granville Austin-এর *The Indian Constitution : Cornerstone of*

Constituent Assembly-র Fundamental Rights Sub-Committee

২৪শে ও ২৫শে মার্চ ১৯৪৭ দুইটি অধিবেশনের পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন :

"Hindustani, written at the option of the citizen in the Devnagari or the Persian script, shall, as the national language, be the first official language of the Union. English shall be the second official language for such period as the Union may by law determine."

মিঃ মাসানী (বোম্বাইয়ের পার্শী, কংগ্রেস-সদস্য) ও শ্রীমতী হংস মেহতা (বোম্বাইয়ের হিন্দু ব্রাহ্মণ, কংগ্রেস-সদস্য) এ সম্বন্ধে তাঁহাদের মতান্তর-লিপিতে (note of dissent) লেখেন, তৃতীয় একটি লিপি—রোমান লিপিতেও—রাষ্ট্রভাষা হিন্দুস্তানী লেখা চলিবে, কারণ দক্ষিণ-ভারতের লক্ষ লক্ষ লোক নাগরী বা উর্দু (আরবী) লিপির সহিত অপরিচিত।

১৪ই জুলাই ১৯৪৭—দেশ-বিভাগের ঠিক এক মাস পূর্বে—কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলিতে গোঁড়া হিন্দীওয়ালারা ইংরেজী, হিন্দুস্তানী ও অন্যান্য সমৃদ্ধ আঞ্চলিক ভাষার দাবীর বিরুদ্ধে সম্মত আন্দোলন শুরু করেন এবং 'হিন্দুস্তানী'র পরিবর্তে 'হিন্দী' রাষ্ট্রভাষা হইবে এই দাবী উত্থাপন করেন। এ বিষয়ে আলোচনার জন্য ১৬ই জুলাই ১৯৪৭ কংগ্রেস এসেম্বলি পাটির বৈঠকে ৬৩ : ৩২ ভোটে গৃহীত হয় যে 'হিন্দুস্তানী' নয়, 'হিন্দী'-ই ভারতের রাষ্ট্রভাষা ('national language') হইবে; ৬৩ : ১৮ ভোটে গৃহীত হয় যে 'নাগরী' লিপিতে ভারতের "জাতীয় লিপি" ('national script') হইবে; এবং ইংরেজী 'দ্বিতীয় ভাষা' ('second language') রূপে চলিতে পারিবে। এই প্রস্তাবগুলির সহিত কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলিতে আরও একটি প্রস্তাব সংবিধান-রচনার সময় হিন্দীর সমর্থকগণ উত্থাপন করেন—দেবনাগরী লিপিতে লিখিত সংখ্যাচিহ্নগুলিই সংবিধানে স্বীকৃত হইবে এবং সরকারী কাজকর্মে ব্যবহৃত হইবে। ভারতীয় সংবিধান রচনার সময় এ-বিষয়ে বহু বিতর্ক ও তিক্ততার পর ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৯ মূলী-আয়তনের^১ উদ্ভাবিত সূত্রে ভাষা-ও লিপি-সমস্যার সমাধানকল্পে এক আপোষ হয়। তদনুযায়ী ভারতীয় সংবিধানের ৩৪৩ অনুচ্ছেদ গৃহীত হয় : দেবনাগরী লিপিতে লেখা হিন্দী ভারতের 'সরকারী ভাষা' (Official language) হইবে, ভারতীয় সংখ্যাচিহ্নের আন্তর্জাতিক রূপ^২ সরকারী কাজে

A Nation, (Oxford University Press, 1966 ; Indian edition 1972) গ্রন্থের 'Language and the Constitution—The Half-hearted Compromise' নামক অধ্যায়ে একটি সংক্ষিপ্ত অধ্যয়ন চিত্তাকর্ষক বিবরণ আছে।

১ গুজরাতিভাষী কে. এম. মুন্সী ও তামিলভাষী দেওয়ান বাহাদুর (মুঃ) এন. গোপালস্বামী আয়তন।

২ ২৬শে আগস্ট ১৯৪৯ কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলিতে নাগরী লিপিতে লিখিত সংখ্যাচিহ্ন বনাম আন্তর্জাতিক সংখ্যাচিহ্ন বিতর্কে, ডিভিসনে ভোট গণনায় ৭৪ : ৭৪ কল হয়। হিন্দী-সমর্থকদের একজন ভোটাভাড়া নাগরীর পক্ষে ভোট দিয়া জরুরি প্রয়োজনে ডিভিসন দারীর পূর্বে চলিয়া যাওয়ার ৭৫ : ৭৪ দাবী করা হয়। পটভি সীতারামমহা ও জহরলাল নেহরু মন্তব্য করেন যে যন্ত্র ভোটের ব্যবধানে সারা দেশের উপর নাগরী লিপিতে লিখিত সংখ্যাচিহ্ন চাপাইয়া দেওয়া ঠিক হইবে না এবং হিন্দী-

ব্যবহৃত হইবে, এবং সংবিধান প্রবর্তনের পর হইতে ইংরেজী ভাষা অন্ততঃ ১৫ বৎসর সরকারী কাজে চলিবে^১; এবং রাষ্ট্রপতি আদেশ প্রবর্তন করিলে অন্তর্বর্তীকালে ইংরেজী ভাষা ও ভারতীয় সংখ্যার আন্তর্জাতিক চিহ্নগুলি ছাড়া হিন্দী ভাষা ও দেবনাগরী লিপিতে লিখিত সংখ্যাগুলিও সরকারী কাজে ব্যবহৃত হইবে।

Article 343. (1) The official language of the Union shall be Hindi in Devanagari Script.

The form of numerals to be used for the official purposes of the Union shall be the international form of Indian numerals.

(2) Notwithstanding anything in clause (1), for a period of fifteen years from the commencement of this Constitution, the English language shall continue to be used for all the official purposes of the Union for which it was being used immediately before such commencement :

Provided that the President may, during the said period, by order authorise the use of the Hindi language in addition to the English language and of the Devanagari form of numerals in addition to the international form of Indian numerals for any of the official purposes of the Union.

(3) Notwithstanding anything in this article, Parliament may by law provide for the use, after the said period of fifteen years, of—

(a) the English language, or

(b) the Devanagari form of numerals,

for such purposes as may be specified in the law.

বৈচিত্র্যের লীলাভূমি ভারতে একটিমাত্র ‘জাতীয় ভাষা’ (national language) বা ‘জাতীয় লিপি’ (national script) স্বীকৃত হয় নাই। ভারতের প্রধান ১৪টি ভাষা (নিজ নিজ বিশিষ্ট লিপিতে) সংবিধানে স্বীকৃতি পাইয়াছে।

ওয়ালারা তাহাতে সন্মত হন। “the international form of Indian numerals” আরবীতে গৃহীত সংখ্যাচিহ্নের আন্তর্জাতিক রূপ—“an euphemism for Arabic numerals” (Seerbhai, p. 973).

খ্রীষ্টপূর্ব ৩য় শতকে ব্রাহ্মী লিপিতে খোদিত ১, ৪, ৬ সংখ্যা অশোক-অনুশাসনে; খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতকে নানাঘাট প্রত্নলিপিতে ২, ৪, ৬, ৭, ৯; খ্রীষ্টীয় ১ম শতকে নাসিকের গুহালিপিতে ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৯ সংখ্যাচিহ্ন পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় ৭ম শতকে মেনোপোটেমিয়ার Severos Sebokht (আ’ ৬৫০ খ্রিঃ) ভারতীয় হিন্দুদের ব্যবহৃত সংখ্যাগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে হিন্দু জ্যোতিষ গ্রন্থ বাগদাদে আরবী ভাষায় অনুদিত, আরবীর মাধ্যমে ভারতীয় সংখ্যাগুলি ইউরোপে গৃহীত হয়। ১৭৬ খ্রীঃ ম্পেনে একখানি পাণ্ডুলিপিতে আরবী সংখ্যাচিহ্নগুলি ব্যবহৃত।

১ The Official Languages Act, 1963 ২৬শে জানুয়ারি ১৯৬৫ সালের পরেও ইংরেজী ভাষার ব্যবহার সরকারী কার্যে অঙ্গুর রাখিয়াছে এবং ভারত-রাষ্ট্রের ‘Official Language’, দেবনাগরী লিপিতে লিখিত হিন্দী, ইংরেজীকে স্থানচ্যুত করে নাই।

খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা ভাষা নাগরী লিপিতে বাঙ্গালার দুই প্রত্যন্ত অঞ্চলে—পশ্চিমপ্রান্তে মানভূম-পুরুলিয়ায় এবং পূর্বপ্রান্তে শ্রীহটে—দুইটি বিভিন্ন রীতিতে সম্প্রদায়বিশেষের দ্বারা লিখিত হইত। ১২২৪ সালে (১৮১৭ খ্রীঃ) নাগরী অক্ষরে লিখিত ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলের একখানি পুঁথি পুণ্যলোক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বৎসভা মানভূম জেলার লাড়া-পাব্ড়া গ্রাম হইতে সংগ্রহ করিয়া ১৩১৫ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে দান করেন। ৯টি পালায় বিভক্ত ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলের এই অভিনব পুঁথিখানি আগাগোড়া দক্ষিণ-পূর্ব বিহারে ও সম্মিলিত অঞ্চলে প্রচলিত দেবনাগরী অক্ষরে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত—পঞ্চকোট চাকলার নাথদা পরগণার ডিমডিহা গ্রামের (বর্তমান পুরুলিয়া শহর হইতে তিন মাইল উত্তরে) ত্রীপতিত পট্টনাএক কর্তৃক লিখিত, নাথদা পরগণার রুদড়া গ্রামের ছিকু মাঝি পুঁথিখানির অধিকারী, তাঁহার জন্ম ১২২৪ সালের ১৪ই আশ্বিন পুঁথিখানি লিপিকৃত।^১

নাগরী অক্ষরে লিখিত বাঙ্গালা ভাষার কয়েকখানি পুঁথি বন্দাবন হইতে নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব (১৮৬৬-১৯৩৮) মহাশয়ও সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

শ্রীহটে প্রচলিত ‘সিলেট নাগরী’ লিপি শ্রীহট্ট শহরে ও তাহার আশেপাশে খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল; তাঁহারা বাঙ্গালা লিপি বা আরবী লিপি ব্যবহার না করিয়া দেবনাগরী লিপির রূপান্তর সাধন করিয়া এবং বাঙ্গালা বর্ণমালার সংযুক্ত বর্ণগুলির বহুল-সংক্ষেপ করিয়া, কয়েকটি স্বরবর্ণ বর্জন করিয়া, নূতন একটি সংযুক্ত বর্ণ (আলেফ্-লাম আল্, ‘আল্লা’ শব্দ লিখিতেই কেবল এই সংযুক্ত বর্ণটির প্রয়োজন হয়) সৃষ্টি করিয়া এই অভিনব নাগরী লিপিতে বাঙ্গালা ভাষা লিখিতেন। খ্রীষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীতে আরব দেশ হইতে প্রবল শক্তিশালী ধর্মপ্রচারক শাহ জালাল ভারতবর্ষে আসেন, তিনি মুসলমান সৈন্যদের লইয়া শ্রীহট্টের রাজা গৌরগোবিন্দকে আক্রমণ করেন, ১৩৮৪ খ্রী বর্তমান শ্রীহট্ট মুসলমান অধিকারে যায়। শাহ জালালের সহিত আগত মুসলমান সৈন্য, আউলিয়া ও অন্যান্য ব্যক্তি শ্রীহটে উপনিবিষ্ট হন। ইহাদের অনেকেই উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলমান অধিবাসী ছিলেন। শাহ জালাল শ্রীহট্টকে ‘পবিত্র ভূমি’ বলিয়া ঘোষণা করায় ধর্মবিশ্বাসী সাধারণ মুসলমানও উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর ভারত হইতে শ্রীহটে আসিয়া বসতি করেন। উত্তর-পশ্চিমে প্রচলিত হিন্দুস্তানী ভাষা এবং নাগরী লিপি ও নাগরী বর্ণমালা ইহারা ব্যবহার করিতেন। পরে আরবী লিপিতে লিখিত উর্দু ভাষা শ্রীহট্ট অঞ্চলে প্রসারিত হইলে শ্রীহট্টের এই সকল মুসলমান আরবী লিপিতে উর্দু ব্যবহার করিতে লাগিলেন, কিন্তু নাগরী অক্ষরও ত্যাগ করিলেন না। কালক্রমে এই সম্প্রদায়ের বহু

১ ড° শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, ১ম সংস্করণ (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৩০), শ্রীমদনমোহন কুমার সম্পাদিত, ভূমিকা ৩৮০-৩৮১

শিক্ষিত বা নিম্নশ্রেণীর মুসলমান ঋাহারা আরবী-ফারসী-উর্দু জানিতেন না, তাঁহারা স্থানীয় বাঙ্গালা ভাষা এই নাগরী অক্ষরে লিখিতে লাগিলেন। ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে খ্রীষ্ট অঞ্চলে প্রচলিত এই নাগরী লিপি ও বর্ণমালার হস্তলিখিত কোনও নমুনা আমাদের হাতে না আসিলেও খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতকের ষষ্ঠ দশকে—সিপাহীবিদ্রোহের কিছু পরে—মুন্সী আব্দুল করিম^১ নামে খ্রীষ্টবাসী এক সুশিক্ষিত মুসলমান আরব, মিসর ও ইউরোপের নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া স্বদেশ ফিরিয়া খ্রীষ্টে প্রচলিত নাগরী অক্ষরের স্থানীয় প্রচলিত রূপ সংস্কার করিয়া “সিলেট নাগরী” বর্ণমালা নামে অভিহিত করেন এবং এই বর্ণমালায় গ্রন্থ-মুদ্রণ প্রবর্তন করেন। এই হরফে গ্রন্থ মুদ্রিত হওয়ায় খ্রীষ্ট সহর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সীমাবদ্ধ এই লিপি ও বর্ণমালা সমগ্র খ্রীষ্ট জেলায় এবং ক্রমে নিকটবর্তী ত্রিপুরা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, ঢাকা, ময়মনসিংহ এবং কাছাড় জেলায় মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রসার লাভ করে এবং এই বর্ণমালায় বহু গ্রন্থ মুদ্রিত হইতে থাকে। প্রথমে পাথরে খোদাই করিয়া লিখো প্রেসে এই লিপির দুই একখানি কেতাব মুদ্রণের পর কলিকাতার চিংপুর রোডে বেগীমাধব ভট্টাচার্য্যের ‘জেনারেল প্রিন্টিং প্রেস’-এ এই লিপির টাইপ প্রস্তুত করা হয়। সিলেট নাগরীতে লিখিত পুস্তক মুদ্রণ শুরু হয়। পরে কলিকাতার শিয়ালদহের ‘হামিদী প্রেস’ এবং খ্রীষ্ট সহরের ‘ইসলামিয়া প্রেস’ এই কার্যে উৎসাহের সহিত অবতীর্ণ হয়। তারপর ঢাকা ও পূর্ববঙ্গের দুই একটি শহরে এই হরফ বা টাইপে মুদ্রণ শুরু হয়। আরবী-ফারসী-উর্দু-বর্ণপরিচয়-হীন এবং যুক্তাক্ষর-বহুল বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত প্রাচীন বা আধুনিক বঙ্গসাহিত্য পড়িতে অনভ্যস্ত পূর্ববঙ্গের মাঝিমালা, চাষীবাসী ও জেলে সম্প্রদায়ের মধ্যে সিলেট নাগরী বর্ণমালায় মুদ্রিত পুস্তকাদির প্রচুর প্রসার খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতকের শেষ হইতে বিংশ শতকের প্রথম দশকে ঘটে। মাত্র পাঁচটি স্বরবর্ণ, ২৭টি ব্যঞ্জনবর্ণ, মোট ৩২টি বর্ণ লইয়া ‘সিলেট নাগরী’র বর্ণমালা। দেবনাগরী বর্ণমালায় অ, ঈ, উ, ঋ, ঌ, ও স্বরবর্ণগুলি সিলেট নাগরী সম্পূর্ণ বর্জন করিয়াছে। আধুনিক বর্ণগুলিকে কাটছাঁট করা হইয়াছে—ন, ম আছে; ঙ, ঞ, ণ বর্জিত। বাঙ্গালা লিপির বহুসংখ্যক সংযুক্ত বর্ণ এই লিপি সংক্ষিপ্ত করিয়া মাত্র ১৫টিতে দাঁড় করা হইয়াছে—পরস্পরের মাধ্যম চড়িয়া, তলায় যুক্ত হইয়া, কাকালে উঠিয়া, গায়ে পড়িয়া সৃষ্ট যুক্তবর্ণ আয়ত্ত করার পরিশ্রম এই লিপিতে স্বীকার করিতে হয় না; মাত্র ১৬টি সংযুক্ত বর্ণ^২ এই লিপিতে আয়ত্ত করিতে পারিলেই গ্রন্থ পাঠ করা যায়। সিলেট নাগরী বর্ণমালা মুদ্রাক্ষনে যে আকারে ব্যবহৃত হইত তাহার কয়েকখানি আলোকচিত্র খ্রীষ্ট বানিয়াচঙ্গ নিবাসী পদ্মনাথ দেবশর্মা মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১৫, ৪র্থ সংখ্যায় “সিলেট নাগরী” প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১ আব্দুল করিম সাহিত্যবিদ্যার নহেন। সাহিত্যবিদ্যার চট্টগ্রাম বিভাগের ইন্সপেক্টর অফ স্কুলসের অফিস কর্মচারী ছিলেন। ‘সিলেট নাগরী’র আব্দুল করিম জাহাঙ্গীর হইতে নীচে পড়িয়া অকালে প্রাণ হারান।

২ প্রথম সংযুক্ত বর্ণ আল্ (আলেক্-লাম্) + বাঙ্গালা হইতে ১৫টি।

ব্রাহ্মী হইতে উদ্ভূত বিভিন্ন ভারতীয় লিপি এবং উর্দুতে ব্যবহৃত আরবী লিপি ছাড়া বর্তমানে আর একটি লিপি—রোমান লিপি—ভারতে প্রচলিত।

খ্রীষ্টপূর্ব ৮ম শতাব্দীতে ফিনিসীয় লিপি হইতে গ্রীক লিপির এবং পরে তাহা হইতে রোমান লিপির উৎপত্তি। ফিনিসীয় ব্যঞ্জনবর্ণগুলির সহিত নবসৃষ্ট ৭টি স্বরবর্ণ গ্রীক বর্ণমালায় যুক্ত হইল। খ্রীষ্টপূর্ব ৭ম শতাব্দীতে দক্ষিণ-ইতালিতে উপনিবিষ্ট গ্রীকদের নিকট হইতে রোমানরা লিপিবিজ্ঞা শিখিয়া রোমান লিপি সৃষ্টি করে। গ্রীকলিপির ইত্রাস্কান^১ (Etruscan) বর্ণমালা হইতে সৃষ্ট রোমান বর্ণমালা, লাতিনের মাধ্যমে, ইংরেজী ও অন্যান্য ভাষার বর্ণমালায় গৃহীত হয় ও ক্রমে পাশ্চাত্য জগতে ছড়াইয়া পড়ে। রোমান লিপিতে প্রথমে কেবল Capital letters (majuscules) বা বড় হাতের অক্ষরগুলি প্রচলিত ছিল; ২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এই বড় হাতের অক্ষরগুলির রূপ যাহা ছিল এখনও প্রায় তাহাই আছে। খ্রীষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে রোমান লিপিতে ছোট হাতের অক্ষর বা Small letters (minuscules), তাড়াতাড়ি টানা-লেখার জন্য প্রবর্তিত হয়; এগুলির রূপও প্রায় একই আছে। মূল রোমান লিপির সরল গঠন, প্রতিটি ধ্বনি পৃথক পৃথক বর্ণচিহ্নে প্রকাশ, দেশ-কাল ভেদে ইহার প্রায় অবিকৃত রূপ এবং ইউরোপীয়গণ কতৃক ইহার বিশ্বময় প্রসার, এই লিপিকে বহুদেশের ও বহু জাতির মধ্যে সুপ্রচলিত করিয়াছে।

পোতুগীস বর্ণিক ও রোমান-ক্যাথলিক ধর্মযাজকগণ ভারতে রোমান লিপি আনিয়াছিলেন। ষোড়শ শতকে গোমস্তক বা গোয়ার^২ পোতুগীস যাজকগণ রোমান লিপিতে কোঙ্কনী মারাঠী ভাষায় খ্রীষ্টীয় ধর্মগ্রন্থ রচনা করেন, মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া রোমান হরফে ভারতীয় ভাষায় লিখিত খ্রীষ্টধর্ম-বিষয়ক পুস্তক মুদ্রণ শুরু করেন। কোঙ্কনী ভাষায় সুশিক্ষিত ইংরেজ পাদরি টমাস্ স্টীভেন্স (১৫৪৯-১৬১৯) ষোড়শ শতকের শেষে পোতুগীস ভাষায় কোঙ্কনী ব্যাকরণ রচনা ও প্রকাশ করেন এবং সপ্তদশ শতকের প্রথমে বাইবেলের কাহিনী অবলম্বনে মারাঠী ভাষায় পণ্ডে “ক্রীস্তু-পুরাণ” গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ (১৬১৩) করেন। গোয়ার ভারতীয় খ্রীষ্টানেরা অনেকে এখনও রোমান লিপিতেই নিজ নিজ মাতৃভাষা লেখেন। এক সময়ে গোয়ার গোঁড়া খ্রীষ্টান শাসকেরা দেশীয় বর্ণমালা ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন।

১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে পোতুগীসেরা প্রথম বাঙ্গালাদেশে আসেন, হোসেন শাহ তখন

১ টাইবার নদীর উত্তরে ইটালির প্রাচীন রাজ্য Etruria (বর্তমান Tuscany ও Umbria) করিয়াছে) অধিবাসী বা তাহাদের লিপি।

২ ভারতে পোতুগীসদের আগমন ১৪৯৭ খ্রী, ভাস্কো-দা-গামার নেতৃত্বে কেরলের কালিকট বন্দরে। ১৫১০ খ্রী পোতুগীসদের গোয়া অধিকার ও গোয়ার পোতুগীস শক্তির ও বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র স্থাপন। বিদেশ হইতে আনীত রোমান টাইপে ১৫৭৭ খ্রী ভারতে প্রথম বই ছাপা হয়, গোয়ার পোতুগীসভাষার খ্রীষ্টধর্মগ্রন্থে। ১৫৭৭ খ্রী কোচিনে পাদ্রি যোয়ানেস্ গোনসাল্ভেস্ Joannes Gonsalves ভামিল অক্ষর তৈয়ারী করিয়া ভারতীয় বর্ণমালায় প্রথম বই ছাপান।

বাক্সালার নবাব। ষোড়শ শতাব্দীর শেষে ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দেই পোতুগীস্ মিশনারিরা বাক্সালা গঞ্জে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বাক্সালা ভাষায় রোমান লিপি ব্যবহৃত হয় খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মিশনারিদের চেষ্টায়। বাক্সালাদেশে বাক্সালী খ্রীষ্টান, পূর্ববঙ্গের ভূষণার ('বুসনা'-র) রাজকুমার, দোম্ আস্তোনিও দো রোজারিও ১৭শ শতকে 'ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' রচনা করেন, বাক্সালা ভাষায় লিখিত এই বইখানির রোমান লিপিতে লেখা বাক্সালা রূপ (মানোএল দা আসুসুস্প্ সাম্-কৃত পোতুগীস ভাবানুবাদসহ) মুদ্রণের জন্য বঙ্গদেশ হইতে পোতুগালে প্রেরিত হয় ১৮শ শতকে, ঐ পাণ্ডুলিপি পোতুগালের এভোরা নগরে সাধারণ গ্রন্থাগারে রক্ষিত ছিল, বর্তমানে লিসবনের জাতীয় গ্রন্থাগারে আছে।

পোতুগীস্ পাদরী মানোএল্ দা আসুসুস্প্ সাম্, পোতুগীসে লিখিত বাক্সালা ভাষার ব্যাকরণের সহিত বাক্সালা-পোতুগীস ও পোতুগীস-বাক্সালা শব্দকোষে^১ বাক্সালা শব্দগুলি রোমান হরফে লেখেন ও মুদ্রণ করেন (রচনা পূর্ববঙ্গে ১৭৩৪, মুদ্রণ লিসবনে ১৭৪৩)। তাঁহার রচিত 'কুপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' (Crepas Xaxtrre Orth, bhed) গ্রন্থখানিও রোমান লিপিতে বাক্সালা গঞ্জে রচিত, রোমান হরফে ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে লিসবনে মুদ্রিত।

ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ রোমান লিপিতে পালি, সংস্কৃত প্রভৃতি ভারতীয় আর্য ভাষাগুলি লিখিতে ও প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' বাক্সালা ভাষায় রোমান লিপিতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল।

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে খ্রীষ্টান ধর্মযাজকেরা বিভিন্ন আদিবাসী-সমাজে কথিত অনার্য ভাষাগুলি লেখার জন্য রোমান লিপি প্রয়োগ করেন, রোমান হরফে অনার্যগোষ্ঠীর বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থাদি মুদ্রণ ও প্রকাশ করেন।

ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন নিরক্ষর অনার্য-ভাষায় প্রচলিত রূপকথা, লোক-কাহিনী, গান প্রভৃতি ইউরোপীয় খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকদের প্রযত্নে ও কল্যাণে রোমান লিপিতে লিপিবদ্ধ ও মুদ্রিত হইয়াছে। ভারতের আর্থোডক্স এই ভাষাগুলির সাহিত্যিক ও ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার জন্য রোমান লিপিতে লিপিবদ্ধ ও মুদ্রিত এই সব রচনা অমূল্য উপকরণ। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে খ্রীষ্টান্ মিশনারীরা রোমান লিপিতে এই সব

১ Vocabulario em Idioma Bengalla, e Portuguez. Dividido em duas partes Dedicado Ao Excellent. E Rever. Senhor. D. Fr. Miguel De Tavora Arcebispo de Evora do Concelho de Sua Magestade. Foy diligencia do Padre Fr. Manoel Da Assumpc,am Religioso Eremita de Santo Agostinho da Congregacao da India Oriental. + Lisboa : Na Offic. de Francisco Da Sylva. Livreiro da Academia Real, e do Senado. Anno M. DCC XLIII. Com todas as licencas necessarias. (আখ্যাপত্র)। গ্রন্থখানির প্রথম ৪০ পৃষ্ঠা সংক্ষিপ্ত বাক্সালা ব্যাকরণ; শব্দকোষের ১ম ভাগ (৪১-৩০৩ পৃষ্ঠা) বাক্সালা-পোতুগীস অভিধান; ২য় ভাগ (৩০৭-৫৭০ পৃষ্ঠা) পোতুগীস-বাক্সালা অভিধান, ৫৭১-৫৯২ পৃষ্ঠায় তিথির নাম, সংখ্যাবাচক শব্দ, সপ্তগ্রহের নাম, হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থের নাম, গায়ত্রী মন্ত্র, সমোচ্চার্য বাক্সালা শব্দাবলী।

নিরক্ষর ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করিয়া, খ্রীষ্টীয় ধর্মকাহিনী বর্ণনা করিয়া, রোমান্ হরফে গ্রন্থ প্রকাশ করেন এবং রোমান্ লিপিতে ঐ সকল ভাষায় পঠন-পাঠনের অগ্রগতি সাধন করেন। বিহারের দুমকায় স্থান্দিনেভীয় ধর্মযাজকদের প্রচেষ্টা এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উনবিংশ শতকে প্রোটেষ্ট্যান্ট ও রোমান কাথলিক মিশনারীরা অষ্ট্রিক্ গোষ্ঠীর নিরক্ষর ভাষা সাঁওতালী, মুণ্ডারী, খাসিয়া প্রভৃতিতে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করিয়া ঐ সব ভাষাভাষী আদি-বাসীগণকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করার জন্য উপযুক্ত লিপির প্রয়োজন অনুভব করেন। প্রথম দিকে তাঁহারা সাঁওতালী ও খাসিয়ার জন্য বাঙ্গালা লিপি এবং মুণ্ডারীর জন্য নাগরী লিপি ব্যবহার করেন। তারপর তাঁহারা রোমান লিপি ব্যবহার শুরু করেন—সাঁওতালী ও খাসিয়া ভাষার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র রোমান লিপি এবং মুণ্ডারী ভাষার ক্ষেত্রে রোমান ও নাগরী উভয় লিপি-ই তাঁহারা ব্যবহার করিতেছেন। এই সব অষ্ট্রিক্ ভাষার সাহিত্য খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্য্যন্ত মুখে মুখে প্রচলিত ছিল, তারপর এগুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছে ও হইতেছে। সাঁওতালী রূপকথা ও গীতিকবিতার সৌন্দর্য্য এবং মুণ্ডা গীতিকবিতা ও প্রেমগীতির সহজ সারল্য ও উন্নতা, কৌমজীবনের প্রাণময় অকৃত্রিম রূপ প্রতিফলিত করিয়াছে। নরওয়ের মিশনারী Rev. P. O. Bodding এই সব ভাষার সাহিত্য রোমান হরফে এক পাতায় মূল ও পাশের পাতায় ইংরেজী অনুবাদ-সহ নরওয়ের রাজধানী অস্লোর Oslo Institute of Comparative Culture এবং ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন্ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন। মুখ্যতঃ ইউরোপীয় মিশনারীদের প্রযত্নে ও কলাগেই এই ভাষাগুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং রোমান ও ভারতীয় বর্ণমালায় স্থায়ী রূপ লাভ করিয়াছে।^১

সম্প্রতি সাঁওতালী ভাষার নিজস্ব লিপি উদ্ভাবন ও প্রচলনের জন্য শিক্ষিত সাঁওতালীদের মধ্যে কেহ কেহ সচেষ্ট হইয়াছেন। রোমান, বাঙ্গালা, দেবনাগরী লিপি বর্জন করিয়া সাঁওতালীর নিজস্ব লিপি প্রবর্তনের জন্য সাঁওতাল-সম্মেলনে প্রস্তাবও উঠিয়াছে। এই লিপির ‘ওল্’ (Ol) নামকরণ হইয়াছে; এখনও ইহা পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরে আছে; ইহার বর্ণমালা সুচিস্তিত ও সুপরিকল্পিত নহে।

ভারতের ভোট-চীন গোষ্ঠীর ভাষা বা কিরাত ভাষাগুলি বহুশঃ নব্য-ভারতীয় লিপি ও বর্ণমালা গ্রহণ করিয়াছে। এগুলির মধ্যে লেপ্‌চা বা রোঙ্গ্ (Rong) ভাষার নিজস্ব

১ Father Hoffmann, *Mundari Encyclopaedia*, 13 pts. (Govt. of Bihar); Rev. P. O. Bodding-এর এবং Rev. L. O. Skrefsrud-এর সংগৃহীত ও প্রকাশিত সাঁওতালী রূপকথা ও লোকসাহিত্য; রামনাথ টুডর সম্পাদিত সাঁওতাল লোকসাহিত্য; W. G. Archer-এর তত্ত্বাবধানে বিহার-সরকার-প্রকাশিত কোলগোষ্ঠীর বিভিন্ন ভাষার লোকগীতি; এবং St. Francis de Sales-এর অনুগামী ইতালীয় রোমান কাথলিক Salesian মিশনারিদের দ্বারা সংগৃহীত ও প্রকাশিত খাসিয়া ভাষার গ্রন্থগুলি কোড়ুলী পাঠক দেখিতে পাবেন।

বর্ণমালা আছে, ঐ বর্ণমালা তিব্বতী হইতে গৃহীত। সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের প্রসারকালে 'কাশ্মীর ও উত্তর-ভারতের ভারতীয় লিপির রূপান্তরে তিব্বতী লিপি সৃষ্ট হইয়াছিল, লেপ্‌চা বা রোঙ্গ বর্ণমালা তাহার রূপান্তর। কিন্তু লেপ্‌চাভাষীর সংখ্যা মাত্র ২৫ হাজার, তাহার ক্রমশঃ ভারতীয় আৰ্য্যভাষা (নেপালী বা গোৰ্খালী বা খস্কুরা) ও দেবনাগরী লিপি গ্রহণ করিতেছেন। নেপালের প্রাচীন নেবারী জাতি (Newari) বঙ্গ-বিহার-মিথিলার সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগে প্রায় সহস্র বর্ষ পূর্বেই উচ্চতর সভ্যতার অধিকারী, বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃত ভাষা তাঁহাদের সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা জোগাইয়াছে, খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতক হইতেই তাঁহাদের রচিত সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। প্রকৃতপক্ষে ভারতে প্রচলিত ভোট-চীন গোষ্ঠীর প্রাচীনতম সাহিত্যের রূপ নেবারী ভাষায় পাওয়া যাইতেছে। পূর্ব-ভারতীয় 'কুটিল' লিপি নেপালের লিপিকরণ কর্তৃক পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হইয়া নেবারী লিপির সৃষ্টি হয়; অর্থাৎ বাঙ্গালা-আসামী, মৈথিল, উড়িয়া লিপিরই সগোত্র নেবারী লিপি। কিন্তু নেবারী লিপির বর্ণমালায় আজ পর্য্যন্ত একখানি বইও মুদ্রিত হয় নাই। ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে শাস্ত্র নেবারী জাতি যুদ্ধপ্রবণ গোঁর্খাদের দ্বারা বিজিত হয় এবং নেপালী (গোঁর্খালী বা পর্বতীয়া বা খস্কুরা) ভাষা নেপালের রাজকীয় ভাষা হওয়ায় নেপালী ভাষার লিপি দেবনাগরীতেই নেবারী ভাষার রচনাদি মুদ্রিত হইতেছে। ভোট-চীন গোষ্ঠীর মেইতেই বা মণিপুরী, বোডো (কাছাড়ী, গারো, মেচ, রাভা, টিপ্‌রা, দীয়া-সা) এবং গারো ভাষা বাঙ্গালা-আসামী বর্ণমালা গ্রহণ করিয়াছে। মেইতেই বা মণিপুরীর নিজস্ব প্রাচীন লিপি ছিল, ভারতীয় লিপি হইতেই তাহার উদ্ভব। কিন্তু ১৮শ শতক হইতে মেইতেই ভাষা বাঙ্গালা লিপি গ্রহণ করিয়াছে। ভোট-চীন গোষ্ঠীর অপর ভাষা অহম্ ১৩শ শতকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রতিষ্ঠিত হয়, অহম্ ভাষায় রচিত পুরাতন ঐতিহাসিক সাহিত্য 'বুরঞ্জী' উল্লেখযোগ্য, অহমের নিজস্ব লিপিতে অহম্ ভাষায় রচিত দুই একখানি গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীর অহম মুদ্রায় অহম লিপির বর্ণ রহিয়াছে। আসামী-ভাষী হিন্দুদের মধ্যে অহম্ জাতি মিশিয়া গিয়াছে ও আসামী বর্ণমালা গ্রহণ করিয়াছে।

গারো, শুশেই এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর নাগাভাষা খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের প্রযত্নে অগ্রসর হইতেছে এবং রোমান লিপিতে এই সব ভাষার রচনাও লিপিবদ্ধ ও মুদ্রিত হইতেছে। হিমালয়ের সামুদ্রেশে আসামের পার্বত্য অঞ্চলে প্রচলিত আকা, আবর-মিরি, দফ্‌লা, মিশ্‌রী প্রভৃতি ভোট-চীন গোষ্ঠীর ভাষাগুলি মোট ২০ হইতে ২২ হাজার লোক বলে, এগুলির কোনও লিপি ও বর্ণমালা নাই।

ভোট-চীন গোষ্ঠীর মন-মা (বাম্মা) বা বর্মীভাষা সাহিত্যে সমৃদ্ধ। খ্রীষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে পগানের রাজা অনিরুদ্ধ ও তাঁহার দুই পুত্র রাজা চোলু ও রাজা চন্-জিং-থা'র সময়ে ইহা লিপিবদ্ধ হয়। সেই সময়কার অষ্ট্রিক জাতির মোন্দের মধ্যে প্রচলিত ভারতীয়

লিপি কিছু রূপান্তর করিয়া বর্মী লিপি সৃষ্ট হয়। আরাকানের আরাকানী ভাষা ও পার্বত্য চট্টগ্রামের ঝু উপভাষা বর্মী-ভাষার অন্তর্গত, এগুলি বর্মী লিপিতে লিখিত হয়।

উত্তর-পশ্চিম আসামে ও উত্তর-বর্মায় বিক্ষিপ্ত খাম্ভী ভাষা এবং উত্তর-বর্মার শান ভাষা (শ্যামী Siami ভাষার রূপভেদ) ভোট-চীন গোষ্ঠীর দৈ বা থাই (Thai) ভাষার অন্তর্গত। বর্মীদের সহিত নিকট সংস্পর্শের ফলে খাম্ভী ও শান ভাষা বর্মী লিপি ও বর্ণমালা গ্রহণ করিয়াছে।

কোনও ভাষায় ব্যবহৃত বর্ণ অর্থাৎ ধ্বনির প্রতীকচিহ্নগুলির সমষ্টি ‘বর্ণমালা’ (alphabet)। গ্রীক বর্ণমালার প্রথম বর্ণ Alpha ও দ্বিতীয় বর্ণ Beta-র সমবানে গ্রীক alphabetos, লাতিন alphabetum, ইংরেজী alphabet। কোনও ভাষার বর্ণমালাই নির্খুত ও পূর্ণাঙ্গ না হওয়ায় উহা ঐ ভাষায় ব্যবহৃত বা উচ্চারিত সমস্ত ধ্বনিকে প্রকাশ করিতে পারে না। একই বর্ণচিহ্নের দ্বারা একাধিক ধ্বনি অনেক সময় নির্দেশিত হয়, যথা, বাংলায় অ-বর্ণের দ্বারা ‘অ’, ‘ও’ দুইটি ধ্বনি : অনন্ত, অতুল (ওতুল) ; ইংরাজীতে ‘a’ ৬টি স্বরধ্বনির প্রতীকচিহ্ন : তু° father, man, have, spade, water, was ; ইংরেজী put, but, lute-এ ‘u’-বর্ণ তিনটি পৃথক স্বরধ্বনির প্রতীকচিহ্ন। আবার একই ধ্বনির জন্য একাধিক বর্ণ বর্ণমালায় ব্যবহৃত হয়—যথা বাঙ্গালা জ য ; শ ষ স। কালক্রমে উচ্চারণ-বিবর্তনের জন্য ভাষায় বহু ধ্বনি লুপ্ত হইলেও বর্ণমালায় লুপ্ত ধ্বনির বর্ণগুলি কখনও কখনও সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া সুচিরাগত প্রধায় রক্ষিত হয়—যথা, বাঙ্গালা বর্ণমালার ঞ ঞ য ব ণ।

বিভিন্ন ভাষায় বর্ণমালার সংখ্যাও বিভিন্ন। মিশরীয় বর্ণমালায় ২৪ (মতান্তরে ২৫)টি বর্ণ, হিব্রুতে ২২টি, গ্রীকে ২৪টি, রোমকে ২৬টি বর্ণ। ইংরেজী ভাষায় ২৬, ফরাসীতে ২৩, লাতিনে ২২, ডাচে (ওলন্দাজে) ২৬, স্পানিশে ২৭, ইতালিয়ানে ২০, রাশিয়ানে ৪৮, সংস্কৃতে ৫০টি বর্ণ। আরবীতে ২৮, ফারসীতে ৩২, তুর্কীতে ৩৩, উর্দুতে ৩৫টি, বর্মীতে ১২টি বর্ণ। বিখ্যাত K'anghsi Dictionary-তে (১৭১৬ খ্রী) চীনা বর্ণমালা ৪০,৫৪৫ ; পরবর্তীকালে সংক্ষিপ্ত হইয়া চীনা বর্ণমালা ১০,০০০। এক পিকিংয়ের উপভাষাতেই ব্যবহৃত ৪২০০ শব্দের জন্য ৪২০টি প্রতীক, অর্থাৎ গড়ে একটি প্রতীক-চিহ্নে ১০টি শব্দ। জাপানী ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনিগুলি মাত্র ৪৭টি বর্ণে প্রকাশ করা যায় দেখিয়া পরবর্তীকালে জাপান চীনা বর্ণমালা রূপান্তরিত ও পরিবর্তিত করিয়া মাত্র ৪৭টি বর্ণে জাপানী ভাষার বর্ণমালা সংহত করিয়াছে।

সংস্কৃত ভাষার বর্ণমালা সর্বাপেক্ষা বৈজ্ঞানিক, পূরাপূরি ধ্বনিবিজ্ঞানসম্মত। সংস্কৃতে মূল ধ্বনির সংখ্যা ৫০, বর্ণমালায় বর্ণসংখ্যাও ৫০, প্রতিটি ধ্বনির চিহ্ন সুনির্দিষ্ট। গ্রীক-রোমক বর্ণমালার মত সংস্কৃতে স্বর-ব্যাঞ্জন এলোমেলো ভাবে সজ্জিত নয়। উচ্চারণস্থান ও হ্রস্ব-দীর্ঘ ধ্বনি অনুসারে সংস্কৃতে ১৪টি স্বরবর্ণ বিদ্যন্ত; সর্বাপেক্ষা লঘু স্বর ‘অ’ প্রথমে, সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ যৌগিক স্বর ‘ঔ’ সর্বশেষে। ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি বাগ্‌যন্ত্রের উচ্চারণ-স্থান অনুযায়ী ক্রমবিভক্ত ও বর্ণীকৃত। মুখবিবরের অভ্যন্তর হইতে বাহিরের স্পর্শ ও মোক্ষ পর্য্যন্ত—কণ্ঠ হইতে তালু, মূর্ধা, দন্ত, ওষ্ঠ পর্য্যন্ত পর পর উচ্চারণস্থানের ক্রম ধরিয়া—কণ্ঠা, তালব্য, মূর্ধন্য, দন্ত্য, ওষ্ঠ্য পাঁচটি স্পর্শবর্ণের বর্ণ: প্রতি বর্ণে ধ্বনিবিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রথমে দুইটি অঘোষধ্বনি (একটি অঘোষ অল্পপ্রাণ, অপরটি অঘোষ মহাপ্রাণ), তারপর দুইটি ঘোষবৎ ধ্বনি (একটি ঘোষবৎ অল্পপ্রাণ, অপরটি ঘোষবৎ মহাপ্রাণ), তারপর সেই বর্ণের নাসিক্য ধ্বনির সমাবেশ করিয়া প্রতি বর্ণে পাঁচটি করিয়া মোট ২৫টি স্পর্শধ্বনি, এবং প্রত্যেকটি ধ্বনির নির্দিষ্ট প্রতীকরূপে ২৫টি স্পর্শবর্ণ। স্পর্শবর্ণের পর চারটি অর্ধব্যঞ্জন অন্তঃস্ববর্ণ (Semi-Vowels and liquids) ‘য, র, ল, ব’—বর্ণীয় ব্যঞ্জনধ্বনির সহিত ইহাদের উচ্চারণে মৌলিক পার্থক্য। তাহার পর ৩টি অঘোষ উষ্মবর্ণ ‘শ, ষ, স’ এবং একটি ঘোষবৎ উষ্মবর্ণ ‘হ’। সর্বশেষে অনুস্বার ও বিসর্গ এবং অনুনাসিক বিন্দু। বাগ্‌যন্ত্র ও মুখবিবরের অভ্যন্তর হইতে ধ্বনিগুলি যে ভাবে ও যে ক্রমে নিঃসারিত হইতেছে তাহার প্রতি সূক্ষ্ম ধ্বনিবিজ্ঞানসম্মত লক্ষ্য রাখিয়া আর কোনও ভাষার বর্ণমালা এই ভাবে বিদ্যাস করা হয় নাই। এইরূপ বৈজ্ঞানিক বর্ণমালা পৃথিবীর অন্য কোনও ভাষায় নাই। প্রাচীন ভারতীয় আর্ধ্যগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত এই ধ্বনিবিজ্ঞানসম্মত বর্ণমালা আমাদের মহৎ উত্তরাধিকার ॥

গ্রন্থপঞ্জী

Issac Taylor, The Alphabet 2 vols., 1883, 2nd edn. 1890; W. S. Mason, A History of the Art of Writing, 1920; Edward Clodd, The Story of the Alphabet, 1900, 3rd edn. 1938; Oscar Ogg, 26 Letters, 1948; I. J. Galeb, A Study of Writing, 1952; J. Friedrich, Extinct Languages, 1957; Nina M. Davies, Picture-Writing in Ancient Egypt, 1958; W. Flinders-Petrie, The Formation of the Alphabet, 1912; G. Buhler, Indian Palaeography, Eng. Trans. ed by J. H. Fleet, 1904; Rakhal Das Banerji, The Origin of the Bengali Script, 1919. গৌরীশঙ্কর হীরাচন্দ্র ওয়া, ভারতীয় প্রাচীন লিপিমাল। ॥

পরিষৎ-সংবাদ

১৩৮১ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ৮২ বৎসরে পদার্পণ করিল। ‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’ ৮১তম বর্ষে উপনীত হইল।

১৩০০ বঙ্গাব্দের ৮ই শ্রাবণ ‘দি বেঙ্গল একাডেমি অফ লিটারেচার’ প্রতিষ্ঠা হয়, শ্রাবণ মাসের শেষে একাডেমির পত্রিকা ‘The Bengal Academy of Literature. Vol. I. No. 1’ প্রকাশিত হয়। ৭ই ফাল্গুন ১৩০০ একাডেমির বাঙ্গালা নামকরণ হওয়ার পর “বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। The Bengal Accademy of Literature. Vol. I. No 8” হইতে ১৩০১ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত এই নামে পরিষদের পত্রিকা প্রকাশিত হয়; ১৩০১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে “সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা” প্রকাশিত হয়। প্রথম পর্য্যায়ের পত্রিকা ইংরেজী-বাঙ্গালা দ্বিভাষিক ছিল। ১৩০১ শ্রাবণ হইতে “সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা”র কেবলমাত্র বাঙ্গালা ভাষায় প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইতেছে, এবং ১৩০১ বঙ্গাব্দ হইতে ‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’র বর্ষ গণনা করা হইতেছে ॥

পরিষদের ৮২তম বর্ষ কয়েকটি কারণে উল্লেখযোগ্য ও স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

পরিষদ মন্দির হইতে ১৯৬৫ সালের ১৪ই জানুয়ারি (বৃহস্পতিবার ৩শে পৌষ ১৩৭১) তারিখে অপহৃত ১১শ শতাব্দীর বিষ্ণুমূর্তি বর্তমান বর্ষে আমেরিকার বোস্টন মিউজিয়ামের সৌজন্যে পুনরুদ্ধার হইয়াছে। এই সংক্রান্ত ‘শুভ-সংবাদ’ ৮ই শ্রাবণ ১৩৮১ পরিষদের ৮২তম প্রতিষ্ঠাদিবসে পরিষৎ-সম্পাদক কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য পরিষৎ-সম্পাদক যথাসময়ে প্রকাশ করিবেন।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত আর্টনি লাজলট ডিলাস্ বর্তমান বর্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পৃষ্ঠপোষক পদ অলংকৃত করিয়াছেন। পরিষদের ৮২তম প্রতিষ্ঠাদিবসে পরিষদ মন্দিরে তাঁহার শুভাগমন প্রার্থনা করিয়া পরিষৎ-সম্পাদক মাননীয় রাজ্যপালকে আহ্বান জানাইলে তিনি পরিষদের প্রতিষ্ঠা-দিবস-উৎসবে যোগদান করিতে এবং পরিষদের পৃষ্ঠপোষক পদ অলংকৃত করিতে সানন্দে সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বর্তমান বর্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতি শুভেচ্ছা ও আনুকূল্য প্রকাশ করিয়াছেন। পরিষদ মন্দির হইতে অপহৃত একটি বিষ্ণুমূর্তি পুনরুদ্ধার বিষয়ে বোস্টন মিউজিয়ামের কর্তৃপক্ষের সহিত পরিষৎ-সম্পাদকের পত্রালাপের ও গত ৬৫ বৎসরের পুরাতন নথিপত্রের সহায়তায় অপহৃত মূর্তির বহুসাময়িক পরিষৎ-সম্পাদক কর্তৃক প্রমাণের পর বোস্টন মিউজিয়ামের পরিচালক ও পরিষৎ-সম্পাদকের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিপত্রের নকল ও চিঠিপত্রের নকল পরিষৎ-সভাপতি আচার্য্য

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর নিকট প্রেরণ করিয়া তাঁহার সহায়তা প্রার্থনা মাত্র তিনি অত্যন্ত তৎপরতার সহিত সাহায্য করিয়াছেন। পরিষদের ৮২তম প্রতিষ্ঠা-দিবসে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া বাণী প্রেরণ করিয়াছেন।

পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য, বঙ্গভারতীর প্রবীণ সেবক, পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হওয়ায় মাননীয় রাজ্যপাল সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের চিকিৎসার জন্য পাঁচশত টাকা সাহায্য প্রেরণ করেন। মাননীয় রাজ্যপালের এই মহানুভবতায় পরিষদের কার্যনির্বাহক-সমিতির পক্ষ হইতে তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা ও সাধুবাদ জ্ঞাপন করা হয়। মাননীয় রাজ্যপালের নির্দেশে বীরভূম জেলার কুড়মিঠা গ্রামে সাহিত্য-রত্ন মহাশয়ের গৃহে সুযোগ্য সরকারী চিকিৎসক গিয়া তাঁহার চিকিৎসা সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিয়াছেন। বঙ্গভারতীর সেবকের প্রতি রাজ্যপালের এই শ্রদ্ধা সাহিত্য-পরিষদের সেবকবৃন্দকে আনন্দদান করিয়াছে ॥

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যনির্বাহক-সমিতির প্রাক্তন সদস্য স্বর্গত কেশবচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের পুত্র শ্রীজয়দেব গুপ্ত ও পুত্রবধূ শ্রীমতী চিত্রিতা দেবী (প্রখ্যাত দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের কন্যা) প্রতি বৎসর বঙ্গের কোনও প্রবীণ সাহিত্য-সেবীকে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণের জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের হাতে কিছু অর্থদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। 'রবিবাসর'-এর সর্বাধ্যক্ষ ও সাহিত্য-পরিষদের সহ-সভাপতি ডাঃ কালীকৃষ্ণ সেনগুপ্ত মহাশয়ের মারফৎ তাঁহারা পরিষৎ-সম্পাদকের নিকট এই প্রস্তাব করেন। বর্তমান বর্ষের জন্য পরিষৎ-সম্পাদকের নিকটে ৩০০ টাকার চেক শ্রদ্ধার্ঘ্য-স্বরূপ তাঁহারা প্রেরণ করেন। বর্তমান বর্ষে তাঁহাদের প্রদত্ত অর্থ পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয়কে শ্রদ্ধার্ঘ্য-স্বরূপ দেওয়া হইয়াছে। পরিষদের কার্যনির্বাহক-সমিতি শ্রীজয়দেব গুপ্ত ও শ্রীমতী চিত্রিতা দেবীকে তাঁহাদের সাহিত্য-প্রীতি ও বঙ্গ-সাহিত্যের সেবকগণের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার জন্য সাধুবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

পরিষদের আজীবন সদস্য ও সুহৃদ্ শ্রীবলাইচাঁদ সাহা দীর্ঘকাল ধরিয়া বিনা পারিশ্রমিকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের হিসাব পরীক্ষার কার্য করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। বর্তমান বর্ষে তিনি পরিষৎ-সম্পাদকের হাতে ছয় হাজার টাকা 'সুশাস্তবাল্য স্মৃতি তহবিল' প্রতিষ্ঠার জন্য দান করিয়াছেন। শ্রীসাহার ইচ্ছানুসারে ঐ টাকা ব্যাঙ্কে সর্বোচ্চ সুদে স্থায়ী আমানত রাখা হইয়াছে। ঐ গচ্ছিত তহবিলের সুদ হইতে প্রতিবর্ষে পরিষদের গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য উপকরণ ক্রয় করা হইবে। প্রাচীন গ্রন্থাদি রক্ষার জন্য ঐ তহবিল হইতে নিয়মিত ব্যবস্থা হইবে।

রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশনের কর্তৃপক্ষ বর্তমান বর্ষে পরিষদের পুরাতন দ্রুপ্ত পুস্তক বাঁধাইবার জন্য ২৭৫০ টাকা দান করিয়াছেন। ঐ টাকা হইতে বহু দ্রুপ্ত

প্রাচীন গ্রন্থ বাঁধান হইয়াছে। পরিষদের প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া সম্প্রতি পরিষৎ-সম্পাদককে তাঁহার আরও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। ফাউণ্ডেশনের কতৃপক্ষকে এজন্য আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি ॥

১৩৮১ বঙ্গাব্দের প্রারম্ভে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দিরে তিনজন কবির চিত্রপ্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

১৩৮১ বঙ্গাব্দের ১লা জ্যৈষ্ঠ অপরাহ্ন পাঁচ ঘটিকায় কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস, কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ও কবি মোহিতলাল মজুমদারের চিত্রপ্রতিষ্ঠা-উৎসব যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত সমারোহ-সহকারে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আচার্য্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই উৎসবে পৌরোহিত্য করেন। রবীন্দ্রনাথের ‘মহাবিশ্বে মহাকাশে’ সঙ্গীতটি এই পুণ্য অনুষ্ঠানে উদ্বোধন-সঙ্গীতরূপে গীত হয়। প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রী কুমারী সুরা কুমারের উদ্বোধন-সঙ্গীতের পর আচার্য্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ধূপদীপ-শোভিত তিনখানি চিত্রপট মাল্যচন্দনে ভূষিত করিয়া পরিষৎ-মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। এই উপলক্ষে সভাপতি শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় পরিষৎ মন্দিরে একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীমদনমোহন কুমার-রচিত ‘করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় জীবন ও কাব্য’ গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন ও প্রথম গ্রন্থখানি তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ প্রবীণ পরিষৎ-সদস্য আচার্য্য শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে উপহার দেন।

কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের পরিবারে রক্ষিত একখানি পুরাতন ফটোগ্রাফ হইতে কবির দ্বিতীয়া পত্নী প্রেমদার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীহেমরঞ্জন দাস একখানি নূতন চিত্র প্রস্তুত করাইয়া পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠার জন্য উপহার দিয়াছেন।

কবি করুণানিধানের জীবনী রচনার উপকরণ সংগ্রহের সময় কবির যে-সকল ফোটোগ্রাফ ও চিত্র শ্রীমদনমোহন কুমার সংগ্রহ করিয়াছিলেন সেগুলির মধ্যে শিল্পী শ্রীভূনাথ মুখোপাধ্যায়, আর. এ. (লণ্ডন) অঙ্কিত করুণানিধানের একখানি চিত্র ছিল। করুণানিধানকে সম্মুখে বসাইয়া শিল্পী ঐ ছবিখানি আঁকিয়াছিলেন। করুণানিধানের কবি-ব্যক্তিত্ব চিত্রখানিতে পরিস্ফুট। কবি যয়ং ঐ চিত্রখানিতে স্বাক্ষর করিয়া শিল্পীকে প্রশংসা করিয়াছিলেন। করুণানিধানের স্পর্শধন্য এই অপ্রকাশিতপূর্ব ছবিখানি পরিষৎ-প্রকাশিত ‘করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবন ও কাব্য’ গ্রন্থে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে। মূল ছবিখানি হইতে করুণানিধানের একখানি তৈলচিত্র অঙ্কনের ভার শিল্পী ভূনাথ মুখোপাধ্যায়ের উপর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ অর্পণ করিয়াছিলেন, এই উৎসবে ঐ তৈলচিত্রখানি পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়।

কবি মোহিতলাল মজুমদারের স্বাক্ষরিত একখানি পুরাতন ফোটোগ্রাফ হইতে তাঁহার তৈলচিত্র প্রস্তুতের ভার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ শিল্পী শ্রীবিভূতি সেনগুপ্তকে দেন। কবির স্বাক্ষরিত ফটোগ্রাফ হইতে প্রস্তুত তৈলচিত্র এই উৎসবে পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়।

বঙ্গের এই তিন কবির চিত্র-প্রতিষ্ঠা-উৎসব উপলক্ষে পরিষৎ মন্দিরে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। গোবিন্দচন্দ্রের কাব্যগ্রন্থগুলির প্রথম সংস্করণ, তাঁহার কাব্য-সঙ্কলন এবং তাঁহার জীবন ও কাব্য সম্বন্ধে প্রকাশিত বিভিন্ন পুরাতন পত্রিকার সংখ্যাগুলি প্রদর্শনীতে রাখা হয়। পরিষৎ-সদস্য শ্রীঅনিলকুমার ভৌমিক ও পরিষদের সহকারী সম্পাদক শ্রীহারাদিন দত্ত গোবিন্দচন্দ্রের রচনা ও গোবিন্দচন্দ্র-সংক্রান্ত পুরাতন কাগজপত্র ও প্রবন্ধগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রদর্শনীর বিশেষ সহায়তা করেন।

কবি করুণানিধানের লিখিত বহু চিঠিপত্র, করুণানিধানের অগ্রজ সমকালীন ও পরবর্তী সাহিত্যিকবৃন্দের করুণানিধানকে লিখিত চিঠিপত্র, করুণানিধানকে লিখিত তাঁহার জ্বরী একখানি জ্বর পত্র ও ঠিকানা-লেখা খাম, করুণানিধানের এন্ট্রাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সার্টিফিকেট ও অন্যান্য দুস্ত্রাপ্য কাগজপত্র, তাঁহার শেষ জীবনে রচিত দুইখানি অপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের ও প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি, তাঁহার কাব্যগ্রন্থগুলির বিভিন্ন সংস্করণ, কবির কয়েকখানি আলোকচিত্র এবং বিভিন্ন পুরাতন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত করুণানিধানের প্রথম প্রকাশিত কবিতা ও প্রবন্ধ এবং কয়েকটি ফটোস্ট্যাট কপি এই প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়। এই দুর্লভ সামগ্রীগুলির অধিকাংশই শ্রীমদনমোহন কুমার করুণানিধানের জীবনী রচনার জন্য দীর্ঘকাল ধরিয়া সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ডাঃ কালীকঙ্কর সেনগুপ্ত ও শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহরায় তাঁহাদের নিকট রক্ষিত করুণানিধানের চিঠি ও কবিতার ফটোস্ট্যাট কপি এই প্রদর্শনীর জন্য দিয়া সহায়তা করেন।

কবি মোহিতলাল মজুমদারের অনেকগুলি চিঠিপত্র, তাঁহার বিভিন্ন রচনার পাণ্ডুলিপি, তাঁহার কাব্যগ্রন্থ ও সমালোচনা-গ্রন্থগুলির প্রথম সংস্করণ, বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত মোহিতলালের প্রথম প্রকাশিত কবিতা ও প্রবন্ধ, মোহিতলাল-সম্পাদিত সাময়িকপত্র এবং মোহিতলালের দুইখানি দুস্ত্রাপ্য পুরাতন ফটোগ্রাফ এই প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়। অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার সংগ্রহে রক্ষিত মোহিতলালের অনেকগুলি চিঠিপত্র দিয়া এই অনুষ্ঠানে বিশেষ সহায়তা করেন। মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত, নাট্যকার ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “বাজালী” নাটকের মোহিতলাল-কৃত ইংরেজী অনুবাদের পাণ্ডুলিপি ভূপেন্দ্রনাথের পুত্র সাহিত্যিক হীরেন বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপলক্ষে পরিষদে দান করেন।

প্রদর্শনীটি উপস্থিত দর্শকবৃন্দের চিন্তাকর্ষক হওয়ায় তাঁহাদের অমুরোধে পরিষৎ-সভাপতি এই প্রদর্শনীটি এক সপ্তাহের জন্য খোলা রাখার আদেশ দেন। সাহিত্যানুরাগী বহু দর্শক সপ্তাহব্যাপী এই প্রদর্শনী দেখিবার জন্য পরিষৎ মন্দিরে আসেন।

চিত্রপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে গোবিন্দচন্দ্র দাসের জীবন ও কাব্যসাধনা সম্পর্কে অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও ডাঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় দুইটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ পাঠ করেন। অশীতিবর্ষব্যয়িত প্রবীণ কবি শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য অসুস্থতা-নিবন্ধন সভায়

উপস্থিত হইতে না পারায় তাঁহার রচিত “গোবিন্দচন্দ্র দাস” কবিতাটি পাঠ করেন শ্রীমন্টকুমার মিত্র।

মামুষ করুণানিধান ও কবি করুণানিধান সম্বন্ধে শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) ও শ্রীকালীকঙ্কর সেনগুপ্ত সভায় ভাষণ দেন। করুণানিধান ও মোহিতলালের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ও দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যে বাণীপূজায় তন্ময়তার কথা শ্রীমদনমোহন কুমার বর্ণনা করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কবি-অধ্যাপক মোহিতলাল মজুমদারের মনোহর স্মৃতিচারণ করেন আচার্য্য শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া রমেশচন্দ্র যেদিন কলিকাতা চলিয়া আসেন সেইদিন মোহিতলাল নীলক্ষেত-প্রান্তরে সাক্ষাভ্রমণের নিত্যসঙ্গী রমেশচন্দ্রের উদ্দেশে একটি কবিতা রচনা করিয়া তাঁহার প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ উপহার দেন। আচার্য্য রমেশচন্দ্র মোহিতলালের সেই অপ্রকাশিত কবিতাটি সভায় পাঠ করেন। পাঠান্তে ঐ কবিতাটি পরিষৎ-সম্পাদক পরিষদের চিত্রশালায় রক্ষার জন্ত প্রার্থনা করিলে রমেশচন্দ্র কবিতাটি পরিষদে দান করেন। সাহিত্যিক শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) মোহিতলালের সহিত তাঁহার সাহিত্যজীবনের বিচিত্র সম্পর্কের স্মৃতিচারণ করেন ও মোহিতলালের স্মৃতির উদ্দেশে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। শ্রীজীবনকৃষ্ণ শেঠ কবি মোহিতলাল সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং স্বরচিত সনেটে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। কবি ও দার্শনিক মোহিতলাল সম্বন্ধে আলোচনা করেন ডাঃ কালীকঙ্কর সেনগুপ্ত। শ্রীসুধীর বসু একটি কবিতায় গোবিন্দচন্দ্র, করুণানিধান ও মোহিতলালের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। পরিশেষে সভাপতি আচার্য্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন যে পরিষৎ মন্দিরে বন্ধের এই তিন প্রখ্যাত কবির চিত্রপ্রতিষ্ঠা করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ একটি অবশ্য-কৃত্য পালন করিলেন ও পুণ্যকর্ম করিয়া ঋষি-ঋণ পরিশোধের প্রয়াস করিয়া ধন্য হইলেন। গোবিন্দচন্দ্র, করুণানিধান ও মোহিতলালের ব্যক্তিত্ব, কবিত্ব ও সাহিত্যসাধনা সম্বন্ধে আচার্য্য সুনীতিকুমার বহুতথ্যপূর্ণ চিন্তাকর্ষক আলোচনা করেন। কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস ও করুণানিধানের কাব্যগ্রন্থগুলি এখন আর পাওয়া যায় না, পরিষদ এই উৎসব উপলক্ষে যে সমস্ত দুষ্প্রাপ্য উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন সেগুলির সাহায্যে গোবিন্দচন্দ্র দাস ও করুণানিধান বন্দোপাধ্যায়ের সমগ্র রচনার সুসম্পাদিত পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশ করিলে কবি-পূজা সার্থক হইবে, সভাপতি মহাশয় বলেন ॥

কলিকাতার সুপ্রাচীন গ্রন্থাগার ‘সাবিত্রী লাইব্রেরী’ বন্ধ হওয়ার পর ঐ গ্রন্থাগারের স্বত্বাধিকারীগণ ২৫শে অগ্রহায়ণ ১৩৭৪ (১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর) বহু প্রাচীন পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে দান করেন। ‘সাবিত্রী লাইব্রেরী’ হইতে প্রাপ্ত এই প্রাচীন পুস্তক-পত্রিকাদি এ পর্য্যন্ত পঞ্জীয়ন (cataloguing) করা হয় নাই,

প্রদত্ত পুস্তকাদির কোনও তালিকাও আমরা পরিষদ কার্যালয়ে খুঁজিয়া পাই নাই। অর্থাভাবে পরিষদ প্রয়োজনীয় ব্যাক ও আলমারি তৈয়ারী করাইতে না পারায় এই প্রাচীন জীর্ণ গ্রন্থগুলি ৮ বৎসর ধরিয়৷ ভূমিশ্যায় ধূলিমলিন ও জীর্ণতর হইতেছিল। ১৩৮১ বঙ্গাব্দে আমরা এই দুর্লভ সংগ্রহ পঞ্জীয়ন করিয়াছি, মোট ২২৫০ খানি প্রাচীন পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা এই সংগ্রহে আছে। স্ট্যাকরুমে নূতন রাক প্রস্তুত করাইয়া, ধূপম-প্রকোষ্ঠে (fumigation chamber-এ) শোধন করিয়া এই দুর্লভ সম্পদ সুবিস্তৃত করা হইয়াছে। ‘সাবিত্রী লাইব্রেরী’ হইতে প্রাপ্ত গ্রন্থগুলির মধ্য হইতে কয়েকখানি মাত্র দুর্লভ গ্রন্থের নাম, লেখকের নাম ও প্রকাশকাল নিম্নে দেওয়া হইল ; সম্পূর্ণ তালিকা গ্রন্থাগারিকের নিকট পরিষৎ-সদস্যগণ দেখিতে পাইবেন :

বাল্যাল

- ১। কাদম্বিনী-বিলাস—ত্রৈলোক্যানাথ দে, ১২৭২ বঙ্গাব্দ।
- ২। প্রেম-প্রবাহিনী—বিহারীলাল চক্রবর্তী, ১২৭৭ বঙ্গাব্দ।
- ৩। চণ্ডকৌশিক, ১২৭৫।
- ৪। বিক্রমোর্বশী—কালিদাস, ১২৭৫ বঙ্গাব্দ।
- ৫। জমিদার-দর্পণ—মীর মশাররফ হোসেন, ১২৭৯ বঙ্গাব্দ।
- ৬। সবিতা-সুদর্শন—সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, ১২৭৭ বঙ্গাব্দ।
- ৭। সাক্ষাৎদর্পণ নাটক, ১২৭৮ বঙ্গাব্দ।
- ৮। বর্ষবর্তন, ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দ।
- ৯। শুক-বিলাস—নন্দকুমার কবিরত্ন, ১২৭৫ বঙ্গাব্দ।
- ১০। প্রবোধ প্রভাকর—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ১২৬৪ বঙ্গাব্দ।
- ১১। রত্ন-বেদিকা নাটক—প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১২৭৯ বঙ্গাব্দ।
- ১২। মালবিকাগ্নিমিত্র—কালিদাস, ১২৬৬ বঙ্গাব্দ।
- ১৩। মানস-কুসুম—রামদয়াল ঘোষ, ১২৭৯ বঙ্গাব্দ।
- ১৪। নিসর্গ-সন্দর্শন—বিহারীলাল চক্রবর্তী, ১২৭০ বঙ্গাব্দ।
- ১৫। নন্দ-বিদায় নাটক—গিরিশচন্দ্র দাস, ১২৭৮ বঙ্গাব্দ।
- ১৬। সঙ্কুস্ত-স্বয়ম্বর নাটক—প্রাণনাথ দত্ত, ১২৭৪ বঙ্গাব্দ।
- ১৭। সমাজ-সংস্কার—নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ১২৭৬ বঙ্গাব্দ।
- ১৮। মাধব-মালতী—রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার, ১২৭৬ বঙ্গাব্দ।
- ১৯। মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়—টেকচাঁদ ঠাকুর, ১২৬৬।
- ২০। চক্ষুঃস্থির নাটক—কেন্দ্রমোহন চক্রবর্তী, ১২৭৭ বঙ্গাব্দ।
- ২১। বল্লালী ষাট নাটক—১২৭৪ বঙ্গাব্দ।

- ২২। অম্বিকা-মঙ্গল—ফণিভূষণ বসু, ১২৮৫।
- ২৩। জীলোকের দর্পচূর্ণ—রাধামাধব মিত্র, ১২৭০।
- ২৪। লক্ষ্মণ-বর্জন নাটক—শ্রীশচন্দ্র রায়চৌধুরী, ১২৭৭।
- ২৫। সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটক, ১৭১৭ শকাব্দ।
- ২৬। মাতৃ-বিরোগ—নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, ১২৭৭ বঙ্গাব্দ।
- ২৭। ষোড়শ কবিতা—দীনবন্ধু মিত্র, ১২৭২ বঙ্গাব্দ।
- ২৮। বোধেন্দু-বিকাস—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ১২৭০ বঙ্গাব্দ।
- ২৯। আত্মীয় সভার সভ্যদিগের ব্রতান্ত, ১২৭৪ বঙ্গাব্দ।
- ৩০। অভিন্নব্যবধ কাব্য—অঘোরনাথ শর্ম্মা, ১২৭৪ বঙ্গাব্দ।
- ৩১। কিছু কিছু বৃষ্টি—ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, ১২৭৪ বঙ্গাব্দ।
- ৩২। সঙ্গীত ব্রতশত—মদনমোহন ঘোষ, ১২৭৮ বঙ্গাব্দ।
- ৩৩। শকুন্তলার বনবিহার—রসিকচন্দ্র রায়, ১৮৭৫ খ্রীঃ।
- ৩৪। পদ্মাবতী নাটক—মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ১২৭২।
- ৩৫। কি দুঃখের সত্তর সাল—১২৭১ বঙ্গাব্দ।

1. A Narrative of the transaction in Bengal—Francis Gladwin, 1788
2. Ivanhoe—Sir Walter Scott, 1830
3. My Diary in India—W. H. Russell, 1860
4. The Campaign of Sedan—George Hooper, 1870
5. Poetry for Children—Charles & Mary Lamb, 1878
6. The Place of Politics in the Life of a Nation—Annie Besant, 1895

পত্রিকা

- ১। বামাবোধিনী পত্রিকা, ১ম কল্প, ১ম ভাগ, ১২৭২ ও পরবর্তী সংখ্যা।
সম্পাদক : উমেশচন্দ্র দত্ত, আন্তোভাষ ঘোষ।
- ২। সাধনা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১২৯৮ ও পরবর্তী সংখ্যা।
সম্পাদক : সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- ৩। জ্ঞানাকুর, ১ম বর্ষ, ৩য়—১২শ সংখ্যা, ১২৭৯ ও পরবর্তী সংখ্যা।
সম্পাদক : শ্রীকৃষ্ণ দাস।
- ৪। জাহ্নবী, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১২৯১ ও পরবর্তী সংখ্যা।
সম্পাদক : বীরেশ্বর পাণ্ডে, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

- ৫। রহস্য-সন্দর্ভ, ৭ম বর্ষ, ১২৭৮ ও পরবর্তী সংখ্যা।
সম্পাদক : রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হারাগচন্দ্র রক্ষিত ও অন্যান্য।
 - ৬। নারায়ণ, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩২৩ ও পরবর্তী সংখ্যা।
সম্পাদক : চিত্তরঞ্জন দাস।
 - ৭। প্রচার, ১ম বর্ষ, ১ম—১২শ সংখ্যা, ১২২১ ও পরবর্তী সংখ্যা।
সম্পাদক : উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
 - ৮। নবজীবন, ১ম বর্ষ, ১ম—১২শ সংখ্যা, ১২২১ ও পরবর্তী সংখ্যা।
সম্পাদক : অক্ষয়চন্দ্র সরকার।
 - ৯। নবভারত, ১ম বর্ষ, ১ম—১২শ সংখ্যা, ১২২০ ও পরবর্তী সংখ্যা।
সম্পাদক : দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী।
 - ১০। ভারতী, ১ম বর্ষ, প্রাবণ-চৈত্র ১২৮৪ ও পরবর্তী সংখ্যা।
সম্পাদক : দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্ণকুমারী দেবী ও অন্যান্য।
 - ১১। বঙ্গদর্শন, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১২৭৯ ও পরবর্তী সংখ্যা।
সম্পাদক : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
 - ১২। কল্পনা, ১ম বর্ষ, ১২৮৭-৮৮ ও পরবর্তী সংখ্যা।
সম্পাদক : হরিন্দাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
 - ১৩। কল্পক্রম, ১ম বর্ষ, প্রাবণ ১২৮৬।
সম্পাদক : দ্বারকানাথ বিজ্ঞাভূষণ।
 - ১৪। বাঙ্গব, ১ম বর্ষ, ১২৮১ ও পরবর্তী সংখ্যা।
সম্পাদক : কালীপ্রসন্ন ঘোষ।
 - ১৫। আর্ঘ্যদর্শন, ১ম বর্ষ, ১ম—১২শ সংখ্যা, ১২৮১ ও পরবর্তী সংখ্যা।
সম্পাদক : যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
 - ১৬। সাহিত্য, ২য় বর্ষ, ১২৯৮ ও পরবর্তী সংখ্যা।
সম্পাদক : সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।
- ইংরেজী পত্রিকা**

1. The Dawn, 1903.

Editor : Satischandra Mukherjee.

2. Theosophy in India, 1905

Editor : G. S. Arundale.

পরিষদের বহু মূল্যবান সম্পদ ও হৃদয়প্রাপ্ত গ্রন্থাদি অবহেলায় ও অবহেলায় নষ্ট হইতেছে বলিয়া ১৯শে মে ১৯৭২ (১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭২) তারিখের পত্রে পরিষদের সাধারণ সদস্য শ্রীমদনমোহন কুমার তৎকালীন সভাপতি ও সম্পাদকের নিকট অভিযোগ করিয়া-

ছিলেন এবং ঐ অভিযোগ বিবেচনার জন্য নিযুক্ত ‘পরিষৎ-সম্পাদ-সংরক্ষণ-ও-পরিচালন-তদন্ত কমিটি’র দৃষ্টি কতকগুলি পরিত্যক্ত গ্রন্থ ও অব্যবহার্য্য জিনিসপত্রের স্তুপের দিকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, উক্ত তদন্ত কমিটি তাঁহাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন না করায় ন্যাসরক্ষক-সমিতির অনুমোদনে ও সম্মতিতে কার্য্যনির্বাহক-সমিতি ৫ই মাঘ ১৩৮০ (১৯শে জানুয়ারি ১৯৭৪) উক্ত তদন্ত-কমিটি বাতিল করেন। ১৩৮১ বঙ্গাব্দের প্রারম্ভে পরিষৎ-সভাপতি আচার্য্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অনুমতি লইয়া বর্তমান পরিষৎ-সম্পাদক ঐ পরিত্যক্ত গ্রন্থ ও অব্যবহার্য্য জিনিসপত্রের স্তুপ হইতে পরিষদের তিন জন কর্ম্মীর সহায়তায় বহু মূল্যবান গ্রন্থ ও দুর্লভ প্রাচীন পত্রিকা উদ্ধার করাইয়াছেন। উক্ত স্তুপ হইতে এ পর্য্যন্ত প্রায় দুই হাজার জীর্ণ পুস্তক ও পত্রিকা পাওয়া গিয়াছে, বহু নষ্টপ্রায় গ্রন্থ ও পত্রিকার ছেঁড়া খোলা পাতাগুলি সাজাইয়া রাখা হইতেছে, এবং সেগুলি সঙ্গে সঙ্গে তালিকাভুক্ত করা হইতেছে। এই পরিত্যক্ত পুস্তক-পত্রিকাগুলির অধিকাংশই অতিজীর্ণ ও ভঙ্গুর হইয়াছে, আর কিছুকাল পরেই এগুলি চিরজ্বরে বিনষ্ট হইবে। এই স্তুপ হইতে যে-সমস্ত দুর্লভ পুরাতন পুস্তক, পত্রিকা ও প্রথম সংস্করণের গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে সেগুলির কয়েকখানির নাম, লেখকের নাম ও প্রকাশ-কাল নিম্নে দেওয়া হইল :

বাক্সালা

- ১। বিজয়-বসন্ত—হরিনাথ মজুমদার, ১৭৯১ শক।
- ২। শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেল হইতে যে যে বিষয়ে যে যে আইন ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের যে যে তারিখে জারী হয় তাহার ফিরিস্তি।
- ৩। গবর্নমেন্ট গেজেট, ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ।
- ৪। বাক্সালা ব্যাকরণ—লোহারাম শিরোরড, ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ।
- ৫। হৃদস্নোচ্ছ্বাস বা ভারতবিষয়ক প্রবন্ধাবলি—যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২৮৭।
- ৬। কলিকাতা হু সদর দেওয়ানী আদালতের সরকারী নিষ্পত্তি সমূহ []।
- ৭। বিভাসুন্দর টপ্পা—বংশীবদন চট্টোপাধ্যায়, ১২২১।
- ৮। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবন চরিত ও কবিত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ
—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১২৯২।
- ৯। বত্রিশ সিংহাসন—কালীপ্রসাদ কবিরাজ, ১২৮৩।
- ১০। জাতকচন্দ্রিকা—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৫০ শক।
- ১১। শ্রীশ্রীমৎ উজ্জলনীলমণি গ্রন্থ—প্রবোধানন্দ গোস্বামী অনু, ১৮৮২ খ্রীঃ
- ১২। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ (আদি লীলা), ১২৭৩।
- ১৩। ছামলেট—ললিতমোহন অধিকারী অনু, ১২৯৯।
- ১৪। বাক্সালা হাতেমতাই—ঈশ্বরচন্দ্র সরকার, ১২৮৫।
- ১৫। আনন্দ সিদ্ধান্ত—শ্রীমৎ যোগানন্দ পরমহংস, ১৮৬৫

- ১৬। বিষ্ণু পুরাণ—বেদব্যাস, ১২৯৭।
- ১৭। প্রমথনাথ মিত্র গ্রন্থাবলী—প্রমথ নাথ মিত্র, ১৩০৪।
- ১৮। ইংরাজী ১৮৬০ সালের ৪২ আইন।
- ১৯। ইংরাজী ১৮১৬ সাল হইতে ১৮২১ সালের আইন।
- ২০। ইস্টাম্প আইন, ১২৭২।
- ২১। তারা মা—তারাকুমার কবিরত্ন ১৩০১।
- ২২। নব্য রসায়নী বিজ্ঞান—প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ১২০৬ খ্রীঃ।
- ২৩। হিন্দুশাস্ত্র (২য় খণ্ড)—রমেশচন্দ্র দত্ত, ১৩০৩।
- ২৪। কাঞ্চনবালী—পঞ্চানন রায়চৌধুরী, ১৮৯৯ খ্রীঃ।
- ২৫। বীরবরণ—গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ১২৯০।
- ২৬। একমেবাদ্বিতীয়ং—রাজা রামমোহন রায়, ১৭৬৫ শকাব্দ।
- ২৭। পদ্মমালা (৩য় ভাগ)—মনোমোহন বসু, ১৩০০।
- ২৮। বাউল সংগীত—পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য্য, ১২৯২।
- ২৯। বৃহৎ বাউল সঙ্গীত—নিরুপলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সংগ্রহী, ১২৯৩।
- ৩০। বঙ্গীয় সমালোচক—ফকিরচাঁদ বাবাজী, ১২৮৭।
- ৩১। বাউল সঙ্গীতহার (১ম ও ২য়)—দশরথ সাহা, ১২৯৩।
- ৩৩। বাউল সঙ্গীত, ১ম ভাগ—হরিদাস বাবাজী, ১২৯১।
- ৩৪। বাউল সঙ্গীত (৭ম-১০ম খণ্ড)—ফকিরচাঁদ, ১২৯২।
- ৩৫। বাউল সঙ্গীত, ২য় খণ্ড—তিনকড়ি স্মৃতিরত্ন, ১২৮৯।
- ৩৬। মুদ্রারাক্ষস—হরিনাথ গায়রত্ন, ১৮৬৭ খ্রীঃ।
- ৩৭। ধিয়েটার সঙ্গীত—শরচ্চন্দ্র সরকার সংগ্রহী, ১২৯৫।
- ৩৮। সুধাকর ব্যাকরণ—শ্যামাচরণ কবিরত্ন, ১২৯৫।
- ৩৯। অজু'ন বিজয়—হরিশচন্দ্র কবিরত্ন, ১৮৯৬ খ্রীঃ।
- ৪০। মনসার ভাসান—কেতকানন্দ দাস, ১২৭৬।
- ৪১। ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—হীরালাল চক্রবর্তী, ১২৮৭।
- ৪২। বিজয়কুমার—সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩০৪।
- ৪৩। নলচরিত কাব্য—যাদবচন্দ্র তর্করত্ন, ১৭৮৭ শকাব্দ।
- ৪৪। ভারতবর্ষ বিচার—রামচরণ শিরোরত্ন, ১২৮৪।
- ৪৫। বৈষ্ণবচার দর্পণ—নবদ্বীপচন্দ্র বিজ্ঞানরত্ন, ১৮১৯ খ্রীঃ।
- ৪৬। লক্ষণ বর্জন—দামোদর মুখোপাধ্যায়, ১২৪৭ সম্বৎ।
- ৪৭। ভারতবর্ষীয় কবিদিগের সময়নিক্রপণ—হরিমোহন প্রামাণিক, ১৩০২।
- ৪৮। মাতাজী আশ্রম—চুণীলাল মিত্র ১২৯৫।

- ৪৯। বঙ্কিম-জীবনী—হারাণচন্দ্র রক্ষিত, ১৩০৬।
- ৫০। ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা, ১৩৩৩।
- ৫১। ক্ষুদ্রিমা—ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১২২৪ (অসম্পূর্ণ)।
- ৫২। শাস্ত্রার্থ সঙ্কলন—নীলদেববিহারী গোস্বামী, ১২২৬।
- ৫৩। বিদ্যাসুন্দর টপ্পা—বংশীবদন চট্টোপাধ্যায় সংগ্রাহী, ১২২৪।
- ৫৪। রামের বিয়ে (প্রহসন), ১২৮৩।
- ৫৫। রামকৃষ্ণ পরমহংস অবতার কিনা?—রামচন্দ্র দত্ত, ১২৯২।
- ৫৬। মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের জীবন-চরিত—বিপিনবিহারী মিত্র, ১২৮৬।
- ৫৭। ভক্তহরি—পথিকচন্দ্র কবিরত্ন, ১২৯৩।
- ৫৮। গণিত বিজ্ঞান—জয়গোপাল গোস্বামী, ১২৭৭।
- ৫৯। পরেশের প্রমাদ— [], ১২৯২।
- ৬০। উগ্রকৃত্তির বিবরণ—পঞ্চানন তর্করত্ন, ১২৯৭।
- ৬১। গৃহলক্ষ্মী—গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, ১৩০৩।
- ৬২। প্রলয়ভঙ্গ—চন্দ্রশেখর বসু, ১২৯২।
- ৬৩। সঙ্কাসঙ্গীত—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১২৮৮।
- ৬৪। দৈনিক প্রার্থনা—কেশবচন্দ্র সেন, ১৮১০ শক।
- ৬৫। শরীর বিধান বা জীবিতের দেহতত্ত্ব—মহেন্দ্রনাথ ঘোষ, ১৮৮০ খ্রীঃ।
- ৬৬। বক্তৃতা কুসুমঞ্জলি—চন্দ্রশেখর বসু, ১২৮২।
- ৬৭। সাধু গিরীন্দ্রমোহনের জীবনী—শশীভূষণ বসু, ১৮৮৯ খ্রীঃ।
- ৬৮। বিচার তরঙ্গিণী—কাশীদাস মিত্র, ১২৭৫।
- ৬৯। জ্ঞানকী বিলাপ—হরিমোহন রায়, ১২৮২।
- ৭০। কমলে কামিনী—জীবনকৃষ্ণ সেন, ১২৯০।
- ৭১। কলির অবতার—মহেন্দ্রনাথ নাথ, ১২৯৪।
- ৭২। কলি মাহাত্ম্য—এস. বি. পাল, ১৩০৬।
- ৭৩। কাশ্মিরোগ চিকিৎসা—অমৃতলাল ভট্টাচার্য্য, ১৮৮৩ খ্রীঃ।
- ৭৪। লক্ষণ দিগ্ভ্রম—রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও ভবানীচরণ ভট্টাচার্য্য, ১৭৯০ শক।
- ৭৫। অঞ্জলি—হরিবোল চৈতন্যস্বামী, ১৩০৪।
- ৭৬। পদকল্পলতিকা—গৌরমোহন দাস সংগ্রাহী, ১২৯৭।
- ৭৭। মূল চণ্ডীর ভাষা—যাদবচন্দ্র শর্মা, ১২৭৬।
- ৭৮। হরিশচন্দ্র নাটক—মনোমোহন বসু, ১২৮৬।
- ৭৯। অদ্ভুত বন্ধ বা দ্বীপুর্ববের বন্ধ—বীরেশ্বর পাণ্ডে, ১২৯৫।
- ৮০। বিদ্যাসুন্দর গীতাভিনয়—গোপাল উড়ে, ১৩৩৪।

- ৮১। বেদান্ত দর্শন—চন্দ্রশেখর বসু, ১২২৭।
 ৮২। সাধন প্রদীপ—শশধর তর্কচূড়ামণি, ১৮২২ শক।
 ৮৩। অভিযন্তা সম্ভব কাব্য—প্রসাদ দাস গোস্বামী, ১৮০৩ শক।
 ৮৪। রসাবিকার বৃন্দক—শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ১২৮৭।
 ৮৫। ভুবনদীপকম্—ভট্টনারায়ণ, ১২২২।
 ৮৬। রিপুবিহার—মহিমাচন্দ্র চক্রবর্তী, ১২৭৮।
 ৮৭। এটা কোন যুগ?—সখারাম গণেশ দেউস্কর, ১২২২।
 ৮৮। রামায়ণ—বাল্মিকী, ১৮০৩ খ্রী:। (শ্রীরামপুর মিশন প্রেস)
 ৮৯। কথা-সরিৎ-সাগর—চন্দ্রনাথ বসু অহু°, ১৩০২-১৩১৪।
 ৯০। ভারতে শক্তিপূজা—স্বামী সারদানন্দ, ১৩১৭।
 ৯১। সর্জীবাগান—কালীচরণ চট্টোপাধ্যায়, ১৮৮৫ খ্রী:।
 ৯২। উজীরপুত্র—ফকিরচাঁদ বর্মাণ, ১৮৭৩ খ্রী:।
 ৯৩। ব্যাকরণ সংগ্রহ—হেরম্বনাথ তত্ত্বরত্ন স°, ১৯০২ খ্রী:।
 ৯৪। মূখ্যবোধং ব্যাকরণং—বোপদেব কৃত, ১২৬১।

ইংরেজী

1. Original Papers relative to the disturbances in Bengal, 1763.
2. Press & Press Laws in India—Hemendra Prasad Ghose, 1930.
3. Proposals for and contributions to A Ballad history of England and the States sprung from her—W. C. Bennett, 1868.
4. The Kinship between Hinduism and Buddhism—Henry S. Olcott, 1893.
5. Sermista : A drama in five Acts, tr from the Bengali by the author Michael M. S. Dutt, 1859.
6. Sacontala or the Fatal Ring, tr. by Sir William Jones, []
7. Modern Painters, Vol. I. 3rd ed. by A Graduate of Oxford, 1846.
8. Origin of the Durga Puja—Pratapachandra Ghosha, 1874.
9. The Sayings of Sri Ramakrishna, Comp. Swami Abhedananda, 1903.
10. Concise History of Religion, Vol. II—F. J. Gould, 1895.
11. Goethe—A. Hayward, 1884.
12. Burke : Selected Works, Vol. I ed. by Payne, 1881.
13. Imperial Dictionary, Vol. II, Comp. Ogilvie, 1856.
14. Literary Studies, Vol. I—Walter Bagehot, 1879.
15. Encyclopaedia Americana, Vol. II, 1830.

16. Keshub Chunder Sen in England. Vol. I, 1881
16. History of the United States—Salma Hale, 1848
17. The Prelude—W. Wordsworth, 1887
18. Massillon's Sermons Vol. I, 1742
19. A Calender of Indian State Papers (Secret Series),
Fort William, 1774-78. (1864)
20. The Women of Shakespeare. tr. by H. Zimmern, 1894
21. Man All Immortal—D. W. Clark, 1864
22. A Comprehensive History of the Religion of the Hindus
—Dhirendranath Pal, 1901
23. Mudra Rakshasa, Ratnavali etc. tr. by H. H. Wilson, 1901
24. A History of the Early part of the reign of James the
Second—James Fox, 1808
25. The Spoilt Child [আলালের ঘরের ছালালের ইংরেজী অনুবাদ] tr. by
G. D. Oswell, 1893
26. The Soul of India—Bipin Chandra Pal, 1911
27. A School History of India—Haraprasad Sastri, 1896
28. Naradiya Dharmasastra—Julius Jolly, 1876
29. A Memoir on the Coefficients of Numbers being a Chapter in
the Theory of Numbers—Brajendranath Seal, 1891
30. Distracted Love [উদ্ভ্রান্ত প্রেম]—D. N. Singhaw, 1904
31. The Hindu System of Religions, Science and Art—Kishorilal
Sarkar, 1898
32. The Last Days in England of the Rajah Rammohun Roy—
Mary Carpenter, 1875
33. Puranas—H. H. Wilson, 1898
34. Asiatic Researches, or Transactions of the Society,
Vol. I, II, III, IV, V, 1799
35. The Life of Lorenzo De Medici—W. Roscoe, 1847
36. Studies in Early Indian Thought—D. J. Stephen, 1918
37. The Works of the English Poets—Samuel Johnson, 1779
38. A Sketch of the History of Orissa—G. Toynbee, 1873
39. Birds and Flowers—Mary Howitt, 1871
40. A Catena of Buddhist Scriptures from the Chinese—Samuel
Beal, 1871
41. Echoes from Old Calcutta—H. E. Busteed, 1882
42. Indian Coins (with 5 plates)—E. J. Rapson, 1898
43. Kasi or Benares, 1897
44. Abstracts of the Papers printed in the Philosophical Trans-

action of the Royal Society of London Vol. II : 1815—1830, 1833

45. Outlines of Natural Philosophy, Vol. I—John Playfair, 1819
46. Dictionary in English and Bengalee, Vol. I—Ram Comul Sen, 1834
47. The Srauta-Sutra of Katyayana, ed. Dr. Albrecht Weber, 1856
48. Thesaurus/Numismatum./E Musæo/Caroli Patini/Doctoris Medici Parisiensis./Sumptibus Autoris./ M.DC. LXXII. [১৬৭২ খ্রী.] [প্রাচীন মুদ্রা সংক্রান্ত দুর্লভ সচিত্র গ্রন্থ]।

আমাদের সৌভাগ্যক্রমে প্রাপ্ত, পূর্বসূরীদের সুকৃতিলাব্ধ এই অমূল্য সম্পদ ভবিষ্যৎ-বংশীয়দের জন্য যথোপযুক্তভাবে রক্ষা করিতে হইলে একটি আধুনিক fumigation chamber, পরিষদ-ভবনে lamination-এর সরঞ্জাম ও দুর্লভ জীর্ণ গ্রন্থ বাঁধাইয়ের দপ্তরী-খানা, microfilm করার ব্যবস্থা এবং কতকগুলি সুরক্ষিত পুস্তকাদার অবিলম্বে প্রয়োজন। এজন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক, পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ ও সেই জনসাধারণের গঠিত সরকার এবং সহৃদয় পরিষৎ-সদস্যগণের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করি। বঙ্গভাষা, বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গ-সংস্কৃতি লইয়া আমরা গৌরব করি, শ্রম ও সেবার দ্বারা সেই গৌরব-কীর্তনের অধিকার আমাদের অর্জন করিতে হইবে।

৮ই শ্রাবণ ১৩৮১ বৃহস্পতিবার, ২৫শে জুলাই ১৯৭৪, অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় পরিষদ-মন্দিরে পরিষদের ৮২তম প্রতিষ্ঠাদিবস-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠা-দিবসে পরিষদ-মন্দির সুসংস্কৃত ও সুসজ্জিত করা হয়। প্রবেশদ্বারে মঙ্গলঘট, কদলীরূক্ষ ও আত্মপল্লবে মাজলিক রচনা করা হয়। চিত্রশালার প্রবেশপথ ও গৃহতল, রমেশ-ভবনের দ্বারপথ ও সভাকক্ষ শোভনসুন্দর আলপনায় মণ্ডিত হয়। পরিষৎসভাপতি আচার্য্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই উৎসবে পৌরোহিত্য করেন। পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীআর্কটনি লাজলট ডিয়ার্স প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। এই উপলক্ষে মাননীয় রাজ্যপাল অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায় পরিষদ-মন্দিরে শুভাগমন করিলে পরিষদের সভাপতি আচার্য্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সহ-সভাপতি আচার্য্য শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার ও পরিষৎ-সম্পাদক শ্রীমদনমোহন কুমার পরিষদের পক্ষ হইতে রাজ্যপালকে সাদর অভ্যর্থনা করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ এবং পরিষৎ-সভাপতি ও কার্যনির্বাহক-সমিতির সদস্যগণের সহিত মাননীয় রাজ্যপাল পরিষদের গ্রন্থশালা, চিত্রশালা (museum) ও পুথিশালা পরিদর্শন করেন। চিত্রশালার রক্ষিত প্রাচীন মূর্তি প্রত্নবস্তু ও পোড়ামাটির অলঙ্করণ, বঙ্গের সাহিত্যিক

ও মনীষিদের চিত্রপট হস্তলিপি পাণ্ডুলিপি ও ব্যবহৃত পোষাক-পরিচ্ছদ ও ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, সিস্টার নিবেদিতার ডায়েরি ও পেন্সিলস্কেচ, কাদম্বরী দেবী কর্তৃক বিহারীলালকে প্রদত্ত সাধের আসন ইত্যাদি রাজ্যপাল বিশেষ আগ্রহ ও কৌতূহলের সহিত দর্শন করেন; পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথিগুলির সংরক্ষণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। চিত্রশালা পরিদর্শনাশ্তে মাননীয় রাজ্যপাল রমেশ-ভবনের সুসজ্জিত সভাকক্ষে আগমন করেন। পরিষদের সদস্যগণ ও শ্রোতৃমণ্ডলী রাজ্যপালকে অভ্যর্থনা করেন।

সমবেতকণ্ঠে ‘বন্দে মাতরম্’ উদ্বোধন-সঙ্গীতের পর সভার কার্য আরম্ভ হয়। পরিষদের ৮২তম প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে প্রেরিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর শুভেচ্ছা-বাণী, রোগশ্যালগ্ন প্রবীণ সাহিত্যিক পণ্ডিত শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের শুভকামনা, কেন্দ্রীয় উপমন্ত্রী অধ্যাপক শ্রীপ্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য সুধীজনের বাণী সভায় পঠিত হয়। পরিষদের প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে যে সমস্ত গ্রন্থ, পুথি, প্রত্নবস্তু ও শিল্পকর্ম উপহারস্বরূপ পরিষদ মন্দিরে প্রদত্ত হইয়াছে সেগুলির একটি প্রদর্শনী পরিষৎ-সভাপতি আচার্য্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় উদ্বোধন করেন। মাননীয় রাজ্যপাল পরিষদের প্রতিষ্ঠাদিবসে প্রদত্ত উপহার-সামগ্রীর প্রদর্শনীটি দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন এবং বলেন যে বাঙ্গলার মত সমৃদ্ধ ভাষার আরও বহুসংখ্যক গ্রন্থ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে উপহার প্রদত্ত হওয়া উচিত, বাঙ্গালা ভাষায় কোনও গ্রন্থ প্রকাশিত হইলেই তাহার অন্তত একখানি কপি লেখক বা প্রকাশক কর্তৃক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে প্রদান করার জগ্য আইন হওয়া উচিত, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টিও মাননীয় রাজ্যপাল এ-বিষয়ে আকর্ষণ করেন।

৮২তম প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে পরিষদের প্রতিষ্ঠাতাদের সাধনা ও কর্মপ্রেরণার বহু অপ্রকাশিত তথ্য-সম্বলিত একখানি পুস্তক “বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইতিহাস: প্রথম পর্ব” পরিষদের সভাপতি কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয় এবং ঐ গ্রন্থের প্রথম কপি মাননীয় রাজ্যপালকে পরিষদের পক্ষ হইতে পরিষৎ সভাপতি উপহার দেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দির হইতে অপহৃত একাদশ শতাব্দীর একটি বিষ্ণুমূর্তি পুনরুদ্ধারের শুভ সংবাদ পরিষৎ সম্পাদক শ্রীমদনমোহন কুমার সভায় ঘোষণা করেন এবং বোস্টন মিউজিয়ামের কর্তৃপক্ষকে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে, মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী ডিয়াসকে, ও ওয়াশিংটনে ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রী টি. এন. কাওলকে এই বিষয়ে সহায়তার জন্য পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

পরিষদের প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে গ্রীস হইতে ভারততত্ত্ববিৎ ডক্টর শ্রীমতী এলিকি জ্যানাস্ Dr. Mrs. Heliki Zannas পরিষৎ মন্দিরে আগমন করেন এবং গ্রীসের আথেনাই (Athens) বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত গ্রীক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত দিমিত্রিঅস্ গালানস্-এর তৈলচিত্র হইতে তিনি যে-ছবি প্রস্তুত করিয়া ভারতে আনিয়াছেন তাহা সভাস্থলে স্থাপনা করেন।

আচার্য্য শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার রাজ্যপালকে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া ভাষণ দেন এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অতীত গৌরব ও বর্তমানের নানামুখী প্রচেষ্টার আলোচনা করেন, সমগ্রপ্রকাশিত ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইতিহাস’ গ্রন্থখানিতে পরিষদের যে বিস্মৃত ইতিহাসের পুনরুদ্ধার ঘটিয়াছে তাহা উল্লেখ করেন। পরিষৎ সভাপতি আচার্য্য সুনীতিকুমার তাঁহার ভাষণে পরিষদের বিচিত্র কর্মধারার পরিচয় দেন, পরিষদে কিভাবে নবজীবন সঞ্চারিত হইয়াছে তাহা বর্ণনা করেন, এবং গ্রীস হইতে বঙ্গদেশে তথা ভারতে আগত প্রথম গ্রীক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত দিমিত্রিঅস্ গালানস্-এর জীবন ও কীর্তির কথা বর্ণনা করেন। পরিষদের উদ্বোধন-ও উদ্বোধন-পূর্বে ইউরোপীয় মনীষিবৃন্দের সহিত সংযোগের বিচিত্র ইতিহাস—যাহা এতদিন আমাদের অজ্ঞাত ছিল তাহা—পরিষদের ৮২তম প্রতিষ্ঠাদিবসে প্রকাশিত হওয়ায় সভাপতি মহাশয় আনন্দপ্রকাশ করেন এবং প্রায় ১০ বৎসর পূর্বে পরিষদের অপহৃত বিষ্ণুমূর্তি পুনরুদ্ধারের জন্য তাঁহার ছাত্র পরিষৎ-সম্পাদক শ্রীমদনমোহন কুমার যে প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা সফল হওয়ায় তাঁহাকে আশীর্বাদ জ্ঞাপন করেন ও বোস্টন মিউজিয়মের কর্তৃপক্ষকে তাঁহাদের সৌজন্যের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

মাননীয় রাজ্যপাল তাঁহার ভাষণে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গৌরবময় কীর্তির আলোচনা ও পরিষদের বর্তমান উন্নয়নমূলক সমবেত চেষ্টার প্রশংসা করেন, অপহৃত বিষ্ণুমূর্তি পুনরুদ্ধারে আনন্দ প্রকাশ করেন এবং অর্থাভাবে পরিষদের যে সমস্ত অমূল্য রত্ন যথাযোগ্যভাবে সংরক্ষণ করা যাইতেছে না সেগুলির জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। মাননীয় রাজ্যপাল এই সকল অমূল্য সম্পদ সংরক্ষণের জন্য দশ হাজার টাকা দান সভাস্থলে ঘোষণা করেন। সমবেত শ্রোতৃবৃন্দ রাজ্যপালের এই মহানুভবতায় সর্হর্ষ অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন তাঁহার ভাষণে বলেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বঙ্গের দুই প্রাচীন সারস্বত প্রতিষ্ঠান, এই দুই প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নানাভাবে কার্য্যকর ও ফলপ্রসূ হইতে পারে। এবং সেজন্য দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিবিড়তর সক্রিয় যোগ তিনি কামনা করেন।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক শ্রীমুভুজবন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার ভাষণে বঙ্গভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অতুলনীয় দানের কথা উল্লেখ করেন এবং পরিষদের পুনরুজ্জীবন ও উন্নয়নমূলক কাজের জন্য অভিনন্দন জানান।

সাহিত্যিক শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) সাহিত্য-সাধনার পীঠস্থান, সাহিত্যিক-তীর্থ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

পরিশেষে পরিষদের পক্ষ হইতে মাননীয় রাজ্যপাল, আচার্য্য সুনীতিকুমার, আচার্য্য রমেশচন্দ্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী, ‘বনফুল’, অভ্যাগত

সুধীন্দ্র ও সদস্যবৃন্দকে পরিষৎ-সম্পাদক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং পরিষদের যে সকল কর্মী নিরলস শ্রমে, হাসিমুখে, নিজেদের নিদারুণ দৈন্য ও দারিদ্র্য সত্ত্বেও পরিষদের সেবা করিতেছেন ও এই উৎসব সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন তাঁহাদের সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। সমবেত-কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত “জনগণ-মণ-অধিনায়ক” গীত হওয়ার পর সভাভঙ্গ হয় ॥

৮ই শ্রাবণ ১৩৮১ প্রতিষ্ঠাদিবস-উৎসবের পর আচার্য্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দিরে পরিষদের ৮১তম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। বার্ষিক কার্য্যবিবরণ, ১৩৮১ সনের পরীক্ষিত হিসাবপত্র ও উদ্বর্তপত্র, ১৩৮২ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়ব্যয়-বিবরণ (বজেট) সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। অতঃপর সর্বসম্মতিক্রমে পরিষদের ৮২তম বর্ষের কর্ম্যাক্ষ নিৰ্বাচন হয় এবং কার্য্যনির্বাহক সমিতির নিৰ্বাচিত সদস্যগণের নাম ও শাখাপরিষৎ-সমূহ কর্তৃক নিৰ্বাচিত শাখা-প্রতিনিধিগণের নাম সভাপতি কর্তৃক ঘোষিত হয়। শ্রীবলাইচাঁদ সাহা (কুণ্ড) ও শ্রীমল্লকুমার দেব চার্চার্ড একাউন্ট্যান্ট-দ্বয় বিনা পারিশ্রমিকে পরিষদের হিসাবপত্র পরীক্ষা করার জন্য তাঁহাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়, এবং ১৩৮২ বঙ্গাব্দের জন্য তাঁহাদিগকে হিসাব পরীক্ষক নিৰ্বাচন করা হয়। সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদদানান্তে সভাভঙ্গ হয় ॥

শ্রীমদনমোহন কুমার

সম্পাদক

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ॥

শুভ সংবাদ

আজ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৮২তম প্রতিষ্ঠাদিবসে পরিষদের সদস্য, হিতৈষী ও সুহৃদগণের নিকট একটি পরম শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করিবার অপরিণীম সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছে।

মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদীঘি গ্রামের নিকটবর্তী একটি স্থান হইতে তিনটি হুল্লভ বিষ্ণুমূর্তি (খ্রীষ্টীয় ১১শ শতকের) পরিষদের চিত্রশালায় (Museumএ) ৬৫ বর্ষ পূর্বে সংগৃহীত হইয়াছিল। পরিষৎ-সদস্য কান্দীর কিশোরীমোহন সিংহ এই তিনটি হুল্লভ বিষ্ণুমূর্তি সংগ্রহ করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর নিকট প্রদান করেন। ২৬শে অগ্রহায়ণ ১৩১৬ রবিবার, ১২ই ডিসেম্বর ১৯০৯, কবির দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে মূর্তিগুলি সহকারী সম্পাদক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদর্শন করেন। এই মূর্তি তিনটির অপূর্ব সৌন্দর্য William Rothenstein উইলিয়ম রদেনস্টাইন, E. B. Havel জে. বি হাভেল, Percy Brown পার্সি ব্রাউন, আনন্দ কে. কুমারস্বামী প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত শিল্প-রসিকদের সবিষয় প্রশংসা অর্জন করে। ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯১১ রদেনস্টাইন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আসিয়া এই বিষ্ণুমূর্তি তিনটি দেখিয়া লিখিয়াছিলেন :

I have just seen 3 bronzes in this small museum which it would be impossible to match, I think, anywhere in the world. I cannot conceive anything more noble and beautiful to exist than these 3 figures; and I think the day will come when full justice will be done to the genius of the people which has produced them and so many other admirable things.

William Rothenstein

President,

February 21, 1911

Society of India, Great Britain and Ireland.

এই মূর্তি তিনটি ১৯৪৭-৪৮ সালে লণ্ডনে Royal Academy of Art রয়েল একাডেমি অফ আর্ট কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক শিল্প-প্রদর্শনীতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সৌজন্যে প্রদর্শিত হইয়া বিশ্ব-শিল্পরসিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

দুর্ভাগ্যক্রমে এই তিনটি বিষ্ণুমূর্তির মধ্যে একটি ১৭ই ফাল্গুন ১৩৬৩ (১লা মার্চ ১৯৫৭) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দির হইতে অপহৃত হয়। ২৫শে ফাল্গুন ১৩৬৩ (২ই মার্চ ১৯৫৭) কার্যানির্বাহক-সমিতির সভায় তৎকালীন সম্পাদক নির্মলকুমার বসু এই বিষ্ণুমূর্তি নির্ধোজ হওয়ার সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া এ-বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে প্রকাশ করেন। ২৫শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪ (৮ই জুন ১৯৫৭) তারিখের কার্যানির্বাহক

সমিতির সভায় তৎকালীন সহকারী সম্পাদক পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জানান যে, গত ১লা মার্চ তারিখে পরিষদ হইতে যে মূল্যবান মূর্তিটি অপহৃত হইয়াছে এবং যাহা এখন পুলিশের অনুসন্ধানের বিষয় হইয়া আছে তাহা কলিকাতারই কোন ধনী ব্যক্তি ৫০০ পাঁচ শত টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়াছেন বলিয়া তিনি সংবাদ পাইয়াছেন। ঐ টাকা ফেরত পাইলে উক্ত ব্যক্তি মূর্তিটি ফেরৎ দিতে পারেন বলিয়া আশ্বাস পাওয়া গিয়াছে এবং পরিষদের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া মূর্তিটি পুনঃসংগ্রহ করা প্রয়োজন বলিয়া তিনি চেষ্টা করিতে বলেন। ২১শে আষাঢ় ১৩৬৪ (৬ই জুলাই ১৯৫৭) কার্য্য-নির্বাহক-সমিতির সভায় “সহকারী সম্পাদক পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জানাইলেন যে, পরিষৎ হইতে অপহৃত বিষ্ণুমূর্তিটির সন্ধান নেহাৎ ঘটনাচক্রে পরিষদেরই একজন সভ্য শ্রীঅজিত ঘোষ মহাশয়ের নিকট হইতে পাওয়া যায়। কলিকাতার কোন বিশিষ্ট সংগ্রহকারী উহা পাঁচ শত টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। ঐ সংগ্রহকারী পঁচশত টাকা বিনা রসিদে ফেরত পাইলে ও তাঁহার নাম প্রকাশ না পাইলে মূর্তিটি পরিষদকে প্রত্যর্পণ করিতে রাজী হন। উপায়ান্তর না থাকায় এবং মূর্তি ফেরত না পাইবার আশঙ্কায় বাধ্য হইয়া পাঁচশত টাকা দিয়া ঐ মূর্তি ফেরত লওয়া হইয়াছে।” সভাপতি ও সম্পাদক দুইজনেই কলিকাতার বাহিরে থাকায় শ্রীঅজিত ঘোষ, সজনীকান্ত দাস, সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মূর্তিটি পরিষদের তহবিল হইতে ৫০০ টাকা ব্যয়ে উদ্ধার করিয়া আনেন এবং পরে সভা এই খরচ মঞ্জুর করেন।

পুলিসের সহায়তা না লইয়া এবং পুলিসকে না জানাইয়া পরিষৎ নিজ সম্পত্তি ক্রয় করেন। এ-বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে আলিপুরের রাজা সন্তোষ রোডের এক ধনাঢ্য ব্যক্তির গৃহে মূর্তিটি ছিল এবং সেখান হইতে মূর্তিটি আনা হইয়াছিল।

তাঁহার পর ১৯৬৫ সালের ১৪ই জানুআরি মধ্যরাত্রে পরিষদের মিউজিয়মের তাল ভাঙ্গিয়া অপর দুইটি বিষ্ণুমূর্তি চুরি হয়। কলিকাতা পুলিসে ও গোয়েন্দাবিভাগে সংবাদ দেওয়া হয়, কিন্তু কোনও মূর্তিরই সন্ধান পাওয়া যায় না। এ ব্যাপার লইয়া আর কেহ অগ্রসর হন না। এই সংক্রান্ত পুলিস রিপোর্টের ফাইলটি পরিষৎ-কার্যালয় হইতে পরে অদৃশ্য হয়।

পরিষদের বিভিন্ন মূল্যবান সম্পদ, প্রাচীন যন্ত্রা, প্রত্নবস্তু ইত্যাদি চুরি গিয়াছে, স্থানান্তরিত হইতেছে, এবং অবৈধভাবে ব্যবহৃত হইতেছে বলিয়া ১৯শে মে ১৯৭২ সালে পরিষদের সাধারণ-সদস্য-রূপে শ্রীমদনমোহন কুমার তৎকালীন পরিষৎ সভাপতি নির্মলকুমার বসু ও সম্পাদক শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর নিকট দৃষ্টান্ত-সহকারে কতকগুলি অভিযোগ করেন। অভিযোগগুলির তদন্তের জন্য ১১ই জুন ১৯৭২ (২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯) ‘পরিষৎ-সম্পদ-সংরক্ষণ-ও-পরিচালন-তদন্ত-কমিটি’ নিযুক্ত হয়। দুঃখের বিষয়, তদন্ত-কমিটির কার্য্য

সামান্য অগ্রসর হইয়া বন্ধ হয়। উক্ত তদন্ত-কমিটি তাঁহাদের সংগৃহীত তথ্য, কাগজপত্র ও কার্যবিবরণ পুনঃপুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও কার্যনির্বাহক-সমিতি ও ন্যাসরক্ষক-সমিতির নিকট দাখিল করেন নাই। কার্যনির্বাহক-সমিতি ৫ই মাঘ, ১৩৮০ (১৯শে জানুআরি, ১৯৭৪) উক্ত তদন্ত-কমিটি বাতিল করেন।

অতঃপর সভাপতি শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অনুমতি লইয়া পরিষদের অপহৃত সম্পদ পুনরুদ্ধারের জন্য ১৯৭৪ সালের জানুআরি হইতে বর্তমান সম্পাদক অনুসন্ধান শুরু করেন। ১৯৭৪ সালের জানুআরি-ফেব্রুআরি মাসে বর্তমান পরিষৎ-সম্পাদক, পরিষৎ-সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সম্মতি লইয়া, ঐ অপহৃত বিষ্ণুমূর্তিগুলির আলোকচিত্র মনোমোহন গাঙ্গুলীর “Handbook to the Sculptures in the Museum of the Bangiya Sahitya Parishad” গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট ছবি হইতে তুলিয়া বিশ্বের বিভিন্ন প্রখ্যাত মিউজিয়মে পাঠাইয়া অনুরূপ বিষ্ণুমূর্তি সেখানে আছে কিনা এবং থাকিলে তাহার পরিচয় বিবরণাদি জানাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লেখেন। সৌভাগ্যক্রমে আমেরিকার Museum of Fine Arts, Bostonএর কিউরেটর শ্রীযুক্ত য়ান ফন্টেন Jan Fontein ২৭শে মার্চ ১৯৭৪ তারিখের পত্রে পরিষৎ-সম্পাদককে জানান যে দুইটি মূর্তির একটির অনুরূপ (ঈষৎ বিকৃত) মূর্তি বোস্টন মিউজিয়মে ১৯৭০ সালে প্রাচীন-শিল্পসামগ্রী-বিক্রেতার নিকট হইতে ক্রীত হইয়াছে এবং ১৯৩৩ সালে দিল্লী হইতে প্রকাশিত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘Eastern Indian School of Mediaeval Sculpture’ গ্রন্থে মুদ্রিত ঐ মূর্তির চিত্র দেখিয়া তাঁহারা উহা ক্রয় করিয়াছেন এবং ঐ গ্রন্থে বা মুদ্রিত চিত্রে ঐ মূর্তি যে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের মূর্তি তাহা কোথাও উল্লেখ নাই। ঐ মূর্তির স্বত্বস্বামিত্বের প্রমাণ দাখিলের জন্য পরিষৎ সম্পাদককে আহ্বান জানাইলে পরিষদের গত ৬৫ বৎসরের পুরাতন নথিপত্র ও ২৫ বৎসর পূর্বকার সংবাদপত্রাদির বিবরণ ও আলোকচিত্রাদি হইতে পরিষদের স্বত্বস্বামিত্বের প্রমাণের নিদর্শন সঙ্কলন করিয়া পরিষৎ-সম্পাদক পাঠান। পরিষদের স্বত্বস্বামিত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে পরিষদের সম্পত্তি পরিষদে প্রত্যর্পণের জন্য সম্পাদকের অনুরোধে বোস্টন মিউজিয়ম কর্তৃপক্ষ অসাধারণ সৌজন্য ও সহৃদয়তার সহিত স্বীকৃত হন এবং সম্পাদকের প্রস্তাব-অনুযায়ী ওয়াশিংটনে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের হাতে উহা সমর্পণ করিতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

বোস্টন মিউজিয়মের আইন-উপদেষ্টা মেসার্স কোএট্‌, হল এণ্ড স্টুয়ার্ট Cohate, Hall & Stewart বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এবং বোস্টন মিউজিয়ামের মধ্যে একটি চুক্তিপত্র সম্পাদনের জন্য খসড়া প্রস্তুত করেন। কলিকাতা হাইকোর্টের ও সুপ্রীম কোর্টের এডভোকেট শ্রীমদেবশঙ্কর ভূঞা পরিষদের পক্ষে উহা অনুমোদন করেন। গত ২২শে মে, ১৯৭৪ ঐ চুক্তিপত্রের ‘প্রথম পক্ষ-বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ’-এর পক্ষে সম্পাদক শ্রীমদনমোহন

কুমার এবং 'দ্বিতীয় পক্ষ বোস্টন মিউজিয়ম অফ ফাইন আর্টস'-এর পক্ষে ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত মেরিল সী রুপেল Merrill C. Ruepell ঐ চুক্তিপত্র স্বাক্ষর ও শীলমোহর করেন।

অতঃপর পরিষৎ-সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে ১৩ই জুন ১৯৭৪ তারিখের পত্রে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তার জন্য এবং ভারত সরকারের বায়ে মূর্তি ভারতে আনার জন্য অনুরোধ করেন এবং প্রধানমন্ত্রী দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন ও তাঁহার ২৪শে জুন ১৯৭৪ তারিখের পত্রে শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে জানান যে ভারতীয় পররাষ্ট্র-মন্ত্রকে ও ওয়াশিংটনে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের দফতরে তিনি এ বিষয়ে নির্দেশ প্রেরণ করিতেছেন এবং বোস্টন মিউজিয়মের কিউরেটরকেও প্রধানমন্ত্রী ধন্যবাদজ্ঞাপক পত্র পাঠাইতেছেন।

১২ই জুলাই, ১৯৭৪ মহামান্য রাজ্যপাল রাজভবনে অনুগ্রহপূর্বক পরিষৎ-সম্পাদক শ্রীমদনমোহন কুমারের সহিত আলোচনা-কালে এই সংক্রান্ত সমস্ত কাগজ ও দলিলপত্র দেখিয়া কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন।

১৯শে জুলাই, ১৯৭৪ বোস্টন মিউজিয়মের কিউরেটর পরিষদের ঐ বিষ্ণুমূর্তি ওয়াশিংটনে ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রীযুক্ত টি. এন. কাওলের T. N. Kaul-এর হাতে সমর্পণ করিয়াছেন এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষে ভারতের রাষ্ট্রদূত উহা গ্রহণ করিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পৃষ্ঠপোষক রাজ্যপাল শ্রীআর্টনি লাললট্ দিয়াসের প্রস্তাব অনুসারে ঐ মূর্তি ওয়াশিংটনে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত, ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নিকট পাঠাইবেন। যথোপযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থাসহ ঐ বিষ্ণুমূর্তি প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আমাদের মাননীয় রাজ্যপাল ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পৃষ্ঠপোষক শ্রীযুক্ত আর্টনি লাললট্ দিয়াসের নিকট প্রেরণ করিবেন। পরিষদ মন্দিরে আয়োজিত একটি ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানে মহামান্য রাজ্যপাল উহা পরিষদ মন্দিরে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নবীন বর্ধারম্ভে ইহা আমাদের শুভ কর্মপথে প্রেরণা দিবে।

নানা কারণে এ সম্পর্কিত সকল সংবাদ সভাপতি মহাশয়ের নির্দেশে এতদিন গোপন রাখা হইয়াছিল। ৮২তম প্রতিষ্ঠা-দিবস-উৎসবের প্রাক্কালে মূর্তি প্রতাপিত হওয়ায় এই আনন্দ-সংবাদ সভাপতি মহাশয়ের নির্দেশে পরিষৎ-সদস্যগণের ও জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করা হইল।

এই ব্যাপারে সর্ববিধ সহায়তা দান করার জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, রাজ্যপাল শ্রীআর্টনি লাললট্ দিয়াস, ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রী টি. এন. কাওল, বোস্টন মিউজিয়মের কিউরেটর শ্রীযুক্ত জান ফন্টেন Jan Fontein ও ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত মেরিল সী রুপেল, Cohate Hall & Stewart প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট আইনজ্ঞ শ্রীযুক্ত ওয়েল্ড এস. হেনশাউ Weld S. Henshaw, জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, আচার্য্য শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীঅজিত ঘোষ এবং পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপালের

এসিষ্টেন্ট সেক্রেটারি কল্যাণী শ্রীমান অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে মূর্তি পুনরুদ্ধারের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ, নির্দেশ ও সহপদেশের জন্য সর্বান্তঃকরণে কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁহাদের সহায়তা ব্যতীত এই কার্য সম্পন্ন করা সম্ভব হইত না।

অপহৃত দুইটি বিষ্ণুমূর্তি এক লক্ষ ডলারে আমেরিকায় বিক্রয় করা হইয়াছে এইরূপ সংবাদ পাইয়া পরিষৎ-সম্পাদক কার্যনির্বাহক-সমিতি ও ন্যাসরক্ষক-সমিতিকে জানাইয়াছিলেন। এখন জানা গিয়াছে যে বোস্টন মিউজিয়মের কর্তৃপক্ষ ৫০ হাজার ডলারে (পৌনে চার লক্ষ টাকায়) পরিষদে প্রত্যাগিত এই বিষ্ণুমূর্তিটিকে ক্রয় করিয়াছিলেন। ভারতের জনৈক বিখ্যাত শিল্পসামগ্রী-বিক্রেতার নিকট হইতে বোস্টন মিউজিয়ম উহা ক্রয় করিয়াছিলেন এবং উক্ত বিক্রেতা পরিষৎ-সম্পাদকের সহিত ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করিয়া মূর্তি কিসাবে তাঁহার হস্তগত হয় তাহা ব্যাখ্যা করিবেন, বোস্টন মিউজিয়ম কর্তৃপক্ষ গত ২২শে মে ১৯৭৪ তারিখে পরিষৎ-সম্পাদককে লিখিয়াছেন। উক্ত বিক্রেতা অষ্টাবিধ পরিষৎ-সম্পাদকের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। আমরা অধীর আগ্রহে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছি।

অপহৃত দ্বিতীয় মূর্তিটির পুনরাগমনে পরিষদ-মন্দির শ্রীমণ্ডিত হইবে, পরিষদের বিরাজীতম বর্ষের প্রারম্ভে ইহাই আমাদের সমবেত প্রার্থনা ও কামনা।

পরিশেষে, পরিষদের সদস্যগণকে আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, ২২শে জুলাই, ১৯৭৪ মাননীয় রাজ্যপাল রাজ্যভবনে পরিষৎ-সভাপতি ও পরিষৎ-সম্পাদকের সহিত আলোচনাকালে পরিষদের চিত্রশালা, পুথিশালা, গ্রন্থশালা প্রভৃতির উন্নয়ন সম্বন্ধে কৌতুহল ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতি তাঁহার এই শ্রীতি ও আনুকূল্য পরিষদের উন্নয়নের বিশেষ সহায়ক হইবে।

৮ই শ্রাবণ, ১৩৮১।

২৫শে জুলাই, ১৯৭৪।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের
কার্যনির্বাহক-সমিতির পক্ষে
শ্রীমদনমোহন কুমার
সম্পাদক ॥

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইতিহাস

প্রথম পর্ব

THE BENGAL ACADEMY OF LITERATURE

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

[১৩০০-১৩০১ বঙ্গাব্দ ॥ ১৮৯৩-১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ]

শ্রীমদনমোহন কুমার প্রণীত ।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সৃষ্টির গোড়ার কথা, ১৮৭২ খ্রীঃ হইতে ১৮৯৩ খ্রীঃ পর্যন্ত পরিষৎ প্রতিষ্ঠার চিন্তা, কল্পনা ও প্রয়াসের কাহিনী ; নবজাত পরিষদের আদর্শ ও কর্মসূচী প্রসঙ্গে জন্ বীমস, ফ্রীড্ রিশ্ মাক্স মুলার, মনিয়র-উইলিয়ম্স, উইলিয়ম উইল্‌সন হাক্টার, জর্জ বার্ডউড্ প্রমুখ ইউরোপীয় মনীষীর অমূল্য পত্রাবলী ; তাঁহাদের সহিত লিওটার্ড, বিনয়কৃষ্ণ দেব, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখের যোগাযোগ ; বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দরের সহিত সাহিত্যপরিষদের সংযোগ ; মাতৃভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস অনুসন্ধান এবং মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্যের আদর্শ উন্নয়নের জন্য পাশ্চাত্য-শিক্ষিত বঙ্গসাহিত্যপ্রেমীগণের সম্মিলিত প্রয়াস—বঙ্গসংস্কৃতির তথা ভারত-সংস্কৃতির এক বিশ্ব্বত অধ্যায়ের পুনরুদ্ধার ।

“উপযুক্ত গবেষকের গভীর অধ্যয়ন এবং অভিনিবেশের কাছে এখনও ভাগ্যক্রমে কখনও-কখনও এইরূপ মূল্যবান সামগ্রী আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে এবং তদ্বারা অনুসন্ধিসূর সন্ধানকার্যের গৌরব সূচিত করে ।

এতাবৎ সাধারণে অজ্ঞাত কতকগুলি প্রামাণিক তথ্য বর্তমান গ্রন্থের লেখক তাঁহার অক্লান্ত অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও উৎসাহে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এবং তাহার ফলে এই সমস্ত মূল্যবান দলিল আমরা প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইয়াছি ।

এই কাজে যিনি নিজেই উৎসাহে এবং আগ্রহে অবতীর্ণ হইয়া আমাদের কাছে এমন অনেক আশ্চর্য্য এবং মনোহর তথ্য আহরণ করিয়া এই পুস্তকে পরিবেষণ করিলেন, তাঁহার কাছে সমগ্র বঙ্গভাষী জাতির তথা আধুনিক ভারত-সংস্কৃতির আলোচকদের স্বেচ্ছা স্বীকার করিতেই হয় ।”

—শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার ।

শ্রীমুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ।

মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৬০ ; চারখানি দ্বিপাণ্য হাক্টোন চিহ্ন, পুরাতন দলিলপত্রের ১২ খানি আলোকচিত্র । দাম পনের টাকা ।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

ক্রেডিটপত্র

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

দ্বিংশীতিতম প্রতিষ্ঠাদিবস

৮ই শ্রাবণ ১৩৮১ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার, ২৫শে জুলাই ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দ

সভাপতির অভিভাষণ

শ্রীমুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

মান্যবর পশ্চিমবঙ্গ-রাজ্যপাল মহোদয়, সমবেত সজ্জনবৃন্দ—

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের আজিকার এই দ্বিংশীতিতম প্রতিষ্ঠাদিবসের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথম—পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল, যিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহদাতা তথা পরিষদের কর্মপ্রচেষ্টায় ঈহার সহযোগিতা স্বাভাবিক-ভাবেই অপেক্ষিত, তাঁহাকে আমরা আজ আমাদের মধ্যে পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। বাঙ্গালাদেশের এই সুদীর্ঘ ইতিহাসে, ইংরেজ আমলে অবিভক্ত বঙ্গদেশের (গৌড়-বঙ্গের) এবং অধুনাতন ভারত-রাষ্ট্রের অধীন পশ্চিমবঙ্গ-রাজ্যের ইংরেজ শাসক এবং ভারতীয় রাজ্যপাল এতগুলি হইয়া গিয়াছেন, কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে একমাত্র বাঙ্গালার ছোট-লাট লর্ড কারমাইকেল সাহেব (১৯১২-১৯১৭) ভিন্ন আর কেহই সাহিত্য পরিষদের কার্য-সম্বন্ধে আগ্রহ দেখান নাই এবং আমরাও তাঁহাদের আর কাহারও সাহচর্যের জন্য চেষ্টিত হই নাই, এবং বঙ্গসংস্কৃতির অমূল্য ঐশ্বর্য্য-সম্ভারে পূর্ণ আমাদের এই পরিষদ-মন্দিরে তাঁহাদের কাহাকেও আমরা পাই নাই। এই ব্যাপারেই আক্ষেপ করিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পুত্র রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতরচনা ও সঙ্গীতের গুণগ্রাহিতা ইংরেজ সরকারের পক্ষে দেশের ভাষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞতার কারণে দুর্য্যিগম্য বলিয়া, স্বয়ং বঙ্গভাষী দেশবাসী জনগণের প্রতিভু হইয়া রবীন্দ্রনাথের গানের যৎকিঞ্চিৎ মর্যাদা দিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন।

সুখের বিষয়, আমাদের এখনকার রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত দিয়াস্ আমাদের দেশেরই মানুষ—ইনি পশ্চিম-ভারতের গোমস্তক বা গোয়া-অঞ্চলের অধিবাসী, কোঙ্কণী ভাষা ইঁহার মাতৃভাষা, এবং এই কোঙ্কণী-ভাষা বাঙ্গালা-ভাষার সহিত ঘনিষ্ঠ-ভাবে সম্পৃক্ত। উপরন্তু, ইঁহার সহধর্মিণী বাঙ্গালা-দেশেই—বাঁকুড়ায়—ভূমিষ্ঠ হন, তাঁহার পিতা Joseph A. Vas, I. C. S. যোসেফ এ. ভাস, আই-সী-এস্ বোম্বাই-বাসী গোয়ার মানুষ, তিনি বাঁকুড়ার সুদক্ষ জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। শ্রীমতী দিয়াস্কে আমরা বঙ্গ-দুহিতা বা আমাদের ঘরের মেয়ে বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছি, আমাদের সঙ্গে আত্মীয়তা-সূত্রে ইঁহারা দুই জনেই জড়িত। বঙ্গদেশ, বঙ্গভাষা ও বঙ্গসংস্কৃতির প্রতি আন্তরিক অনুরাগের জন্য ইঁহারা পরিষদের পরম আত্মীয় ॥

পরিষদের সাম্প্রতিক ইতিহাসে আমাদের রাজ্যপালের নিকট হইতে আমরা নানা ভাবে উৎসাহ ও সাহায্য লাভ করিয়াছি। সুতরাং আজ এই অনুষ্ঠানে তাঁহার শুভাগমন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ॥

লাতীন ভাষায় একটি প্রবাদ আছে—সুদূর আফ্রিকা হইতে সব সময়েই কিছু-না-কিছু নূতন বস্তু পাইতে পারা যায়, *ex Africa semper aliquod novi*. আমাদের পরিষদের আশী বৎসর ধরিয়া এই যে প্রতিষ্ঠা-দিবস আমরা বৎসরের পর বৎসর পালন করি, তাহাতে আমাদের একটি কামনা, যাহা স্বল্প পরিমাণেও পূর্ণ হইয়া থাকে তাহা হইতেছে আমরা এই দিন পরিষদের সেবায় অর্থাৎ বঙ্গভাষা-জননীর সেবায় নূতন উপায়ন, কিছু-না-কিছু, উপস্থাপিত করিতে সমর্থ হইয়া থাকি। পরিষদের হিতৈষিগণ কেহ হস্তলিখিত প্রাচীন পুথি, বা ছুপ্রাপ্য মুদ্রিত পুস্তক, অথবা প্রাচীন কোন শিল্পদ্রব্য, বাঙ্গালার মনীষীদের কোনও স্মৃতিচিহ্ন, কোনও চিত্র, অথবা স্মরণীয় পুস্তক, এইরূপ রক্ষণযোগ্য দান পরিষদের সংগ্রহ-শালা অথবা গ্রন্থশালার জন্য আনিয়া দেন। কখনও-কখনও এরূপও হইয়া থাকে যে এই দান বা উপায়ন নূতন কোনও গবেষণামূলক গ্রন্থ, ঐতিহাসিক বা সাহিত্যিক মনস্বী নিজের জ্ঞানবিজ্ঞান আলোচনার ফলস্বরূপ পরিষদের সেবায় উপস্থিত করিয়া নিজে ধন্য হন ॥

আপনারা সকলেই জানেন, এই দুই বৎসর পরিষদের ইতিহাস এক নূতন পর্যায়ে প্রবেশ করিয়াছে। সে-সব কথাই আলোচনা এখন পরিষদের ইতিহাসের আলোচনার ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহার পুনরাবৃত্তির আবশ্যিকতা নাই। কিন্তু আমরা সকলেই জানি—পরিষৎ বিশেষ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছিল। এই দুই বৎসরের পরিচালকগণের নিষ্ঠা এবং অতদূর প্রেমের ফলে এখন পরিষদের অবস্থা কতকটা আমরা সামলাইয়া লইতে সমর্থ হইয়াছি। এই কার্যে দেশের ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির সত্যকার সুহৃদগণ অকুণ্ঠ সহায়তা করিয়াছেন, এবং আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারেরও সহায়তা পাইয়াছি। পরিষদের পরিচালনার কার্যে যেমন আমরা কতকটা বিপদ্জাল হইতে মুক্ত হইতে পারিয়াছি, তেমনই পরিষদের আধিমানসিক এবং আনুষ্ঠানিক আধ্যাত্মিক দিকেও আমাদের গতি অবরুদ্ধ হইতে আমরা দেই নাই। নানা বাধা বিপত্তি ও সঙ্কটের মধ্যেও পরিষদের গবেষণামূলক পুস্তক এবং পত্রিকা প্রকাশনার কার্যে আমরা যথাসম্ভব চালাইয়া আসিয়াছি। আমাদের পত্রিকা এখন সময়ের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতেছে। আমরা “ভারতকোষ” নামে আমাদের বাঙ্গালা-ভাষার অভিনব লঘু বিশ্বকোষ পাঁচ খণ্ডে প্রকাশ সম্পূর্ণ করিয়াছি। পরিষদের ৭৫-বৎসর-পূর্তি উপলক্ষ্যে পরিকল্পিত “স্মারকগ্রন্থ” বাহির করিয়াছি, এবং “শ্রীকৃষ্ণকীর্তন”—এর ন্যায় বাঙ্গালা সাহিত্যের অত্যন্ত মূল্যবান একখানি আকরগ্রন্থের, সাহিত্যচর্চা এবং ভাষাতত্ত্বালোচনার শ্রেষ্ঠ বিচার-পদ্ধতি ধরিয়া, সটীক নবম সংস্করণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিতে সমর্থ হইয়াছি। এই সংস্করণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মর্যাদা প্রকৃতভাবে রক্ষা করিতে পারিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। এবং যে মনীষী এই গ্রন্থ

আবিষ্কার করিয়া বাঙ্গালী জাতিকে উপহার দিয়া এবং তাহার প্রথম সম্পাদনা করিয়া জাতিকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সেই পুণ্যশ্লোক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যদল্লভের জীবনরত্ন ও কৃতিত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়া আমাদের ঋষিঋণ পরিশোধের কথঞ্চিৎ চেষ্টা করিয়াছি। উপরন্তু অনুরূপভাবে এই ঋষিঋণ-পরিশোধের আর একটি সার্থক প্রচেষ্টা পরিষদের পক্ষ হইতে হইয়াছে—আমাদের উৎসাহী সম্পাদক শ্রীমান্ মদনমোহন কুমার তাঁহার অতস্র কর্মশক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া, বাঙ্গালার এক শ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিক, ষাঁহাকে আমরা তাঁহার প্রাপ্য মর্যাদা দিতে ডুলিয়া যাইতেছিলাম সেই করুণা-নিধান বন্দোপাধ্যায়ের জীবনী ও কাব্যের আলোচনা অবলম্বন করিয়া পরিষদের পক্ষ হইতে নিজ ব্যয়ে একখানি বিরাট গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। গত বর্ষের পরিষদের লক্ষণীয় কার্যের মধ্যে এই দুইটি সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য ॥

এতদ্বিল্প আমরা বহু কবি, লেখক ও মনীষীর হস্তাক্ষর, পাণ্ডুলিপি, চিঠিপত্র ও স্মারকদ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছি। সেগুলির পরিচয় আমাদের বিভিন্ন মাসিক অধিবেশনের কার্যবিবরণীতে পাওয়া যাইবে ॥

পরিষদ্ আজ ৮২ বৎসর বয়সে উপনীত হইল। আজিকার দিনেও আমরা পরিষদের হিতৈষী বন্ধুদের নিকট হইতেও অগ্ন্যায় বৎসরের মত কিছু-কিছু উপায়ন লাভ করিয়াছি। সেগুলি আপনাদের সমক্ষে প্রদর্শিত হইতেছে ॥

উপরন্তু এই প্রতিষ্ঠা-দিবসে অত্যন্ত গৌরববোধের সহিত বঙ্গভাষী জনগণের সামনে যে তথ্যসম্পূর্ণ উপস্থাপিত করিতে পারিতেছি, সেটি হইতেছে পরিষদের স্থাপনার ইতিহাস, এবং পরিষদের কর্মাদর্শের মূল অনুপ্রেরণা কিভাবে আমরা প্রাপ্ত হইতে পারিলাম, তাহার লুপ্ত ইতিহাসের পুনরুদ্ধার-মূলক এই বইখানি—যাহা আজ আমরা প্রথম প্রকাশিত করিতেছি। বইখানি “বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইতিহাস : প্রথম পর্ব”। নানা নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার করিয়া, অভাবনীয় নূতন তথ্য সমাবেশ ইহাতে করিয়াছেন পরিষদের সম্পাদক শ্রীমান্ মদনমোহন কুমার। এই বই উল্টাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান কিভাবে ধ্বংস হইয়া যাইতেছিল—এবং সেই ধ্বংসের কারণ অবহেলা, অজ্ঞতা ও উপেক্ষা, এবং কোনও-কোনও ক্ষেত্রে আমাদের তথাকথিত গবেষক বা কর্ণধারের শর্বিলক-বৃত্তি ॥

আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, পরিষদের স্থাপনা এবং কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে আমাদের সুষ্ঠু ভাবনার জন্ম আমরা আধুনিক যুগের অর্থাৎ ইউরোপের জ্ঞানবিজ্ঞানের কাছে চিরঋণী। পরিষদ্ যাহা করিয়াছেন বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের সম্বন্ধে—বিশেষতঃ বাঙ্গালা ভাষা আলোচনার ক্ষেত্রে—তাহাতে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে প্রেরণা জোগাইয়াছেন কয়েকজন বিদেশী মনীষী, ষাঁহারা ইউরোপের পূর্ণ জ্ঞান আহরণ করিয়া ভারতবিচার চর্চার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন—জন বীম্‌স্, ফ্রীড্‌রিখ্ মাক্স ম্যুলার, স্যার উইলিয়ম্ উইলসন্ হাক্টার,

স্বল্প মনিয়র মনিয়র-উইলিয়ম্‌স্‌, স্বল্প জার্ক বার্ডউড্‌। আমাদের মাতৃভাষা চর্চার ক্ষেত্রে ইঁহাদেরই প্রবর্তিত ধারার মহত্ব সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এই তিন ঋষি—এবং ইঁহাদের উত্তরসাহক এখনকার কালের বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য লইয়া যঁহার বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে আলোচনা করিতেছেন সেই-সব আগ্রহশীল বঙ্গসন্তান ॥

শ্রীমান্‌ মদনমোহনের সম্বলিত এই পুস্তকখানি নানা নূতন তথ্যে অপরূপ হইয়াছে। এই গ্রন্থপাঠে, আমাদের বাঙ্গালীর দ্বারা তাহার মাতৃভাষার চর্চা বিজ্ঞানসম্মত-ভাবে কোন্‌ পথ ধরিয়া আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার একটা দিগ্‌দর্শন পাওয়া যাইবে ॥

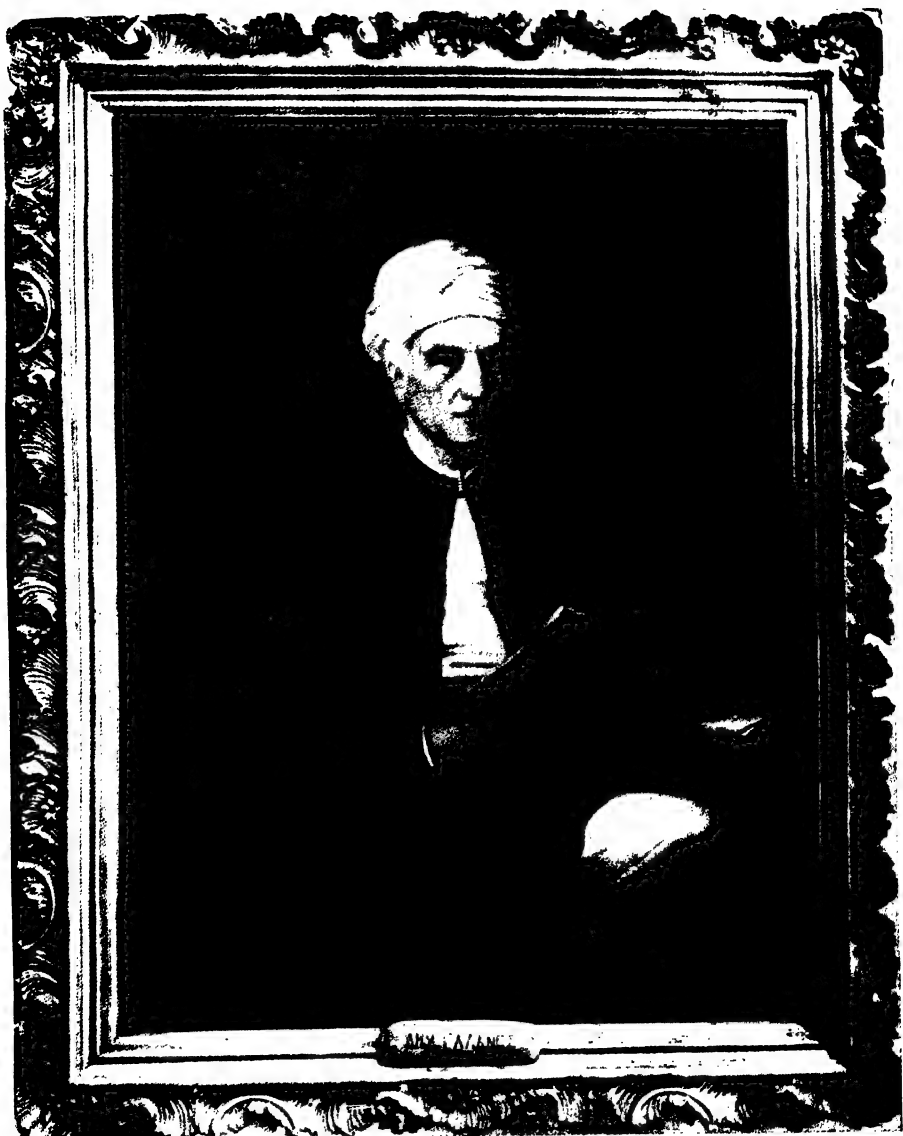
‘আস্মানং জানীহি’—আপনাকে জানো, এই আত্মজ্ঞান বাতীত কোনও উত্তম কার্য্যকর বা সফল হয় না। এই নূতন বংসরের প্রারম্ভে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বাঙ্গালী জাতিকে যে বইখানি উপহার দিলেন—“বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইতিহাস : প্রথম পর্ব”—তাহা বাঙ্গালীর আত্মজ্ঞান উদ্বোধনের সহায়তা করিবে। ইঁহাতেই আমাদের নূতন বংসরের ভবিষ্যৎ সার্থকতার আভাস পাইতেছি বলিয়া আমরা আনন্দিত ॥

আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে জানিবার শুনিবার এবং শিখিবার অনেক কিছু আছে। ইউরোপীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ যে নূতন-ভাবে সংস্কৃত-ভাষার মূল্য এবং মর্যাদা বিশ্বমানবের সমাজে প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাহা আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে এক অপূর্ব বস্তু ॥

* * * * *

সম্প্রতি আমাদের কেহ-কেহ এইরূপ একজন বিস্মৃত-প্রায় ইউরোপীয় পণ্ডিতের কথা জানিতে পারিতেছি ; এবং ইঁহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করিবার আগ্রহ লইয়া সম্প্রতি এই বংসর, ইংরেজী ১৯৭৪ সালের এপ্রিল মাসে, ইউরোপে গ্রীসের আথেনাই (আথেন্স) নগরে একটু অন্বেষণ করিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল। কিন্তু দেখিলাম, তাঁহার সম্বন্ধে নূতন করিয়া অনেক কিছু কাজ করিবার থাকিলেও, একজন আমেরিকান পণ্ডিত Catholic University of America ক্যাথলিক ইউনিভার্সিটি অফ্‌ আমেরিকার Siegfried A. Schulz সীগ্‌ফ্রীড্‌ এ. শুলৎস্‌ ইংরেজী ভাষায় দুইটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন^১, তাহাতে মুখ্য কথাগুলি প্রায় সবই বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আরও কতকগুলি কথা একটু গভীরভাবে আমাদের জ্ঞানগোচরের অপেক্ষায় রহিয়াছে। এই-সব কথার সম্বন্ধেও শুলৎস্‌ তাঁহার যুক্তি এবং অনুমানও আমাদের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই পণ্ডিত

১ শুলৎসের এই দুই প্রবন্ধ—কান্দী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত পত্রিকা—“ভারতী—Journal of the Department of Indology, Banaras Hindu University (1965-66, No. 9, pt. II)”—এবং “Journal of the American Oriental Society” (1969, pp. 339-356), এই দুই পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে।



Demetrios Galanos. দিমিত্রিঅস্ গালানস্

ভারতে আগত প্রথম গ্রীক সংস্কৃতবিৎ

জন্ম — অ্যাথেনাই, ১৭৬০

মৃত্যু — কালী, ১৮৩৩

ভারতে আগমন, ১৭৮৬; ঢাকা ও কলিকাতা, ১৭৮৬-১৭৯৩;

কালীতে সংস্কৃত-চর্চা ও গ্রীকভাষায় সংস্কৃত গ্রন্থের অল্পবাদ, ১৭৯৩-১৮৩৩

(অ্যাথেনাই বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত তৈলচিত্র হইতে Dr. Mrs. Heliki Zannas শ্রীমতী এলিকি জ্যানাস্-এর দৌত্রে)

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৮২তম প্রতিষ্ঠাবিধি প্রদর্শিত ॥



Demetrios Galanos. **দিমিত্রিঅস্ গালানস্**

অবগাপক F. P. Panagoudoulas-এর সৌজন্যে

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সাত্তম প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রদর্শিত

ব্যক্তি হইতেছেন গ্রীস-দেশ হইতে ভারতে—প্রথমে বঙ্গদেশে—আগত এক বিরাট বিদ্বান ও মনীষী। ইহার নাম ছিল Demetrios Galanos দিমিত্রিঅস্ গালানস্ (জীবৎকাল খ্রীষ্টীয় ১৭৬০—১৮৩৩)। আথেনাই (আথেন্স)-নগরীতে ইহার জন্ম, মাতৃভাষা গ্রীকের ব্যাকরণ এবং সাহিত্য খুব গভীরভাবে স্বদেশে অধ্যয়ন করেন, গ্রীক ভাষার একজন মূৰ্খণ্য পণ্ডিত হন, পরে ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৬ কি ২৭ বৎসর বয়সে তিনি ভারতবর্ষে আসেন—ভারতে উপনিবিষ্ট তাঁহার স্বদেশবাসী কতকগুলি গ্রীক বণিকের সন্তানদের গ্রীক-ভাষা পড়াইবার জন্য। ইনি প্রথম ঢাকাতে আসিয়া উপনিবিষ্ট হন। পরে কলিকাতায় আসেন এবং কলিকাতায় গ্রীক ছেলেমেয়েদের জন্য স্থাপিত ইস্কুলে গ্রীক ভাষা পড়াইতেন। ইহার এক বিশেষ মিত্র ও সহায় হন ঢাকা ও কলিকাতার Bonfield Lane-এর গ্রীক বণিক Constantinos Pandazy কন্সতান্তীনস্ পান্ডাজি। গালানস্ বাঙ্গালা-দেশেই বাঙ্গালা, ফারসী এবং হিন্দুস্থানীও শিখেন। পরে ১৭৯৩ সালে তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া কাশীতে উপস্থিত হন, এবং একাদিক্রমে চল্লিশ বৎসর কাশীতেই কাটাইয়া সেইখানেই ১৮৩৩ সালে দেহরক্ষা করেন। কাশীতে ইনি সংস্কৃত-ভাষার মোহে পড়িয়া যান, এবং সেইখানে গভীরভাবে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। তিনি ভারতীয় পণ্ডিতের মত বেশভূষা করিয়া মাথায় পাগড়ী পরিয়া থাকিতেন। ইংরেজেরা ইহার পাণ্ডিত্যের কথা জানিয়াও ইহাকে তেমন আমল দেয় নাই। তবে ইহার সংস্কৃত জ্ঞান, স্যন্স উইলিয়ম্ জোন্স-প্রমুখ পশ্চিম-ইউরোপের ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান ও ইতালীয় পণ্ডিতদের মত আধুনিক বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিক পদ্ধতির ছিল না। ইনি মধ্যযুগের গ্রীকান Byzantine বিজ্ঞানীয় মনোভাবেরই মানুষ ছিলেন, তবে বিজ্ঞান-বিষয়ে আগ্রহশীল ছিলেন। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ভগবদ্গীতার একটি অনুবাদ প্রাচীন গ্রীক ভাষায় করেন। ভারতীয় দর্শনের গভীর বিষয়ে ইহার আগ্রহ তেমন গভীর হয় নাই। বৈদিক সাহিত্য—সংহিতা, ব্রাহ্মণ, উপনিষদের সঙ্গে ইহার পরিচয় ছিল না, এবং তখনও ইউরোপীয়দের মধ্যে দুই একজন ছাড়া আর কেহ বৈদিক সাহিত্যের খবর পান নাই। কিন্তু ভারতীয় নীতিশাস্ত্র এবং ভারতীয় ইতিহাস পুরাণ বিষয়ক কতকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ ইনি গ্রীক-ভাষায় অনুবাদ করেন। এই-সমস্ত অনুবাদ তিনি করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের দেশের প্রাচীন ধারা-মত, প্রাচীন-গ্রীক-ভাষাতেই—আধুনিক গ্রীক-ভাষায় নহে। জার্মান পণ্ডিতেরা ইহার চাণক্যের অনুবাদের ভুলসী প্রশংসা করেন, এবং ইহারই মাধ্যমে নীতিশাস্ত্রবিদ চাণক্যের সহিত ইউরোপের প্রথম পরিচয় হয়। তাঁহার অনূদিত হস্তলিখিত গ্রীক পুস্তক এবং কিছু-কিছু সংস্কৃত পুঁথিও তিনি স্বদেশে আথেনাই-নগরীর নবপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করিয়া যান। আথেনাই-রের জাতীয় গ্রন্থশালায় হস্তলিখিত গ্রন্থগুলির মধ্যে ইহার অনূদিত ও উপহৃত হস্তলিখিত পুস্তকগুলি ২০ খণ্ডে এখনও সযত্নে রক্ষিত হইয়া আছে, এবং এগুলির মধ্যে অনেকগুলি ইতিমধ্যে আথেনাই-রের মুদ্রক ও প্রকাশক G. Typaldos তিপালদস্-এর যত্নে ও অর্থব্যয়ে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু স্বদেশে বিদেশে

এগুলির এখনও তেমন আলোচনা হয় নাই। গালানস্ ভারতবর্ষে বাবসায়ের সূত্রে কিছু অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন এবং তিনি প্রায় আশী হাজার মোহর রিক্ত হিসাবে রাখিয়া যান। ইহার অর্ধেক তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র Pandoleon বা Pantaleon পান্তালেওনকে দান করেন, এবং বাকি অর্থ নবস্থাপিত আথেনাই-বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করিয়া যান। এই অর্থে আথেনাই-বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহাদি নির্মাণকার্যে সহায়তা হয়। আথেনাই-বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহার তৈলচিত্র রক্ষিত হইয়াছে।

গালানস্ ছিলেন মধ্যযুগের মনোভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত ধর্মবিশ্বাসী পণ্ডিত—তাঁহার মানসিক বাতাবরণ ছিল আমাদের দেশের প্রাচীনপন্থী সংস্কৃতজ্ঞ জ্ঞানী বা বিদ্বান পণ্ডিতেরই মত। আমাদের দেশের খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের কোনও মহাপণ্ডিত যদি মাত্র সংস্কৃত-বিদ্যার আবেষ্টনীর মধ্যে মানুষ হইয়া ইউরোপীয় বিদ্যার—লাতীন, গ্রীক, ইংরেজী প্রভৃতি ভাষা ও সাহিত্যের—আলোচনায় অবতীর্ণ হইয়া কেবল যদি সংস্কৃত বিদ্যারই জ্ঞান লইয়া সেগুলির বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে যেমনটি হইত, গ্রীক পণ্ডিত গালানসের সংস্কৃত-চর্চাও অনেকটা সেই প্রকারের অনুরূপ বস্তু হইয়াছিল। কিন্তু একটি বড় কথা এখানে আছে। গালানস্ কতকগুলি গ্রীক ধর্মীয় বিদ্যালয়ে—আমাদের দেশের সংস্কৃত টোলের মত বিদ্যালয়ে—তাঁহার মানসিক শিক্ষা পাইয়াছিলেন। গ্রীক Hellenio হেল্লেনিক বা প্রাচীন গ্রীক যুগে ভারতবর্ষের সঙ্গে গ্রীসের সাক্ষাৎ সম্পর্কের প্রথম সূত্রপাত হয়। সোক্রেতেসের সঙ্গে আথেনাইতে একজন ভারতীয় বিদ্বানের আলাপ হইয়াছিল, গ্রীক গ্রন্থে তাহার উল্লেখ আছে। সম্রাট্ আলেক্সান্দরের ভারত আক্রমণের পরে এই সংযোগ আরও ঘনিষ্ঠ হয়, এবং ভারত হইতে গ্রীসে এবং গ্রীস হইতে ভারতে পণ্ডিতজনের গমনাগমন হইত। ইহার কয়েক শতক পূর্বেই পিথাগোরাসের মত গ্রীক দার্শনিক ভারতে আসিয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষের প্রভাব, আধ্যাত্মিক চিন্তা, পুনর্জন্মবাদ, আমিশবর্জন প্রভৃতি বিষয়ে গ্রীসের দার্শনিক চিন্তার উপরেও পড়িয়াছিল। অতি ক্ষীণ ধারায় এই প্রভাব গ্রীসে যাইতে থাকে। Neo-Platonist বা নব্য-প্লাতোনিক মতবাদের দার্শনিকেরা ভারতবর্ষের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হন এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ-কেহ ভারতবর্ষেও আসিয়াছিলেন। এদিকে গ্রীসে প্রাচীন গ্রীক ধর্মের অবসান ঘটিল, এবং তাহার স্থানে ভক্তিমূলক খ্রীষ্টান ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইল। এই নবপ্রতিষ্ঠিত খ্রীষ্টান ধর্মের উপর ভারতের ধর্মচিন্তার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাবও আসিল—Essenes, Therapeutai এসেসেনি, থেরাপিউটাই প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সাধকগণের মতবাদ এবং তাঁহাদের জীবনচর্যা, বিশেষ করিয়া তাঁহাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত কচ্ছসাধন ও যোগানুষ্ঠান, এগুলি ধীরে-ধীরে প্রথম যুগের গ্রীক খ্রীষ্টানগণের বিশ্বাস ও আচারের মধ্যে একটা স্থান করিয়া লয়। খ্রীষ্টীয় ১২৯৬ হইতে ১৩৬০ পর্য্যন্ত ইহার জীবৎকাল ছিল, সেই বিখ্যাত এক গ্রীক খ্রীষ্টানধর্মনেতা Gregorios Palamos গ্রেগোরিওস্ পালামস্ একপ্রকারের খ্রীষ্টান ‘যোগ’ অভ্যাস

করিতেন ও শিক্ষা দিতেন। এই খ্রীষ্টান যোগের ধারণা ও অনুষ্ঠানপদ্ধতি অদ্ভুতভাবে ভারতের পতঞ্জলির যোগশাস্ত্রের শিক্ষার সঙ্গে মেলে। ইহাতে প্রবক, কুন্তক ও রেচকের সহিত প্রাণায়ামের, এবং নির্জন স্থানে যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া নাভি-মূলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ধ্যান-দ্বারা ব্রহ্মজ্যোতি দর্শনের প্রয়াসের মুখ্য স্থান ছিল। তন্মিষ্ট, এই যোগের মতে পরব্রহ্মের সাকার ও নিরাকার উভয়বিধ রূপও কল্পিত ছিল। শুদ্ধ জ্ঞানযোগ অপেক্ষা ভক্তিযোগ ও যোগচর্যা, আসন ধ্যান ধারণা প্রভৃতির স্থান ইহাতে প্রধান ছিল ॥

এই মতের যোগীদিগের তখনকার যুগের গ্রীক ভাষায় বলিত Hesychastes ‘হেসিখাস্তিস্’, ইংরেজীতে Hesychast (‘হেসিকাস্ট’) ; শব্দটির মৌলিক অর্থ হইতেছে ‘চুপ করিয়া থাকা, তুষ্টী অবলম্বন করা, শান্তভাবে অবস্থান করা, মৌনী হওয়া’। সুতরাং ‘হেসিখাস্তিস্’ শব্দকে আমাদের ‘মুনি’ শব্দের প্রতিশব্দ বলিয়া গ্রহণ করা যায়। হেসিখাস্ত মতের বিশেষভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেন খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকের যাজক ও পণ্ডিত এই গ্রেগোরিওস্ পালামস্। কিন্তু এই মতের প্রতিবাদ করিয়া উহার বিরুদ্ধে লেখেন আর একজন গ্রীক খ্রীষ্টান পণ্ডিত, তিনি ছিলেন Calabria কালাব্রিয়ার (দক্ষিণ ইতালীর) অধিবাসী Barlaam বারলাম (খ্রীঃ ১৪শ শতক) নামে একজন খ্রীষ্টান গ্রীক সাধু। কিন্তু এই মতবাদ ইহাদের এই আপত্তি বা সমালোচনায় ধ্বংস হয় নাই। ইহা ধীরে ধীরে প্রসারলাভ করিতে থাকে এবং এই মতের পরিপোষকগণের দ্বারা ইহার প্রচারও হইতে থাকে ॥

গালানস্, যে-সকল গ্রীক খ্রীষ্টান বিদ্যাকেন্দ্রে শিক্ষালাভ করেন এবং যেখানে তাঁহার গ্রীকভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান সম্পূর্ণ করেন, তাহার মধ্যে Misolonghi মিসোলংগী নগরের গ্রীক খ্রীষ্টান বিদ্যাকেন্দ্রে Panagiotis Palamiris বা Palamos পানায়োতিস্ পালামস্ নামে গ্রীক ব্যাকরণ বিষয়ে ও অন্য শাস্ত্রে এক অতি বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন, গালানস্ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই পণ্ডিত গ্রীক যোগী হেসিখাস্তিস্ সম্প্রদায়ের মতের একজন পরিপোষক ছিলেন, এবং তৎসম্বন্ধে পুস্তকাদিও রচনা করেন। গালানস্ মিসোলংগীতে চার বৎসর ধরিয়া পানায়োতিস্ পালামস্-এর শিষ্য ছিলেন। এরূপ অনুমান শ্রীযুক্ত গুলৎসের মতে অর্থোডক্সিক হইবে না যে গ্রীসে ইতিপূর্বে ভারত হইতে আগত এই ধার্মিক যোগসাধন সম্বন্ধে এইভাবে সন্ধান পাইয়া, ইহার সম্বন্ধে আরও জানিবার আগ্রহ গালানসের হইয়াছিল এবং তজ্জন্য ভারতবর্ষেই ইহার যে উৎস বিद्यমান, প্রাচীন গ্রীক পুস্তক পাঠে তাঁহার সেই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল। এই জন্যই তাঁহার কাশীতে আগমন ও অবস্থান, সংস্কৃতচর্চা, এবং তাঁহার ভ্রাতৃপুত্রকে ভারতবর্ষে আনা ইয়া গ্রীক ভাষার আরও অধিক জ্ঞান অর্জন করিয়া এই-সবের চর্চায় তাঁহার—গালানসের নিজের—সহায়ক করিবার আগ্রহ সম্ভবতঃ ছিল, এবং গালানস্ কাশী হইতে নিজে স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার সম্বন্ধে কোন উৎসাহ আর দেখান নাই ॥

হেসিথাস্টিস্ বা বিজ্ঞানীয় খ্রীষ্টান যোগী মতবাদের সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত গালানসের কথা আরও জানিতে পারিলে, আধ্যাত্মিক চিন্তার ভারত ও গ্রীসের সহযোগিতার কথা আমাদের কাছে আরও পরিস্ফুট হইতে পারে। এ বিষয়ে আমরা নূতন তথ্য পাইব কি না জানি না। কিন্তু যেটুকু জানিতেছি তাহাতে আমাদের আগ্রহ আরও বাড়িতেছে, এবং বিপুল সম্ভাবনার আভাস আমরা পাইতেছি ॥

গালানসের অনূদিত গ্রন্থাবলী এখন ভাল করিয়া আলোচনা করিবার সময় হইয়াছে ॥ এই কার্যে আধুনিক গ্রীসের এবং ভারতের উভয় দেশের পণ্ডিতের সাহচর্য আবশ্যক হইবে। গালানস্ বাঙ্গালা-দেশে এবং কাশীতে ছিলেন, তাঁহার ভারত-প্রবাসের সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর তিনি এই দুই স্থানেই অতিবাহিত করেন। উপস্থিত ক্ষেত্রে অধিক আলোচনা এখন নিম্প্রয়োজন। গালানসের ব্যক্তিত্বকে অবলম্বন করিয়া এইভাবে আর একজন ইউরোপীয় মনীষীর সঙ্গে, ঢাকায়, কলিকাতায় এবং কাশীতে, বাঙ্গালার মানুষের একটু বিশেষ ঘনিষ্ঠ সংযোগের সূত্রপাত হইয়াছিল—যে যুগে স্যর চার্লস্ উইলকিন্স, নাথানিয়েল ব্রাসি হাল্‌হেড্, স্যর উইলিয়ম জোন্স, উইলিয়ম বোন্টস্, হেনরি পিটস্ ফরস্টার, হেনরি টমাস্ কোলক্লক্ প্রমুখ কতকগুলি ইউরোপীয় সংস্কৃতজ্ঞ বাঙ্গালাদেশে দেখা দেন এবং ইঁহারা ভারতের সঙ্গে বাহিরের আধ্যাত্মগতের মৌলিক সংযোগ আবিষ্কার করেন। বাঙ্গালার, ভারতের এবং ইউরোপের ইতিহাস ও সংস্কৃতির এক নব পর্য্যায় এইভাবে আমাদের কাছে প্রতিভাত হয় ॥

এই শুভ দিনে, আমাদের একজন বিস্মৃত ভারতবিজ্ঞানবিদ, ঐহার মাতৃভাষা ছিল গ্রীক এবং যিনি গ্রীসদেশের তাঁহার পূর্বজ-গণের মত ভারতের সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং সেগুলির চর্চায় দীর্ঘ অর্ধশতাব্দীকাল ধরিয়া বঙ্গদেশে—ঢাকায়, কলিকাতায় — ও বারাণসীতে আত্মনিয়োজিত হইয়াছিলেন, সেই পুণ্যলোক দিমিত্রিঅস্ গালানসের সম্বন্ধে এই পুণ্যপ্রসঙ্গের অবতারণা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিরাজীতম প্রতিষ্ঠাদিবসে সমীচীন বলিয়া মনে করি। আশা করি যথাকালে বাঙ্গালী ও অন্য ভারতীয়গণের কাছে দিমিত্রিঅস্ গালানসের পূর্ণ পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর হইবে ॥

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এই বিরাজী বৎসরের প্রতিষ্ঠাদিবসে আপনাদের সকলকে আমি পরিষদের পক্ষ হইতে আপনাদের সহানুভূতি ও সাহচর্যের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আশা করি যে কাজ আমরা করিবার চেষ্টা করিতেছি তাহার মূল্য সহৃদয়তার সহিত আপনারাও উপলব্ধি করিবেন। আর একটি গুরুভার কার্যে আমরা অবতীর্ণ হইয়াছি, তাহাতেও আপনাদের নিকট হইতে সম্পূর্ণ এবং বহুবর্ধব্যাপী সহায়তা আমরা চাই—সেটি হইতেছে, এই একাধী বৎসর ধরিয়া যে আকাজ্ঞা সাহিত্য পরিষদ মনে-মনে

পোষণ করিয়া আসিতেছে—বাংলা ভাষার একখানি সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে রচিত এবং ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা এবং সাহিত্যিক প্রয়োগের দ্বারা অলঙ্কৃত অভিধান—যে অভিধানকে প্রাচীন, মধ্যযুগীয় এবং আধুনিক বাংলা ভাষার তথা সমগ্র বঙ্গভাষী প্রদেশের প্রান্তিক ও সাম্প্রদায়িক সর্বপ্রকারের লোকভাষার সংগ্রহরূপে আমরা স্থাপন করিয়া যাইতে পারিব—তাহার উপাদান সঙ্কলনে, প্রণয়নে ও প্রকাশে আপনাদের সকলের কার্যকরী সহযোগিতা। বঙ্গবাণীর পূজার উপায়ন সংগ্রহে আপনাদের সকলের সহযোগিতা আমরা কামনা ও প্রার্থনা করি ॥

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

একাংশীতম বার্ষিক কার্য-বিবরণ

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৮১তম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে সশ্রদ্ধ ও সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া বার্ষিক কার্য-বিবরণ উপস্থাপিত করিতেছি।

আলোচ্য বর্ষের মধ্যে যে-সকল সাহিত্যসেবী ও দেশের কৃতী সন্তান পরলোক গমন করিয়াছেন সর্বাগ্রে তাঁহাদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

বিজ্ঞানাচার্য্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য ও পরিষদের বিজ্ঞানশাখার পূর্ব-তন সভাপতি ছিলেন। তাঁহার পরলোক গমনে পরিষদ স্বজন-বিস্মোগের বেদনা ও অভিভাবক-বিস্মোগের ক্ষতি অনুভব করিতেছে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রাক্তন সম্পাদক পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পরলোক গমনে পরিষৎ মর্মান্বিত।

ঐতিহাসিক তারারচাঁদ, অধ্যাপক মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য, স্বামী প্রত্যাগান্ধানন্দ (অধ্যাপক প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়), রতনমণি চট্টোপাধ্যায়, শঙ্করনাথ (প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য), নেলী সেনগুপ্তা, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের শ্রীমা, প্রতিভা মুখোপাধ্যায়, শিল্প-সমালোচক অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, অধ্যাপক প্রফুল্লকুমার গুহ, অনাদিকুমার ঘোষ দস্তিদার, কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক সত্যীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সৈয়দ মুজতবা আলী, নগেন্দ্রকুমার গুহ রায়, মুজাফ্ফর আহমেদ, পাহাড়ী সান্যাল (নগেন্দ্রনাথ সান্যাল), পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, ননীমাধব চৌধুরী আলোচ্য বর্ষে পরলোকগমন করিয়াছেন।

তাঁহাদের সকলের পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি ॥

পৃষ্ঠপোষক

অত্যন্ত আনন্দ ও সুখের বিষয় যে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত আর্চবি লাজলট্ দিয়াস্ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পৃষ্ঠপোষক পদ অলঙ্কৃত করিতে সম্মত হইয়াছেন। বঙ্গভূমি, বঙ্গভাষা ও বঙ্গ-সংস্কৃতির প্রতি শ্রীযুক্ত দিয়াস্ ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর অনুরাগ সুদীর্ঘ দিনের। শ্রীমতী দিয়াস্ বঙ্গভূমিতেই ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন ও বালা-কৈশোর অতিবাহিত করিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহিত তাঁহাদের আত্মীয়তার যোগ গভীর হওয়ায় আমরা বিশেষ আনন্দিত ও উৎসাহিত হইয়াছি ॥

আর্থিক অবস্থা ও আর্থিক সহায়তা

গত বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে পরিষদের আর্থিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট হইতে কর্মচারী নিয়োগ ধাতে

১১,৩০০ টাকা, পুস্তক প্রকাশ খাতে ১,২০০ টাকা, পত্রিকা প্রকাশ খাতে ২,০০০ টাকা, পৌনঃপুনিক অনুদান ১১,০০০ টাকা, গচ্ছিত তহবিলের দেনাশোধ খাতে ২৫,০০০ টাকা পাওয়া গিয়াছে। রাজা রামমোহন লাইব্রেরি ফাউন্ডেশন কমিটি এ বৎসর পুরাতন পুস্তক বাধাইবার জন্য ৯,৭৫০ টাকা পরিষদকে দান করিয়াছেন। এজন্য পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, শিক্ষা মহাধ্যক্ষ ও শিক্ষা-সচিব এবং অর্থ-সচিবকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিষদ ১৩৭৯ বঙ্গাব্দে নিজের চেকফায় সংগৃহীত ৯৫০ টাকা গচ্ছিত তহবিলের ঋণ পরিশোধ করিয়াছিল, ১৩৮০ বঙ্গাব্দে পরিষদ নিজের চেকফায় সংগৃহীত ৩,২৫০ টাকা গচ্ছিত তহবিলের ঋণ শোধ করিয়াছে। বঙ্গসাহিত্যানুরাগীদের সহায়তা এবং পরিষদের আয়রক্ষি ও মিতব্যয়িতা দ্বারা গচ্ছিত তহবিলগুলি আমরা কয়েক বৎসরের মধ্যে পূরণ করিতে পারিব আশা করি ॥

গৃহ সংস্কার

পরিষদের গ্রন্থাগার, পাঠকক্ষ, গবেষণাকক্ষ ও পুষ্টিশালার জন্য বর্তমান পরিষদ-ভবনের উপর তৃতীয় তল নির্মাণের বিশেষ প্রয়োজন। পরিষদের প্রাচীন পুথি, পট ও চিত্র, দুর্লভ জীর্ণ গ্রন্থ এবং মনীষীদের চিঠিপত্র ও পাণ্ডুলিপিগুলি স্বাভাবিক ক্ষয় হইতে রক্ষার জন্য ত্রিতলে অন্ততঃ একখানি বাতানুকূল (এয়ার কন্ডিশন) কক্ষ নির্মাণ করা প্রয়োজন। পরিষদ-ভবন ও রমেশ-ভবনের সংস্কারে প্রয়োজনীয় উপকরণ, শ্রম ও অর্থদানের জন্য পরিষদের সভাপতি শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সহকারী সভাপতি শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার ও পরিষৎ সম্পাদক বঙ্গসাহিত্যানুরাগী দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণের নিকট সংবাদপত্র ও বেতার মাধ্যমে আবেদন করেন। সুখের বিষয়, বঙ্গবাসী ও বঙ্গভাষী বহু ব্যক্তির নিকট হইতে এই আবেদনে সাড়া পাওয়া গিয়াছে। ১৩৮০ বঙ্গাব্দে বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে মোট ৩,৫৩৮-২৩ টাকা গৃহসংস্কার কার্যের জন্য টাকা পাওয়া গিয়াছে। ইহারা এই বিষয়ে পরিষদকে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের প্রত্যেককেই সাধুবাদ জানাই ॥

স্মৃতি-পুরস্কার

গত বৎসর হইতে ‘হেমচন্দ্র স্মৃতি-পুরস্কার’, ‘অক্ষয়কুমার বড়াল স্মৃতি-পুরস্কার’, ‘স্বর্ণকুমারী দেবী স্মৃতি-পুরস্কার’ ও ‘সীলা দেবী স্মৃতি-পুরস্কার’ পুনঃপ্রবর্তন করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে গত ৮১তম প্রতিষ্ঠা-দিবস উৎসবে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে তাঁহাদের সর্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য উক্ত পুরস্কারগুলি পরিষৎ সভাপতি শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রদান করেন।

১। হেমচন্দ্র স্মৃতি-পুরস্কার ॥

বিষয় : হেমচন্দ্রের কবিতায় সমকালীন বাঙালী সমাজ।

লেখক : শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

২। অক্ষয়কুমার বড়াল স্মৃতি-পুরস্কার ॥

বিষয় : বাংলাকাব্যে অক্ষয়কুমার বড়াল।

লেখক : শ্রীসুমঙ্গল চট্টোপাধ্যায়।

৩। স্বর্ণকুমারী দেবী স্মৃতি-পুরস্কার ॥

বিষয় : বাংলা কাব্যসাহিত্যে নিকুপমা দেবী।

লেখিকা : শ্রীমতী প্রতিভা মুখোপাধ্যায়।

৪। লীলা দেবী স্মৃতি-পুরস্কার ॥

বিষয় : কবি কামিনী রায়।

লেখিকা : শ্রীমতী মীরা চট্টোপাধ্যায় ॥

কার্যনির্বাহক-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের যাবতীয় কার্য সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য কার্যনির্বাহক সমিতির ৮ টি অধিবেশন হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষের কর্মাদক্ষ ও কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্যগণের নাম পরিশিষ্ট ‘ক’-এ প্রদত্ত হইল ॥

মাসিক অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত মাসিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় :

১ম মাসিক অধিবেশন : ৬ই আশ্বিন ১৩৮০, রবিবার।

২য় মাসিক অধিবেশন : ৮ই অগ্রহায়ণ ১৩৮০, শনিবার।

৩য় মাসিক অধিবেশন : ৫ই মাঘ ১৩৮০, শনিবার।

৪র্থ মাসিক অধিবেশন : ২৯শে চৈত্র ১৩৮০, শুক্রবার ॥

সদস্য

বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্যগণের বিবরণ পরিশিষ্ট ‘খ’-এ প্রদত্ত হইল ॥

ভারতকোষ

বিগত ৮১-তম প্রতিষ্ঠা দিবসে (৮ই শ্রাবণ ১৩৮০, ২৪শে জুলাই ১৯৭৩) ভারতকোষের ৫ম খণ্ড প্রকাশিত হয়। ভারতকোষে যে সকল প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ স্থানাভাবে মুদ্রিত নাই, সেই প্রসঙ্গগুলি লইয়া একখানি পরিপূরক খণ্ড প্রকাশ করিবার জন্য পরিষৎ চেষ্টা করিতেছেন। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। পঞ্চম খণ্ড প্রকাশে সহায়তার জন্য পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক শ্রীমুভ্যাজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-কমিশনার ও শিক্ষাসচিব শ্রীদিলীপকুমার গুহ ও শিক্ষাঅধিকর্তা অধ্যাপক ঐথরঞ্জন করকে সাধুবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল

শ্রীযুক্ত আর্কটনি লাললট্ দিয়াস্ ৫ম খণ্ড প্রকাশের জন্য পরিষদের প্রতি বিশেষ আনুকূল্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার আগ্রহে ও অনুগ্রহে ১৩৭৮ বঙ্গাব্দে ভারতকোষের পঞ্চম খণ্ডের জন্য বিশেষ অনুদান লাভ সম্ভব হওয়ায় ভারতকোষ সম্পূর্ণ করা সম্ভব হইয়াছে, ইহা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করি ॥

সভাসমিতি

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সভাসমিতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে :

১। ৮১-তম প্রতিষ্ঠা উৎসব : ৮ই শ্রাবণ ১৩৮০

সভাপতি : শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

মঞ্চলাচরণ : শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

বক্তা : শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীসুকুমার সেন, শ্রীমদনমোহন কুমার ।

২। অনীতিতম বার্ষিক অধিবেশন : ৮ই শ্রাবণ ১৩৮০

সভাপতি : শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বক্তা : শ্রীমদনমোহন কুমার

৩। কবি অতুলপ্রসাদ সেনের চিত্রপ্রতিষ্ঠা উৎসব : ৮ই অগ্রহায়ণ ১৩৮০

সভাপতি : শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বক্তা : শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল), শ্রীরাজেশ্বর মিত্র, শ্রীমদনমোহন কুমার ।

সঙ্গীত : লোকরঞ্জন শাখা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ।

৪। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সার্থশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রদর্শনী : ১লা মাঘ ১৩৮০

উদ্বোধক : শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বক্তা : শ্রীমদনমোহন কুমার

৫। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সার্থশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সভা : ৫ই মাঘ ১৩৮০

সভাপতি : শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রবন্ধ পাঠ : শ্রীসুকুমার সেন। বিষয় : 'ভাষা ও সাহিত্যে রাজেন্দ্রলালের দান'।

বক্তা : শ্রীবি. মুখোপাধ্যায় (সভাপতি এসিয়াটিক সোসাইটি), শ্রীশিশিরকুমার মিত্র, শ্রীদিলীপকুমার মিত্র, শ্রীমদনমোহন কুমার ।

৬। বিজ্ঞানাচার্য্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর পরলোকগমনে স্মৃতিতর্পণ ও প্রদ্বাঙ্কলি :

৫ই ফাল্গুন ১৩৮০

সভাপতি : শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বক্তা : শ্রীপরিমল ঘোষ, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল ভাট্‌ড়ি, শ্রীমহাদেব দত্ত, শ্রীমৃণাল-
কুমার দাসগুপ্ত, শ্রীজয়ন্ত বসু, শ্রীসমরেন্দ্রনাথ ঘোষাল, শ্রীরমেশচন্দ্র
ঘোষ, শ্রীমদনমোহন কুমার

- ৭। বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যদ্বন্দ্বভের চিত্রপ্রতিষ্ঠা, বসন্তরঞ্জনের বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধের
পাণ্ডুলিপি, চিঠিপত্র, বাবস্থত দ্রব্যাদি ও সংগৃহীত পুঁথি ইত্যাদির প্রদর্শনী :

১২ শে ফাল্গুন ১৩৮০

সভাপতি : শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বেদগান : কুমারী শুল্লা কুমার, কুমারী স্বপ্না মণ্ডল, কুমারী শুভ্রা চক্রবর্তী ও
কুমারী দীপ্তি বিশ্বাস

(প্রেসিডেন্সি কলেজ ও সংস্কৃত কলেজের ছাত্রীসদ)

বক্তা : শ্রীসুকুমার সেন, শ্রীমদনমোহন কুমার

- ৮। রমাপ্রসাদ চন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী, চিত্রপ্রতিষ্ঠা, রচিত গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও চিঠিপত্রের
প্রদর্শনী : ১২শে ফাল্গুন ১৩৮০

সভাপতি : শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রবন্ধ পাঠ : শ্রীদীনেশ চন্দ্র সরকার। বিষয় : (১) 'প্রত্নতাত্ত্বিক রমাপ্রসাদ
চন্দ্র', (২) 'পালবংশীয় রাজগণের ধর্মমত'।

শ্রীঅদ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বিষয় : 'রমাপ্রসাদ চন্দ্র'।

বক্তা : শ্রীমদনমোহন কুমার। বিষয় : 'বসন্তরঞ্জন ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'

- ৯। ফেডারেল রিপাব্লিক অফ জার্মানীর কনসাল জেনারেল মাননীয় হান্স
ফের্ডিনান্দ লিন্সের-কর্তৃক প্রাচীন বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুঁথির মাইক্রোফিল্ম প্রদান
উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান : ১২ই চৈত্র, ১৩৮০

সভাপতি : শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)

বক্তা : হান্স ফের্ডিনান্দ লিন্সের, শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, শ্রীমদনমোহন কুমার

- ১০। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী ও হেমলতা ঠাকুরের জন্মশতবার্ষিকী-উৎসব : ২৯শে
চৈত্র, ১৩৮০

সভাপতি : শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস

বক্তা : শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী চিত্রিতা দেবী, শ্রীসমরেন্দ্রনাথ
সিংহরায়, শ্রীমদনমোহন কুমার

- ১১। মাইকেল মধুসূদন দত্তের সার্থশত জন্মবার্ষিকী উৎসব : ৩০শে চৈত্র, ১৩৮০

সভাপতি : শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)

প্রবন্ধপাঠ : শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বক্তা : শ্রীমদনমোহন কুমার

কবিতাপাঠ : শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য, শ্রীরণেশচন্দ্র পোদ্দার

১২। কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস, কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ও কবি মোহিতলাল মজুমদারের চিত্রপ্রতিষ্ঠা ও রচিত গ্রন্থ, অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি ও চিঠিপত্রাদির প্রদর্শনী : ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮১

সভাপতি : শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বক্তা : শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল), শ্রীজীবনকৃষ্ণ শেঠ, শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীমদনমোহন কুমার

কবিতাপাঠ : শ্রীসুধীরকুমার বসু, শ্রীমন্টুকুমার মিত্র কর্তৃক কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের কবিতা ॥

পুস্তক মুদ্রণ

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির নূতন সংস্করণ অথবা পুনর্মুদ্রণ হইয়াছে :

১। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (৯ম সংস্করণ)—শ্রীমদনমোহন কুমার স

২। রামমোহন গ্রন্থাবলী ২য় খণ্ড

৩। সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার অন্তর্ভুক্ত :

৯ সংখ্যক গ্রন্থ রামচন্দ্র বিজ্ঞাবাগীশ, হরিশ্চরানন্দ তীর্থস্বামী

১৩ ” ” জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, মদনমোহন তর্কালঙ্কার

২৩ ” ” মধুসূদন দত্ত

২৭ ” ” নীলমণি বসাক, হরচন্দ্র ঘোষ

৩৮ ” ” যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু

৪৯ ” ” রাজনারায়ণ বসু

৯৭ ” ” কেশবচন্দ্র সেন।

এই গ্রন্থগুলি দীর্ঘদিন অমুদ্রিত থাকায় ‘সাহিত্যসাধকচরিতমালা’ খণ্ডিত ছিল।

এগুলি পুনঃপ্রকাশিত হওয়ায় গবেষকগণ সাহিত্যসাধকচরিতমালা সম্পূর্ণ সেট পাইবেন।

৪ কপালকুণ্ডলা—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৫ বিবিধ প্রবন্ধ—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৬ লীলাবতী—দীনবন্ধু মিত্র

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে পরিষৎ-সংস্করণ রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধুর সমগ্র রচনাবলী দীর্ঘদিন মুদ্রিত ছিল না। বর্তমান বর্ষে সেগুলির সম্পূর্ণ সেট পুনরায় পরিষৎ বঙ্গসাহিত্যানুরাগী পাঠকগণের হস্তে তুলিয়া দিতে পারিয়াছেন।

নিম্নলিখিত পুস্তক নূতন প্রকাশিত হইয়াছে :

- ১। স্মারক-গ্রন্থ (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৭৫-বর্ষ-পূর্তি উপলক্ষ্যে উৎসবে পঠিত এবং ৭৫ বৎসরের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা হইতে নির্বাচিত গবেষণামূলক প্রবন্ধ সংগ্রহ)
- ২। করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবন ও কাব্য—শ্রীমদনমোহন কুমার
- ৩। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইতিহাস : প্রথম পর্ব—শ্রীমদনমোহন কুমার ॥

পুথিশালা

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুথিশালা অমূল্য রত্নভাণ্ডার। আলোচ্য বর্ষে তালিকাভুক্ত সর্বপ্রকার পুথির সংগ্রহ সংখ্যা ছিল ৬৭৩৪। ইহাদের বিষয়ভাগ নিম্নরূপ :

বাংলা—৩৫৩৯ (সাধারণ ও বিভিন্ন সংগ্রহ : ৩০৫৯+৪৮৯), সংস্কৃত—২৯২৬ (সাধারণ ও বিভিন্ন সংগ্রহ : ২২৭৫+৬৫০), হিন্দুস্থানী—১, তিব্বতী—২৪৪, ফার্সী—১৩। পরিষদে প্রদত্ত বিভিন্ন সংগ্রহের মধ্যে আছে বাংলা পুথি : দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস সংগ্রহ—৪১১, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সংগ্রহ—২১, এবং গোপালদাস চৌধুরী সংগ্রহ—৫৭ ; সংস্কৃত পুথি : দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস সংগ্রহ—১৩, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সংগ্রহ—৬০, গোপালদাস চৌধুরী সংগ্রহ—২৫৬, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংগ্রহ—৩২৪।

এ বৎসর মোট ৫ জন গবেষক ২২ খানি পুথি পরিষৎ মন্দিরে বসিয়া ব্যবহার করিয়াছেন।

বর্তমান বৎসরে ফেডারেল রিপাবলিক অফ জার্মানির কনসাল জেনারেল ডক্টর হান্স ফের্দিনান্দ লিন্সের পরিষৎ মন্দিরে রক্ষিত বহু সুপ্রাচীন পুথির মাইক্রোফিল্ম, গত ১২ই চৈত্র ১৩৮০ বঙ্গাব্দে ‘বনফুল’-এর সভাপতিত্বে পরিষৎ মন্দিরে একটি মনোরম অনুষ্ঠানে, পরিষৎ সম্পাদকের হাতে প্রদান করিয়া পরিষদের অপরিমিত উপকার করিয়াছেন। অধ্যাপক গ্যোফ্কে কর্তৃক এই দুর্লভ প্রাচীন পুথিগুলির মাইক্রোফিল্ম প্রস্তুত হইয়াছে। অধ্যাপক গ্যোফ্কে, কনসাল জেনারেল লিন্সের এবং ফেডারেল রিপাবলিক অফ জার্মানির সরকার সকলকেই আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। এখন পরিষদের পুথিশালায় একটি মাইক্রোফিল্ম রীডার যন্ত্র সংগৃহীত হইলে এই মাইক্রোফিল্মগুলি গবেষক-গণের পক্ষে ব্যবহার করা সুবিধা হইবে। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ও কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

বীরভূম লাভপুর থানার অধীনস্থ হরানন্দপুর গ্রাম নিবাসী শ্রী অনিলবরণ রায় তাঁহাদের পরিবারে রক্ষিত এক বাঙালি পুরাতন পুথি পরিষদে দান করিয়াছেন। এগুলি হইতে নিম্নলিখিত পুথিগুলির কিছু কিছু খণ্ডিত অংশ উদ্ধার করা হইয়াছে :

(১) চৈতন্য-ভাগবত—বৃন্দাবন দাস (২ খানি)

- (২) চৈতন্য-চরিতামৃত—কৃষ্ণদাস কবিরাজ

- (৩) চৈতন্য-লীলামৃত—মুকুন্দ দাস
- (৪) গোবিন্দ-লীলামৃত
- (৫) শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচৈতন্যঅদ্বৈতধ্ব
- (৬) তত্ত্বশিক্ষা
- (৭) কালিকামঙ্গল—ভারতচন্দ্র ।

পশ্চিমবঙ্গ পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের অন্যতম সদস্য অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দুস্থানী ভাষায় লিখিত শ্রীমদ্ভাগবত-বিষয়ক একখানি সুবহু পুথি পরিষদে প্রদান করিয়াছেন। পুথিখানি রাজস্থান হইতে সংগৃহীত।

পূর্ব রেলের উচ্চপদস্থ কর্মচারী শ্রীশিশিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাদের গৃহে রক্ষিত, একত্রে বাঁধা কয়েকখানি ষণ্ডিত সংস্কৃত পুথি পরিষদে প্রদান করিয়াছেন, ইহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত পুথি দুইটি উদ্ধার করা হইয়াছে :

১। চণ্ডীমহিমা

২। সাহিত্যদর্পণ।

২২/৩ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা নিবাসী শ্রীমধুসূদন চন্দ্র পরিষদে কয়েকখানি পুথি দান করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ‘প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা’র পুথিটি উল্লেখযোগ্য। এই পুথির দুইটি পাতায় চারিটি চিত্র প্রাচীন চিত্রশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন বলিয়া গণ্য করা যায় ॥

চিত্রশালা

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চিত্রশালা বঙ্গসংস্কৃতির বহু অমূল্য নিদর্শন দীর্ঘদিন ধরিয়৷ রক্ষা করিতেছে। নানা প্রাচীন মুদ্রা, শিল্পদ্রব্যাদি, অসংখ্য প্রত্নবস্তু এবং বরণ্য মনীষিবৃন্দের প্রতিকৃতির সংগ্রহে এই চিত্রশালা গৌড়-বঙ্গের গৌরবের সামগ্রী। বর্তমানে পরিষৎ মন্দিরে সংরক্ষিত প্রতিকৃতির সংখ্যা ২০৯। আবক্ষ প্রত্নমূর্তির সংখ্যা ১৩।

বর্তমান বৎসরে অনেকগুলি চিত্র প্রয়োজন অনুযায়ী যথাযোগ্য সংস্কার করা হইয়াছে, তবে এখনও বহু চিত্র অর্থাভাবে আমরা সংস্কার করিতে পারি নাই।

বর্তমান বৎসরে নিম্নলিখিত চিত্রগুলি যথাযোগ্য মর্যাদায় অনুষ্ঠান-সহকারে পরিষৎ মন্দিরে নিম্নলিখিত দিবসে প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে :

- ১। কবি অভুলপ্রসাদ সেন—৮ই অগ্রহায়ণ ১৩৮০

[কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক প্রদত্ত।]

- ২। পণ্ডিত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যদল্লভ—১২শে ফাল্গুন ১৩৮০

[পরিষৎ সম্পাদক শ্রীমদনমোহন কুমার কর্তৃক সংগৃহীত চিত্র হইতে প্রস্তুত]

- ৩। ঐতিহাসিক রমাপ্রসাদ চন্দ্র—১২শে ফাল্গুন ১৩৮০

[শ্রীরণজিৎ প্রসাদ চন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত।]

৪। কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস—১লা জৈষ্ঠ ১৩৮১

[কবির পুত্র শ্রীহেমরঞ্জন দাস কর্তৃক প্রদত্ত ।]

৫। কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়—১লা জৈষ্ঠ ১৩৮১

[পরিষদের ব্যয়ে শিল্পী শ্রীভূনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রস্তুত তৈলচিত্র—কবির স্বাক্ষরিত ছবি হইতে প্রস্তুত ।]

৬। কবি মোহিতলাল মজুমদার—১লা জৈষ্ঠ ১৩৮১

[কবির স্বাক্ষরিত ফোটোগ্রাফ হইতে পরিষদের ব্যয়ে শিল্পী শ্রীবিভূতি সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রস্তুত তৈলচিত্র ।]

উপরিউক্ত চিত্রগুলি প্রতিষ্ঠার সময়ে এবং রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের স্মরণোৎসবে, প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানেই মনীষিগণের চিঠিপত্র, প্রকাশিত গ্রন্থ, পাণ্ডুলিপি ইত্যাদির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল এবং প্রত্যেকটি প্রদর্শনী এক সপ্তাহ কাল জনসাধারণের জন্য খোলা রাখা হইয়াছিল। বহু বিদগ্ধ ব্যক্তির সমাগমে প্রত্যেকটি প্রদর্শনী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।

রামেন্দ্রসুন্দরকে লিখিত ও রামেন্দ্রসুন্দরের লিখিত অনেকগুলি মূল্যবান পত্র, রামেন্দ্রসুন্দর-রচিত গণিতগ্রন্থের একটি পাণ্ডুলিপি ও রামেন্দ্রসুন্দর সংক্রান্ত অন্যান্য কাগজ-পত্র রামেন্দ্রসুন্দরের প্রদৌহিত্র শ্রীঅমিতাভ রায় ও শ্রীসমিতাভ রায় পরিষদে মন্দিরে অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহাদের পারিবারিক সংগ্রহে ঐ কাগজপত্রগুলির মাইক্রোফিল্ম করাইয়া লইবার জন্য পরিষদ সম্প্রতি ঐ কাগজপত্রগুলি সাময়িকভাবে তাঁহাদের দিয়াছেন।

মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত “বান্ধালী” নাটকের কবি মোহিতলাল মজুমদার-কৃত চৈতন্য অনুবাদের পাণ্ডুলিপি পরিষদের চিত্রশালায় বর্তমান বর্ষে সংগৃহীত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত শিল্পী যামিনী রায়ের অঙ্কিত অগ্রজ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভের পুরাতন একখানি চূর্ণিত তৈলচিত্র, বসন্তরঞ্জনের সহিত বঙ্গসাহিত্যসেবী সুধীরেন্দ্রের একখানি ফোটোগ্রাফ, বসন্তরঞ্জনের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, বসন্তরঞ্জনের সহস্রান্তে সংশোধিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থের কয়েকটি সংস্করণ ও অন্যান্য মূল্যবান কাগজপত্রাদি বর্তমান বর্ষে পরিষদের চিত্রশালায় সংগৃহীত হইয়াছে। বিভিন্ন কবি ও সাহিত্যিকের সহস্রলিখিত কাগজপত্র ও চিঠিপত্র বিভিন্ন ব্যক্তির আনুকূল্যে আমরা বর্তমান বর্ষে সংগ্রহ করিয়াছি, তাঁহাদের সকলকেই সহায়তার জন্য সাধুবাদ জানাই ॥

গ্রন্থশালা

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারের কার্য যথারীতি পরিচালিত হইয়াছে। এ বৎসর গ্রন্থশালা মোট ২৬৮ দিন খোলা ছিল এবং মোট ২৫০৩ জন অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ৩৫.৪৫

জন পাঠক-পাঠিকা গ্রন্থাগার ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার মধ্যে লেন-দেন বিভাগে ২৬৮ দিন কাজ হয় এবং ৪৪৭৩ জন অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ১৬.৬৯ জন পাঠক-পাঠিকা উপস্থিত ছিলেন। পাঠকক্ষেও মোট ২৬৮ দিন কাজ হয় এবং ৫৭৩০ জন অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ১৮.৭৬ জন পাঠক-পাঠিকা উপস্থিত ছিলেন। পাঠকক্ষ ও লেন-দেন বিভাগে সর্বোচ্চ উপস্থিতির সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪৫ ও ৪২ জন।

এ বৎসর গ্রন্থাগার বিভাগে মোট ১৯০৪৩ খানি পুস্তকের (অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ৭১.০৫ খানি) আদান-প্রদান হয়। ইহার মধ্যে লেন-দেন পত্রকের সাহায্যে ৭০৩১ (অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ২৬.২৩) ও পাঠকক্ষে ১২০১২ খানি (অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ৪৪.৮২ খানি) পুস্তকের আদান-প্রদান হয়। বিষয়ানুযায়ী ও ভাষানুযায়ী এই আদান-প্রদানের সংখ্যা পরিশিষ্ট 'গ'-এ দেওয়া হইল।

১৩৮০ বঙ্গাব্দে গ্রন্থাগারের মোট পঞ্জীকৃত (ইন্ডেক্সড) পুস্তক তালিকা পরিশিষ্ট 'ঘ'-এ দেওয়া হইল।

গ্রন্থশালায় পুস্তক-সংরক্ষণ ব্যবস্থা-ও আলোচ্য বৎসরে যথাসাধ্য অগ্রসর হইয়াছে। ধূপন-প্রকোষ্ঠে (Fumigation Chamber-এ) এ বৎসর ৮৪ খানি পুস্তক পরিশোধিত হইয়াছে। অবিরত ব্যবহারে গ্রন্থশালায় জীর্ণ গ্রন্থের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। গ্রন্থশালায় পুস্তক ছাড়া রামেন্দ্রসুন্দরের বিভিন্ন পত্র, পাণ্ডুলিপি, জন্মপত্রিকা এবং অন্যান্য বহু প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য কাগজপত্র ধূপন-প্রকোষ্ঠে পরিশোধিত হইয়াছে। ইহার মোট সংখ্যা ৫৪৩। আলোচ্য বৎসরে রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশনের নিকট হইতে প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তক বাঁধাইবার জন্য ৯,৭৫০ টাকা পাওয়া গিয়াছে। এই দানব জন্য উক্ত কর্তৃপক্ষকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাইতেছি।

১৩৮০ বঙ্গাব্দে পরিষৎ গ্রন্থাগারে মোট ৫৭৯ খানি পুস্তক উপহার স্বরূপ পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের আনুমানিক মূল্য ২৭৯৯.৬০ টাকা। যাহারা উপহার দানে গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন আমরা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি ॥

স্মারক-গ্রন্থ

৭৫তম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে স্মারক-গ্রন্থ বর্তমান বর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে। পরিষদের ৭৫ বর্ষ-পূর্তি-উৎসব-উপলক্ষে গঠিত মূল্যবান প্রবন্ধাবলী এবং বিগত ৭৫ বৎসরের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত কতকগুলি নির্বাচিত গবেষণামূলক প্রবন্ধ এই গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। নানা বাধাবিঘ্নের জন্য এই স্মারক-গ্রন্থ প্রকাশে বহু বিলম্ব হইয়াছে। বর্তমান কার্যনির্বাহক সমিতি যে বহুদিনের অপেক্ষিত এই অসমাপ্ত কাজটুকু সম্পূর্ণ করিতে পারিলেন ইহা তাঁহাদের পক্ষে আনন্দের কথা। যে সমস্ত বন্ধু ও সহকর্মী এই স্মারক-গ্রন্থ প্রকাশে সহায়তা করিয়াছেন তাঁহাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। যাহারা এই

গ্রন্থের জন্য অগ্রিম মূল্য দিয়া পাঁচ বৎসর অপেক্ষা করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট পরিষদের পক্ষ হইতে সবিনয়ে মার্জনা ভিক্ষা করি ॥

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ পত্রিকার ৮০তম বর্ষের বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮০ এবং শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮০ সংখ্যা দুইটি প্রকাশিত হইয়াছে। যথাসময়ে কাগজ না পাওয়ায় অপর দুইটি সংখ্যার প্রকাশ বিলম্বিত হইয়াছে। কাগজের দুর্ভিক্ষ ও অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, বিদ্যুৎ-বিভ্রাটের জন্য মুদ্রণসঙ্কট সত্ত্বেও এই দুর্দিনে পরিষদ গবেষণামূলক গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশ যথাসাধ্য করিয়া আসিতেছেন। আচার্য্য শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, আচার্য্য শ্রীসুকুমার সেন, আচার্য্য শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, ‘বনফুল’, শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅদ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ চিন্তাশীল লেখকের প্রবন্ধ তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশের জন্য প্রেসে দেওয়া হইয়াছে, মুদ্রণ কিছুদূর অগ্রসর হইয়া কাগজের অভাবে বন্ধ হইয়া আছে। যাহাতে এক পক্ষ কালের মধ্যে এই সকল মূল্যবান প্রবন্ধে অলঙ্কৃত হইয়া সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা প্রকাশিত হয় তাহার জন্য আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছি ॥

পরিষদ বাঙ্গালা অভিধান

এক বৎসর পূর্বে, পরিষদের ৮১তম প্রতিষ্ঠাদিবসে, প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক বাঙ্গালা ভাষার একখানি পূর্ণাঙ্গ সর্বাঙ্গক অভিধান রচনার সম্বল্ল পরিষদ গ্রহণ করিয়াছে। ‘আরতি মল্লিক গবেষণা র্ত্তি’ ও ‘রামকমল সিংহ গবেষণা র্ত্তি’র সাহায্যে আমরা এই কার্যে অগ্রসর হইয়াছি এবং এ জন্য তিন জন র্ত্তিভোগী গবেষক পরিষদের সহায়তা করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত কয়েকজন গবেষক বিনা পারিশ্রমিকে এই অভিধান সম্বলন কার্যে সহায়তা করিতেছেন। ইহাদের সকলকেই পরিষদের পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

সুখের বিষয়, বঙ্গভাষানুরাগী এই অভিধানের কাজে উৎসাহ প্রকাশ করিয়া পরিষদে পত্র লিখিয়াছেন, কেহ কেহ বা অগ্রিম মূল্য দিয়া অভিধানের গ্রাহক হইতে চাহিয়াছেন। বঙ্গভাষানুরাগী পাঠকগণ ‘পরিষদ বাঙ্গালা অভিধান’ সম্বন্ধে এইরূপ আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা প্রদর্শন করায় আমরা বিশেষ উৎসাহিত হইয়াছি।

পরিষৎ পরিকল্পিত বঙ্গভাষার এই পূর্ণাঙ্গ অভিধান সম্বন্ধে দুই একটি প্রাসঙ্গিক বিষয় সদস্যগণের নিকট নিবেদন করা কর্তব্য।

বাঙ্গালা ভাষার সহস্র-বর্ষ-ব্যাপী বিকাশে—প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক বঙ্গভাষায় ব্যবহৃত যাবতীয় সাহিত্যিক ও মৌখিক শব্দের সংকলন এই অভিধানে করা হইবে। ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে, ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও সাহিত্যিক প্রয়োগ সমন্বিত, সাধু ও চলিত ভাষায় এবং মৌখিক ও আঞ্চলিক ভাষায় ব্যবহৃত সমস্ত বাঙ্গালা শব্দের মহাকোষ প্রণয়নে বঙ্গের সুদীপমাজের সম্মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন। ইংরেজী ভাষার বৃহত্তম প্রামাণ্য অভিধান Oxford English Dictionary প্রণয়নে ইংরেজ জাতির সমস্ত পণ্ডিত সক্রিয় সাহায্য

করিয়াছেন, এক একজন সুধী ব্যক্তি, এক বা একাধিক লেখকের সমগ্র রচনা সম্বন্ধে পাঠ করিয়া তাঁহার বা তাঁহাদের ব্যবহৃত শব্দ,—তাঁহাদের রচিত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতিসহ সংকলন করিয়া প্রেরণ করিতেন। সেই সম্বন্ধ-সংকলিত শব্দাবলীর ও শব্দ-প্রয়োগের নিদর্শনগুলি অভিধান-সংকলনের প্রাথমিক উপকরণ রূপে গৃহীত হইত। এইভাবে পঞ্চাশ লক্ষেরও বেশী সাহিত্যিক-প্রয়োগের উদ্ধৃতি সুধী পাঠকগণ ইংরেজী ভাষার অভিধান প্রস্তুতের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ খণ্ডে প্রকাশিত সম্পূর্ণ Oxford English Dictionary-র মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬,৫৭০ ; খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগ হইতে প্রকাশ-কাল পর্যাস্ত দ্ব্যুত্তর শব্দসংখ্যা ৪১৪, ৮২৫ ; প্রত্যেকটি শব্দের পদ, অর্থ, শ্রেণী, ব্যুৎপত্তি ও সাহিত্যিক প্রয়োগ—প্রতি শতাব্দী হইতে অন্ততঃ একটি উদ্ধৃতি সহ প্রদর্শিত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদও সেই পদ্ধতি ধরিয়াই কাজ আরম্ভ করিয়াছেন, বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ কর্তৃক প্রত্যেকটি শব্দ ও প্রয়োগের উদ্ধৃতি পরীক্ষিত হইয়া নিরুক্তি ও ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় অলঙ্কৃত হইতেছে। এই পদ্ধতিতে বঙ্গভাষার এই মহাকোষ সম্পূর্ণ করিতে কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সহিত দীর্ঘদিন কাজ করিতে হইবে। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে A New English Dictionary on Historical Principles (পরবর্তী-কালে Oxford English Dictionary নামে অভিহিত) পরিকল্পনা হইতে প্রকাশন সম্পূর্ণ করা পর্যাস্ত ইংরেজ জাতির ৭৫ বৎসর সময় লাগিয়াছিল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে Philological Society ফিললজিকাল সোসাইটির নিযুক্ত এক কমিটি এই কাজে হাত দেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে F. J. Furnivall এফ্. জে. ফার্নিভাল ও Herbert Coleridge হারবার্ট কোলরিজ্ অভিধান প্রণয়ন আরম্ভ করেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ফিললজিকাল সোসাইটি ও অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের মধ্যে চুক্তির পর ক্লারেণ্ডন প্রেস এই অভিধান সংকলনের ও প্রকাশের ব্যয় বহন করিতে স্বীকৃত হন, James A. H. Murray জেমস্ এ. এইচ. মারে সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এই অভিধানের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়, ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজি ভাষার এই বৃহৎ প্রামাণ্য সুবৃহৎ অভিধানের সঙ্কলন কার্য সমাপ্ত হয় এবং ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে অভিধানের শেষ খণ্ড, ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রকাশিত হইয়া সম্পূর্ণ হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের আরও বঙ্গভাষার পূর্ণাঙ্গ, সর্বাঙ্গিক অভিধান বা মহাকোষ সম্পূর্ণ করার জন্য বহু পণ্ডিতের ও বঙ্গভাষানুরাগী সমাজের দীর্ঘকালব্যাপী কঠোর পরিশ্রম, নিরলস সাধনা ও নিঃস্বার্থ সেবার প্রয়োজন হইবে। বঙ্গবাণীর পূজার, মাতৃভাষার অর্চনায় যিনি যতটুকু শ্রম ও সময় দান করিতে পারেন তাহাই অর্থরূপে দান করিবার জন্য তাঁহাকে সশ্রদ্ধ আহ্বান জানাই ॥

শ্রীমদনমোহন কুমার

সম্পাদক

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

৮ই শ্রাবণ, ১৩৮১।

৮২তম প্রতিষ্ঠাদিবস ॥

পরিশিষ্ট—‘ক’

৮১ তম বর্ষের কর্মাদ্যক্ষণ

সভাপতি

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

সহকারী সভাপতি

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

ডাঃ শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

শ্রীত্রিবিদনাথ রায়

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শ্রীকুমারেশ ঘোষ

শ্রীমনোমোহন ঘোষ

সম্পাদক

শ্রীমদনমোহন কুমার

সহকারী সম্পাদক

শ্রীহারাদন দত্ত

শ্রীসুধীরকুমার নন্দী

কোষাধ্যক্ষ : শ্রীবিমলেন্দুনারায়ণ রায়

গ্রন্থশালাধ্যক্ষ : শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ

চিত্রশালাধ্যক্ষ : শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী

পুথিশালাধ্যক্ষ : শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য

পত্রিকাধ্যক্ষ : শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

শ্রীজটিলকুমার মুখোপাধ্যায়

কার্যনির্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

সর্বশ্রী অধীর দে, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, উষা সেন, কামিনীকুমার রায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় ঘোষ, জ্ঞানশঙ্কর সিংহ, দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার ঘোষ, মণীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়, মনসুর আলি সিদ্দিকী, শৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়, সুধাকান্ত দে, হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।

শাখা-প্রতিনিধি

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত নাগ, বিষ্ণুপুর শাখা

শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহরায়, কৃষ্ণনগর শাখা

শ্রীঅভূলাচরণ দে পুরাণরত্ন, নৈহাটি শাখা

শ্রীসুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়, মেদিনীপুর শাখা ॥

পরিশিষ্ট—‘খ’

৮১তম বর্ষের বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্য

পৃষ্ঠপোষক : পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী আর্নল্ড লিঙ্গলট্‌ দিয়াস ।

বাকব : রাজা শ্রীনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর ।

বিশিষ্ট সদস্য : শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ, শ্রীদিলীপকুমার রায়, শ্রীসুকুমার সেন, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকালিদাস রায় ।

অ্যাসসক : সর্বশ্রী সুকুমার সেন, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথনাথ বিশী, অশোককুমার সরকার, বিমলেন্দুনারায়ণ রায় ।

আজীবন সদস্য : সর্বশ্রী সত্যচরণ লাহা, নেহিচাঁদ পাণ্ডে, প্রশান্তকুমার সিংহ, রঘুবীর সিংহ, মুরারিমোহন মাইতি, ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, হিরণকুমার বসু, সমীরেন্দ্রকুমার সিংহরায়, ইন্দ্ৰভূষণ বিদ্, ত্রিদিবেশ বসু, জগন্নাথ কোলে, নীহাররঞ্জন রায়, সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সেন, হরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধাকান্ত দে, বিভূষণ চৌধুরী, অজিত বসু, অনিলকুমার রায়চৌধুরী, আর্থার হিউজ, কুমুদবন্ধু চট্টোপাধ্যায়, জগদীশচন্দ্র সিংহ, দীনেশচন্দ্র সিংহ, দীনেশচন্দ্র তপাদার, ফণিভূষণ চক্রবর্তী, সুধীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমোদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণী দেবী, রূপালী দেবী, দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীচরণ চট্টোপাধ্যায়, কেতকী গঙ্গোপাধ্যায়, রঞ্জিত মুখোপাধ্যায়, পুষ্পমালা দেবী, বিভূষণ ঘোষ, চারুচন্দ্র হোম, অসীমকুমার দত্ত, বীরেন্দ্রনাথ মল্লিক, দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত, জ্ঞানশঙ্কর সিংহ, উষা সেন, রঞ্জিতকুমার দাস, শিবেন্দ্রনাথ কুণ্ড, কমলকুমার গুহ, বাসন্তী চৌধুরী, অশোককৃষ্ণ দত্ত, শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষীরোদকুমার বসু, সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, শম্ভুচন্দ্র ঘোষ, অনাদিমোহন ঘোষ, এ. পি. সরকার, শান্তিভূষণ দত্ত, মণীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়, কানাইচন্দ্র পাল, মিলন মুখোপাধ্যায়, গিরীন্দ্রমোহন সাহা, অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায়, হরিনাথ পাল, দেবকুমার বসু, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাণী সেন, অশোককুমার সেন, ভূপতি চৌধুরী, অরবিন্দ বসু, অতীশচন্দ্র সিংহ, হুলুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপকুমার মিত্র, মধুসূদন মজুমদার, দেবজ্যোতি দাস, অরুণকুমার সেন, কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, রমেশচন্দ্র ঘোষ, মলয়কুমার চক্রবর্তী, দীনেশচন্দ্র সরকার, অজিতকৃষ্ণ ঘোষ, সীতারাম সাকসেরিয়া, চিত্তরঞ্জন সাহা, রামকুমার ডুয়ালকা, মণীন্দ্রকুমার কুণ্ড, নন্দলাল কানোরিয়া, জনার্দনপ্রসাদ কানোরিয়া বি. পি. বৈতান, পুরুষোত্তম দাস তুলসায়ন ।

পরিশিষ্ট—‘গ’

পুস্তক আদান-প্রদান : ১৩৮০

বিষয়ানুযায়ী

১৩৮০	লেনদেন	পাঠকক্ষ	মোট
দর্শন (১০০)	৫৭	১৩৬	১৯৩
ধর্ম (২০০)	১৮২	৪৭৭	৬৫৯
সমাজ-বিজ্ঞান (৩০০)	৫৯	২৭১	৩৩০
শিক্ষা (৩৭০)	২৬	৭৫	১০১
ভাষা (৪০০)	৮২	১৭৫	২৫৭
বিজ্ঞান (৫০০)	৮	৪৭	৫৫
ফলিত বিজ্ঞান (৬০০)	১৩	৩৫	৪৮
শিল্পকলা (৭০০)	২৯	২০	৪৯
সঙ্গীত (৭৮০)	৬১	৩৭৫	৪৩৬
সাহিত্য (৮০০)	৫,৮৭০	৩,৮৯৫	৯,৭৬৫
ভূগোল, বর্ণনা ও ভ্রমণ (৯১০)	১২০	৯০	২১০
জীবনী (৯২০)	৩৭৭	৯১৪	১২৯১
ইতিহাস (৯৩০-৯৯৯)	১১৫	৪১৩	৫২৮
সহায়ক গ্রন্থ (০০০)	৩২	৪৮৭	৫১৯
পত্র-পত্রিকা		৪,৬০২	৪,৬০২
	৭,০৩১	১২,০১২	১৯,০৪৩

ভাষানুযায়ী

১৩৮০	লেনদেন	পাঠকক্ষ	মোট
বাংলা	৬,৯৬১	১০,৭৫২	১৭,৭১৩
ইংরাজী	৫১	১,০১৮	১,০৬৯
সংস্কৃত	১৯	২৪২	২৬১
হিন্দী	—	—	—
	৭,০৩১	১২,০১২	১৯,০৪৩

পরিশিষ্ট—‘ঘ’

পঞ্জীকৃত পুস্তক (১৩৮০)

১৩৮০ বঙ্গাব্দে গ্রন্থাগারে পঞ্জীকৃত গ্রন্থ—৩১২১

পরিশিষ্ট—‘ঙ’

কাব করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ও কাব মোহনলাল মজুমদারের

তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠাকল্পে দান

পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি	২০০'০০	মনসুর আলি সিদ্দিকী	১০'০০
শ্রীসুধীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	১০১'০০	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১০'০০
শ্রীচিন্তরঞ্জন সাহা	১০০'০০	শ্রীপশুপতিনাথ লাহা	১০'০০
ডুয়াল্কা জনকল্যাণ ট্রাস্ট	১০০'০০	শ্রীত্রিদিবনাথ রায়	১০'০০
শ্রীমতী ইলা পালচৌধুরী	৫১'০০	শ্রীমল্লিনাথ মুখোপাধ্যায়	১০'০০
শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু	৫১'০০	শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার সেন	৮'০০
শ্রীকানাইচন্দ্র পাল	৫১'০০	শ্রীসুব্রতেশ ঘোষ	৭'৭১
শ্রীঅতীশচন্দ্র সিংহ	৫০'০০	শ্রীমতী উষা সেন	৫'০০
শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)	২৫'০০	শ্রীহরনাথ পাল	৫'০০
শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত	২৫'০০	শ্রীহারাদন দত্ত	৫'০০
শ্রীমদনমোহন কুমার	২৫'০০	শ্রীশুভব্রত শেঠ	৪'০০
শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত	২৫'০০	শ্রীআর. এম চক্রবর্তী	৩'০০
শ্রীজ্ঞানশঙ্কর সিংহ	২০'০০	শ্রীবিমলকুমার মুখোপাধ্যায়	২'০০
শ্রীকামিনীকুমার দে	১৬'১৪	শ্রীজয়ন্তকুমার চক্রবর্তী	২'০০
শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার	১৫'০০	শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ	২'০০
শ্রীভূরামল আগরবাল	১০'০০	শ্রীমতী চৈতালী রায়	২'০০
শ্রীঅসীমকুমার দত্ত	১০'০০	শ্রীমদনমোহন নাথ	২'০০
শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত	১০'০০	শ্রীশিশিরকুমার কর	১'০০

মোট টাকা

৯৮৩'৮৫

শ্রীমদনমোহন কুমার

সম্পাদক

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ॥

৮ই শ্রাবণ ১৩৮১ ।

৮২তম প্রতিষ্ঠাদিবস ॥

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

একাদশীতিতম বর্ষ ॥ দ্বিতীয় - চতুর্থ সংখ্যা

শ্রাবণ - চৈত্র

১৩৮১

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার



বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

২৪৩/১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৬

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি



শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ
কলিকাতা—৭০০ ০০৯

স্মারক গ্রন্থ

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৭৫তম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে পঠিত মূল্যবান প্রবন্ধাবলী এবং বিগত ৭৫ বৎসরের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় বাঙ্গালার চির-স্মরণীয় মনীষী ও লেখকদের ছুপ্রাপ্য গবেষণামূলক প্রবন্ধসমূহের নির্বাচিত সংকলন ॥

বাঙ্গালার “ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব প্রাচীন সাহিত্য, গ্রাম্য-সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে যে সকল নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত” হইয়া পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল সেগুলির পরিচয় কৌতূহলী পাঠক ও অনুরাগীরা গবেষক এই গ্রন্থে পাইবেন ॥

পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ, শোভন বঁধাই, উৎকৃষ্ট কাগজ ।

মূল্য পনের টাকা ॥

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

তৃতীয় বর্ষ ॥ দ্বিতীয় - চতুর্থ সংখ্যা

শ্রাবণ - চৈত্র

১৩৮১

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার



বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

২৪৩/১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৬

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

৮১ বর্ষ ॥ দ্বিতীয়—চতুর্থ সংখ্যা

১৩৮১, শ্রাবণ—চৈত্র

সুচীপত্র

কোড়পত্র

পরিষদের অপহৃত বিষ্ণুমূর্তির পুনরুদ্ধার,

পরিষৎ মন্দিরে পুনঃপ্রতিষ্ঠা

বিষ্ণু

পাল-রীতির ধাতুমূর্তি, গোড়বঙ্গ (মধ্যযুগের বাঙ্গলাদেশ)

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতক—

শ্রীস্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

Reinstallation of the lost

Vishnu Murti at the Bangiya

Sahitya Parisad Museum—

Governor Anthony Lancelot Dias.

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ চিত্রশালা

সাগরদাঁঘি হইতে প্রাপ্ত গোড়-বঙ্গের

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের বিষ্ণুমূর্তি

অপহরণ, পুনরুদ্ধার ও পুনঃ প্রতিষ্ঠা

শ্রীমদনমোহন কুমার

LETTER

Museum of Fine Arts

Boston, Massachusetts—

Jan Fontein, Curator

(Facsimile reproduction)

AGREEMENT

Museum of Fine Arts

Boston Massachusetts

(Agreement between Sri Medan M'chan Cocmer, Secretary, Bangiya Sahitya Parisad and Mr. Merrill C. Fueppel, Director, Museum of Fine Arts, Boston, Massachusetts)

(Facsimile reproduction)

বিষ্ণুমূর্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠা উৎসবের

আলোকচিত্র ৪ খানি।

হাড়মাসড়ায় আবিস্কৃত মূর্তির আলোকচিত্র

মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণ

পরিষৎ সভাপতির ভাষণ—

শ্রীস্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ৫

অপহৃত বিষ্ণুমূর্তি পুনঃ-

প্রতিষ্ঠা উৎসবে নিবেদন—

শ্রীমদনমোহন কুমার ৮

স্বরূপের রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ২১

রাখাল-স্মৃতি—

শ্রীস্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ৩৫

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—

ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার ৪৬

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—

শ্রীঅজীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৭

লালন ফকির—

শ্রীহিরণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৯

লালন-চরিতের উপাদান : তথ্য ও সত্য—

মুহম্মদ আবু তালিব ৬৫

হরিমোহন মুখোপাধ্যায়—

শ্রীহারাদন দত্ত ৮৭

হাড়মাসড়া গ্রামে প্রাপ্ত প্রাচীন মূর্তি—

শ্রীমদনমোহন কুমার ৯৬



পরিষদের অপহৃত বিষ্ণুমূর্তির

পুনরুদ্ধার,

পরিষৎ মন্দিরে পুনঃপ্রতিষ্ঠা

২৯শে মাঘ বুধবার ১৩৮১ ॥

RECOVERY AND REINSTALLATION
IN THE MUSEUM OF
THE BANGIYA SAHITYA PARISAD
OF THE ELEVENTH CENTURY
BRONZE VISHNU IMAGE
ON WEDNESDAY, 12th FEBRUARY, 1975.



বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

BANGIYA SAHITYA PARISAD

প্রকাশক
শ্রীমদনমোহন কুমার
সম্পাদক
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
২৪৩১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৬

মূল্য এক টাকা

মুদ্রক :
শ্রীঅজিতমোহন গুপ্ত
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও
৭২-১, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

॥ বিষ্ণু ॥

পাল-রীতির ধাতুমূর্তি
(গোড়বঙ্গ (মধ্যযুগের বাঙ্গালা দেশ)
খ্রীষ্টীয় একাদশ শতক

মুর্শিদাবাদ জেলায় সাগরদীঘী গ্রামে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রাপ্ত
এই মূর্তি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহশালা হইতে ১৯৬৫
খ্রীষ্টাব্দে অপহৃত হইয়া আমেরিকার বস্টন নগরে নীত হয় ;

এবং পরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক অধ্যাপক
শ্রীযুক্ত মদনমোহন কুমারের সবিশেষ চেষ্টায় ও প্রযত্নে, বস্টন
সুকুমার-শিল্প-সংগ্রহশালার কর্তৃপক্ষের সৌজ্ঞেয় এবং ভারতের
প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আগ্রহ ও তৎপরতায় এই মূর্তি
পরিষদের নিকট প্রত্যর্পিত ও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত
আন্তনি লন্সলট দিয়াস কর্তৃক পরিষৎ মন্দিরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত
হয় ।

(২১ মাঘ ১৩৮১, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫, বুধবার) ॥

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার
প্রাক্তন সভাপতি
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ॥

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
সভাপতি
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ॥

V I S H N U

BRONZE IMAGE, PALA STYLE GAUDA-VANGA (MEDIEVAL BENGAL), ELEVENTH CENTURY CHRISTIAN ERA.

This image was discovered in the village of Sagardighi in Murshidabad District in 1909, and was stolen from the Museum of the Bangiya Sahitya Parisad (where it was gifted) on 14th January 1965, and found a place in the Museum of Fine Arts, Boston, U. S. A. ;

And then through the exertions and efforts of Prof. Madan Mohan Coomer, Hony. Secretary of the Parisad and the courtsey of the authorities of the Museum in Boston, and the prompt and active interest of Srimati Indira Gandhi, Prime Minister of India,

It was returned to the Parisad. and reinstalled by Sri Anthony Lancelot Dias, Governor of West Bengal, on Wednesday 12th February, 1975 (29th Magh, 1381).

Ramesh Chandra Majumdar
Former President
Bangiya Sahitya Parisad.

Suniti Kumar Chatterji
President
Bangiya Sahitya Parisad



GOVERNOR OF WEST BENGAL



Reinstallation of the Lost Vishnu Murti
At the Bangiya Sahitya Parisad Museum
In Calcutta, on February 12, 1975

Speech by
Governor Anthony Lancelot Dias

Dr Suniti Kumar Chatterji, Dr Mazumdar, Professor Coomer, distinguished members of the Bangiya Sahitya Parisad, and friends.

I feel greatly privileged to have been invited here this evening, to participate in this little but very significant ceremony of reinstalling the eleventh century bronze image of Vishnu, which originally was in this museum, but was then purloined, sent across the seas, and finally recovered.

This occasion is therefore of special significance. It is significant because a priceless treasure of great religious and sentimental value has been recovered and restored to the museum. It is also significant because it is the home-coming of a much revered deity. I have no doubt that all the votaries of this hallowed temple of learning must consider this an occasion of great rejoicing.

Professor Coomer has, a little while ago, given you a full account of how this and two other images were lost, how one was recovered earlier and the interesting chain of events leading to the recovery of the second bronze image which I have the privilege and the honour of reinstalling in this museum. Professor Coomer's account is also set out in fuller detail in the little booklet which has been published today by the Parisad.

This is a suitable occasion, in the first place, to pay a tribute, publicly to Professor Coomer for the painstaking research that he made and for the persistence with which he followed up his original findings, which resulted, ultimately, in the recovery of this priceless treasure. I think that the members of this Parisad—in fact, the public of this country—owe a debt of gratitude to him for his efforts in recovering this priceless treasure.

I would also like to take this opportunity of paying a public tribute to the Boston Museum authorities, but for whose cooperation, and gracious gesture, we would never have been able to recover this priceless treasure. In particular, we are thankful to the Curator of the Boston Museum of Fine Arts, Dr Fontein, and the Director Dr Ruepell. Photostats of their letters have been included in the brochure published by the Parisad. We are all deeply grateful to these authorities of the Boston Museum of Fine Arts for having enabled us to recover this bronze image.

As you are already aware there were three images. One was recovered earlier; one has now been recovered; and there is a third image that is still nestling somewhere. I do not know if Professor Coomer has done any research, or has stretched out his tentacles, or set up his antennae to locate this third image. It must be somewhere, either at home or abroad. I would like to take this opportunity to appeal to the person who presently possesses that image to do the right thing and restore it to this museum. I am sure that any of you who may have a clue as to where that image may be will pass that information to the Parisad authorities, so that it can be followed up and ultimately lead to the recovery of the third image.

This incident of the loss and recovery of this image highlights the fact that the clandestine trade in precious art objects still continues to a considerable extent. A number of antiques and other art objects are smuggled out of the country in one form or another. Hardly a month passes

without one reading about the theft of some object from a temple, or museum.

I happen to be the Chairman of two museums here—the Indian Museum and the Victoria Memorial Museum. We have lost by theft or pilferage certain articles from these museums. We often read of the auction of some precious object from India in the auction rooms of Christie's, or Sotheby's, but are quite helpless to do anything about their disposal.

I am glad that public opinion is gradually being created in this connection and that the Government has taken the initiative in recovering several objects which have crossed the seas. In fact, I feel that this evil can only stop if there is increased public vigilance, and a strong public opinion which ensures, in the first place, that there is not any internal trafficking in these precious art objects, that information is quickly passed on to the authorities when such illicit traffic takes place. Even when there is a legitimate passing of an object from one private party to another, I feel that it is necessary that such transfers should be brought to the notice of the concerned Governmental agencies—such as museums—so that they may have the first option of refusal. Museums are provided with a certain quantum of funds to purchase antiques and art objects. They should therefore have the first opportunity of being able to make such purchases.

Public vigilance is also vital to ensure that these art objects are not surreptitiously passed on to foreigners. Not long ago, I saw an advertisement inserted by a foreigner in the local papers to the effect that he was interested in the purchase of antiques and art objects. This is where public vigilance and public opinion can help in ensuring that our precious heritage is kept within the country.

I suggest that the Central Government and the public spirited citizens of this country should take the initiative in

creating a National Trust with adequate funds to acquire antiques, objects d'art, historical records, archives etc. from private collectors and display them in public museums. Such National Trusts have been created by various countries —Russia, America, England and in various European countries.

When I was in Moscow about two months ago, I visited some of the museums and saw some of the beautiful treasures of the old regime which were displayed. I was shown an edict of Lenin which was issued in 1917 which enjoined the people not to indulge in any vandalism or to deface any building ; not to purloin any art object or any national treasure, but to give it to the State which would arrange for its display in a public museum.

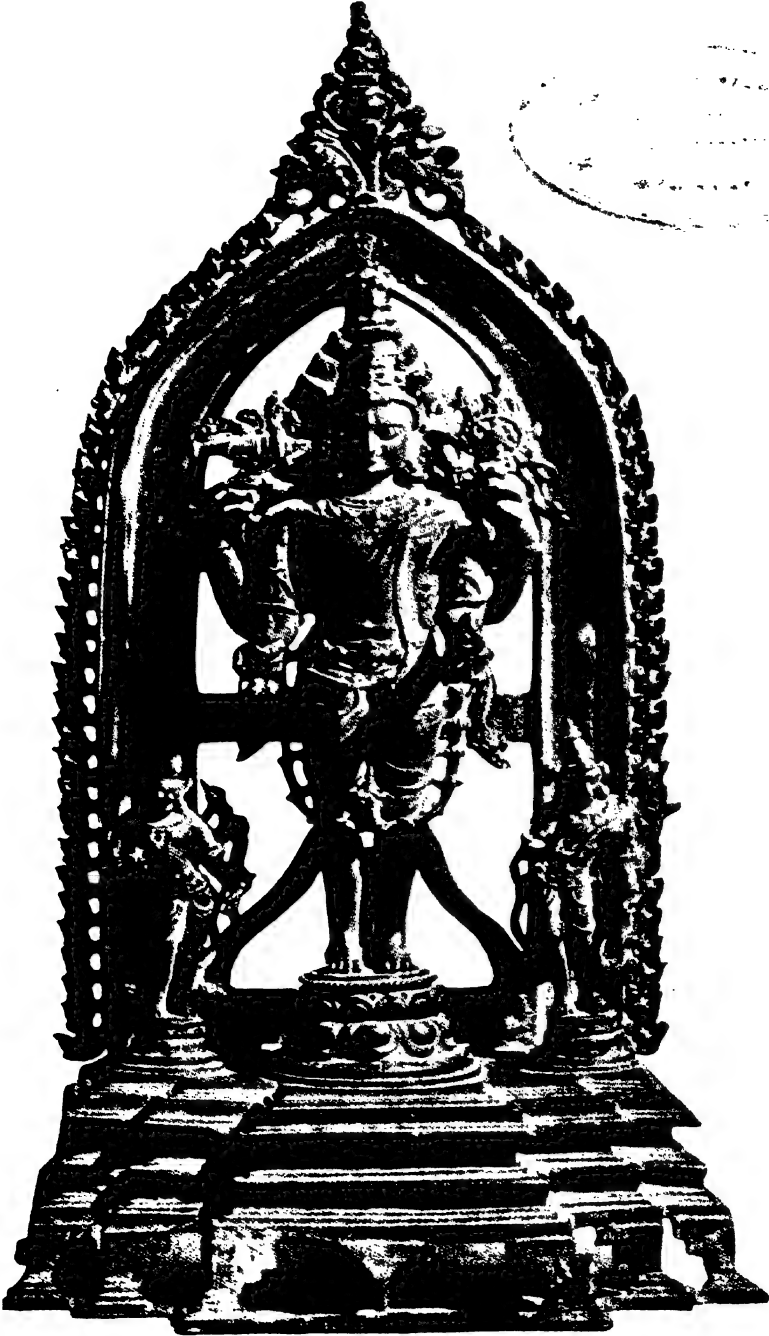
I hope that the Central Government now sees the urgency of enacting legislation to ensure that smuggling is brought under stricter control and that Government is kept informed when antiques, art objects etc. are sold to private collectors. There is also need for State intervention in other ways. There is need for funds being placed at the disposal of both public and private institutions which have collections of precious objects, rare manuscripts, or historical records, for the purpose of ensuring that they are in safe custody and are properly preserved, and that they are properly inventoried, catalogued and photographed. There should also be periodical physical verification of objects especially in public museums and institutions.

Apart from the need for preservation, an up to date catalogue with proper photographs of each object is equally essential for scholars and researchers. Without such catalogue it is difficult for scholars and researchers, to know the precious heritage that sometimes lies hidden in so many museums and libraries. We also ought to pay better attention to the preservation of old manuscripts and historical records. In Tamil Nadu recently some old historical records

of the East India Company, or even prior to that period were destroyed. This may be happening in other States as well. I think that it is high time that there should be some guidelines from Government as to the type of records that should be preserved.

I happen to be associated with some museums, libraries and educational institutions. On the basis of my experience I feel the time has come when there ought to have a National Commission to make a deep study of the functioning of our museums and to examine how effective they are in the matter of the custody, preservation, cataloguing, and physical verification. I would also recommend that Government at the Central and State levels should extend its patronage and support to private institutions like the Bangiya Sahitya Parisad, so that they are provided with adequate resources for the proper maintenance and management of the precious collections that they possess.

I do not wish to take more of your time this evening. I would like to say once again how privileged I feel to have been asked to participate in this ceremony of reinstalling the bronze image of Vishnu. I hope that, with its reinstallation, the priceless heritage of the Parisad will grow richer and richer.



বিষ্ণু
খ্রী: একাদশ শতক
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

VISHNU
11th Century A. D.
Bangiya Sahitya Parisad

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ চিত্রশালা

সাগরদীঘী হইতে প্রাপ্ত

গোড়-বঙ্গের খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের

বিষ্ণুমূর্তি অপহরণ, পুনরুদ্ধার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা ॥

১৩০০ বঙ্গাব্দের ৮ই আশ্বিন (১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুলাই) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধারের সহিত বঙ্গ-সংস্কৃতির বিস্মৃত, অবলুপ্ত পরিচয় পুনরুদ্ধারে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ত্রুতী হয়।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে বাঙ্গালী জাতি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রাচীন পুথিপত্রের ও পুরাতন মুদ্রিত পুস্তকের সহিত বহু প্রত্নবস্তু, প্রাচীন মুদ্রা, শিলালিপি, শিল্পকর্ম, দলিলপত্র ও বঙ্গের সাহিত্যিক ও মহাপুরুষগণের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ও হস্তাক্ষর, চিঠিপত্র, পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি দান করিয়া আসিয়াছেন। সাহিত্য পরিষৎ প্রতিষ্ঠার জন্মলগ্নে বা অভ্যুদয়-পর্বে কোনও মিউজিয়ম স্থাপনের পরিকল্পনা না থাকিলেও ধীরে ধীরে—পরিষদের ভাড়াটিয়া বাড়িতে ও পরে নিজস্ব ভবনে—বঙ্গের নানা স্থান হইতে সংগৃহীত ও প্রদত্ত প্রত্ন-বস্তুর সম্ভারে একটি সংগ্রহশালা আপনা-আপনি গড়িয়া উঠিতে থাকে।

১৩১৩ বঙ্গাব্দে (১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে) কলিকাতায় জাতীয় মহাসভার (Indian National Congressএর) অধিবেশনে ভারতীয় শিল্প-ও কৃষি-প্রদর্শনীতে জাতীয় কংগ্রেসের প্রদর্শনী-কর্তৃপক্ষের অনুরোধে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পরিষদে সংগৃহীত দুর্লভ হস্তলিখিত প্রাচীন পুথি, বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত প্রাচীন পুস্তকাদি, তাম্রশাসন, খোদিত লিপি, বঙ্গ-ইতিহাসের স্মরণীয় জনপদ, রাজধানী, প্রাচীন মন্দির, ধ্বংসোদ্ভূত

প্রাসাদ, অট্টালিকা ও পুরাতন মন্দির ও ধাতু-মূর্তির ফোটোগ্রাফ, প্রাচীন শিল্পকলার নিদর্শন এবং বঙ্গের সাহিত্যিক ও মনীষীগণের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, হস্তাক্ষর ও পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি প্রেরণ করেন। পরিষদের প্রেরিত এই প্রত্নবস্তুগুলি ৬ পৌষ হইতে ১৪ ফাল্গুন ১৩১৩ (২১শে ডিসেম্বর, ১৯০৬—২৬শে ফেব্রুয়ারি ১৯০৭) বঙ্গের ও বঙ্গের বাহিরের বহু দর্শকের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করে। পরিষদের বিশেষজ্ঞ সদস্যগণ এই সব প্রত্নবস্তু ও নিদর্শন ঐ প্রদর্শনীতে দর্শকগণের নিকট ব্যাখ্যা করেন এবং জনসাধারণের চিত্তে বঙ্গের প্রাচীন ইতিহাসের ও প্রত্নবস্তুর নিদর্শন সংগ্রহের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হওয়ায় তাঁহাদের আনুকূল্যে পরিষৎ মন্দিরে এই শ্রেণীর দ্রব্যসম্ভার ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। বঙ্গের নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত, অযত্নরক্ষিত, ধ্বংসোন্মুখ বা লুপ্তপ্রায় শিল্পকলার নিদর্শন ও প্রত্নবস্তু সংগ্রহ করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সংরক্ষণের প্রস্তাব পরিষৎ-হিতৈষী ও দেশপ্রেমী ব্যক্তিগণের নিকট হইতে পরিষদ-কর্তৃপক্ষের নিকটে আসে।

১৩১৪ বঙ্গাব্দে কাশিমবাজার রাজবাড়ীতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে পরিষৎ সম্পাদক পুণ্যশ্লোক রামেন্দ্র-মুন্দর ত্রিবেদী পরিষৎ মন্দিরে ‘সারস্বত ভবন’ স্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া সেখানে এইরূপ দুর্লভ ও প্রাচীন সামগ্রী সংরক্ষণের সঙ্কল্প প্রকাশ করেন। পরিষদ তখন কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের স্বল্পপরিসর ভাড়াটিয়া বাড়িতে থাকায় সঙ্কল্প সিদ্ধ হয় না। পরিষদের একটি সঙ্গীর্ণ ঘরে আবদ্ধ সংগ্রহশালায় এই সব দুর্লভ সামগ্রী রক্ষিত হয়। পরিষদের সহকারী সম্পাদক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অক্লান্ত চেষ্টায় ও প্রযত্নে অনেকগুলি প্রাচীন মুদ্রা ও মূর্তি সংগৃহীত হয়।

১৩১৫ বঙ্গাব্দে পরিষদ নবনির্মিত ভবনে স্থানান্তরিত হইলে পরিষদের সদস্য ও পরিষদপ্রেমীগণের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত তাক্সাসন,

প্রাচীন মুদ্রা, পোড়ামাটির শিল্পকর্ম, ধাতুমূর্তি ও প্রস্তরমূর্তি প্রভৃতি অমূল্য সম্ভারে এই সংগ্রহ দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। সরকারী সাহায্য ছাড়াই বঙ্গবাসীর দানে পরিষৎ মন্দিরে বাঙ্গালীর জাতীয় সংগ্রহশালা গড়িয়া উঠে।

১৩১৮ বঙ্গাব্দে (১৯১১ খ্রীঃ) রামেন্দ্রসুন্দর লিখিয়াছিলেন, “if the present rate of growth be maintained, it will grow into a National Museum of our own, which we may look upon with pride.”

১৩১৯ বঙ্গাব্দের ১৫ই বৈশাখ (২৮শে এপ্রিল ১৯১২) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের Museum বা চিত্রশালা একটি স্বতন্ত্র বিভাগরূপে আনুষ্ঠানিক ভাবে স্থাপিত হয় এবং চিত্রশালা পরিচালনা ও সংরক্ষণের জন্য অন্ত্যতম অবৈতনিক কর্মাধ্যক্ষরূপে ‘চিত্রশালাধ্যক্ষ’ পদের সৃষ্টি হয় এবং নগেন্দ্রনাথ বসু পরিষদের প্রথম চিত্রশালাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। পরে এই দায়িত্বপূর্ণ পদে অধ্যাপক রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার, শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর,^১ প্রত্নতত্ত্ববিৎ মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, শিল্পকলাবিৎ অর্পেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ঐতিহাসিক উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল, পুরাতত্ত্ববিৎ অজিত ঘোষ, শিল্প-রসিক কেশবনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সুধী ব্যক্তি পরিষদের চিত্র-শালাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন।

আনুষ্ঠানিক ভাবে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের স্বতন্ত্র বিভাগরূপে ‘চিত্রশালা’ (Museum) প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বেই ১৩১৬ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে (১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে খ্রীষ্টীয় ১১শ শতকের তিনটি দুর্লভ বিষ্ণুমূর্তি সংগৃহীত

^১ অবনীন্দ্রনাথ চিত্রশালাধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করিতে অসমর্থ হওয়ায় বনওয়ারিলাল চৌধুরী তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। [কা, নি, স, ১৬ আধিন ১৩২৪, ২ অক্টোবর ১৯১৭]

হয়। পরিষদের তৎকালীন সম্পাদক (১৩১১-১৮) আচার্য্য রামেন্দ্রশুন্দর ত্রিবেদী এই মূর্তি তিনটি মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী-নিবাসী কিশোরীমোহন সিংহ মহাশয়ের নিকট হইতে সংগ্রহ করেন। কিশোরীমোহন পরিষদের সদস্য ছিলেন, ১৩১২ বঙ্গাব্দে তিনি পরিষদের অগ্রতম সহকারী সম্পাদকও ছিলেন। তিনি এই মূর্তি তিনটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে দান করেন, তিনটি মূর্তিই মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী মহকুমার সাগরদীঘার নিকট হইতে প্রাপ্ত।

কবির দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে ১৩১৬ বঙ্গাব্দের সপ্তম মাসিক অধিবেশনে ২৬শে অগ্রহায়ণ রবিবার (১২ই ডিসেম্বর, ১৯০৯) অপরাহ্ন ৫টায় এই মূর্তি তিনটি পরিষৎ সদস্যগণের নিকট প্রদর্শিত হয়। সভায় মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, কবি অক্ষয়কুমার বড়াল, অধ্যাপক বিজয়চন্দ্র মজুমদার, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, দুর্গা-নারায়ণ সেনশাস্ত্রী, অধ্যাপক যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, ডাঃ পশুপতিনাথ ঘোষ, ললিতচন্দ্র মিত্র, চারুচন্দ্র বসু, বাণীনাথ নন্দী, নরসিদন্জী, নবকৃষ্ণ ঘোষ, রামকমল সিংহ, সম্পাদক রামেন্দ্রশুন্দর ত্রিবেদী, সহঃ-সম্পাদক-ত্রয় হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও ব্যোমকেশ মুস্তফীসহ ৫৯জন সুধী ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সাগরদীঘী হইতে প্রাপ্ত এই ছলভ বিষ্ণুমূর্তি তিনটির সহিত আরও কয়েকটি মূল্যবান প্রত্নবস্তু এই সভায় প্রদর্শিত হয়। পরিষদের পুরাতন কার্য্যবিবরণের নথি হইতে ঐ অধিবেশনে মূল্যবান প্রত্নবস্তুসমূহ-প্রদর্শন-সংক্রান্ত বিবরণটি উদ্ধৃত হইল :

“৫। অতঃপর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কান্দী-নিবাসী শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন সিংহ মহাশয়ের নিকট হইতে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রশুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় কর্তৃক সাহিত্য পরিষদের জন্ত সংগৃহীত

তিনটি ধাতুমূর্তি প্রদর্শন করেন। এই তিনটি মূর্তিমধ্যে দুইটি মূর্তি Indian Museum বা British Museumএ নাই। এই মূর্তিগুলি সম্ভবতঃ লক্ষ্মণসেনের সময়ের। এই মূর্তিত্রয়ের একটি বিষ্ণুমূর্তি ও একটি বোধিসত্ত্বমূর্তি ও বিষ্ণুমূর্তির মাঝামাঝি কোন মূর্তি এবং তৃতীয় মূর্তিটি কাহার তাহা এখনও ঠিক করিয়া বলা যায় না। তৎপরে রাখালবাবু মিসেস্ জোন্স (Mrs. Jones) কর্তৃক প্রেরিত প্রস্তরমূর্তি ও বুদ্ধগয়ায় তাঁহার নিজ সংগৃহীত কতকগুলি মৃন্ময় ছাঁচের প্রতিমা (Seal) প্রদর্শন করেন। গরিব তীর্থযাত্রীগণ এইরূপ seal ব্যবহার করিত। অতঃপর পরিষদের পুথিসংগ্রাহক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় কর্তৃক প্রেরিত চৈতন্যদেবের হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি এবং সম্রাট্ শাহ আলমের সময়ের তাম্রমুদ্রা ও অপর কতকগুলি মুদ্রা রাখালবাবু প্রদর্শন করেন। ফরিদপুর হইতে শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ খটক মহাশয়ের প্রেরিত একটি কামান শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফা কর্তৃক প্রদর্শিত হয়।

এই প্রদর্শন-প্রসঙ্গে সম্পাদক মহাশয় জানান যে, রাখালবাবু কর্তৃক প্রদর্শিত মুদ্রাগুলি তিনি নিজে উপহার প্রদান করিয়াছেন ও মিসেস জোন্স অনেক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া বিহার অঞ্চল হইতে বৌদ্ধমূর্তিগুলি পরিষদে প্রেরণ করিয়াছেন। রাখালবাবু ও মিসেস জোন্সএর ধন্যবাদের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।”

এই সভায় সম্পাদক রামেন্দ্রশুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করেন।

রমেশচন্দ্রের মৃত্যুর পর ভাগলপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশনে পরিষৎ সম্পাদক রামেন্দ্রশুন্দর ত্রিবেদী বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে প্রস্তাবিত “সারস্বত ভবন” স্বর্গীয় রমেশচন্দ্রের স্মৃতিচিহ্নরূপে “রমেশচন্দ্র সারস্বত

ভবন” নামে প্রতিষ্ঠাপিত করার জন্য সমস্ত ভারতবর্ষের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। বরোদার সয়াজী রাও গায়কোবাড় এক্ষণে ৫০০০ টাকা দান করেন। ১৩২১ বঙ্গাব্দে (১লা এপ্রিল ১৯১৫) মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ‘রমেশ-ভবন’ নির্মাণের জন্য পরিষদ-ভবন সংলগ্ন ৭ কাঠা জমি দান করেন। লর্ড কারমাইকেল ১৩২৩ বঙ্গাব্দে রমেশ-ভবনের ভিত্তি স্থাপনা করেন, পরিষদের চিত্রশালাধ্যক্ষ ইঞ্জিনিয়ার মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৩২৮ বঙ্গাব্দে নির্মাণকার্য শুরু হয় ও ১৩৩১ বঙ্গাব্দে নির্মাণ-কার্য শেষ হয়। ২১শে অগ্রহায়ণ ১৩১৫ তারিখে পরিষদের নবগৃহ প্রবেশের পর যে সকল প্রত্নবস্তু ‘সারস্বত ভবনে’র জন্য ও পরিষদের চিত্রশালার জন্য সংগৃহীত হইয়াছিল সেগুলি ১৩৩১ বঙ্গাব্দে “রমেশ-ভবনে” সুবিন্যস্ত করা হয় এবং সাগরদ্বীপী হইতে প্রাপ্ত এই দুর্লভ বিষ্ণুমূর্তি তিনটিও রমেশ-ভবনে স্থাপিত হয়।

১৩১৬ বঙ্গাব্দে (১৯০৯ খ্রীঃ) রাখালদাস এই মূর্তি তিনটির প্রথমটিকে বিষ্ণুমূর্তি, দ্বিতীয়টিকে বোধিসত্ত্ব ও বিষ্ণুমূর্তির মাঝামাঝি কোনও মূর্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন এবং তৃতীয় মূর্তিটি কাহার সে সম্বন্ধে সুনিশ্চয় হন নাই। ১৩১৮ বঙ্গাব্দে (১৯১১ খ্রীঃ) পরিষৎ সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী-লিখিত ভূমিকা-সম্বলিত সহকারী সম্পাদক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত “Descriptive List of Sculptures & Coins in the Museum of the Bangiya Sahitya Parishad” গ্রন্থে রাখালদাস প্রথম মূর্তিটি ত্রিবিক্রম বিষ্ণু, দ্বিতীয় মূর্তিটি ললিতক্ষেপ মূর্তায় উপবিষ্ট বিষ্ণু সিদ্ধান্ত করেন এবং তৃতীয় মূর্তিটি—সপ্তনাগছত্র-শোভিত ষড়্ভুজ-সমন্বিত—সম্ভবত কোনও বৌদ্ধ দেবতার মূর্তি বলিয়া মনে করিলেও উহার বামদিকের দুইটি হস্তে গদা ও শঙ্খ এবং তৃতীয় হস্তে দণ্ডোপরি গরুড়-মূর্তি লক্ষ্য করেন। বিষ্ণুমূর্তির লক্ষণগুলি

এই তৃতীয় মূর্তিটিতে রাখালদাসই প্রথম উল্লেখ করেন। সাগর-দীঘীর এই তৃতীয় মূর্তিটির পিছনে উৎকর্ষ লিপি রাখালদাস পাঠ করেন :

“স্ববাচক নল্লোদাসস্মৃত

পন দানপতি ইদম্ দেয়ো ধর্মঃ ।”

[স্মৃবক্তা, নন্দদাসপুত্র, দাতা পন কর্তৃক ধর্মার্থে ইহা প্রদত্ত ।]

রাখালদাসের ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯১১ উইলিয়ম রদেনস্টাইন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আসিয়া এই মূর্তি তিনটির অপূর্ব সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া লিখিয়া-
ছিলেন :

“I have just seen 3 bronzes in this small museum which it would be impossible to match, I think, anywhere in the world. I cannot conceive anything more noble and beautiful to exist than these 3 figures ; and I think the day will come when full justice will be done to the genius of the people which has produced them and so many other admirable things”.

William Rothenstein

President, Society of India

February 21, 1911.

Great Britain and Ireland

E. B. Havell ঙ্গ. বি. হ্যাভেল, Percy Brown পার্সি ব্রাউন, আনন্দ কে, কুমারস্বামী প্রমুখ শিল্পরসিকগণ এই অপূর্ব-সুন্দর মূর্তি তিনটির শিল্পকলা ও বৈশিষ্ট্যের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন।

সাগরদীঘী হইতে প্রাপ্ত এই তিনটি বিষ্ণু-মূর্তিই গোড়-বঙ্গের পাল-যুগের খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের শিল্পকলার অপূর্ব নিদর্শন।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে পরিষদের চিত্রশালাধ্যক্ষ মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় পরিষৎ প্রকাশিত “Handbook to the

Sculpture in the Museum of the Bangiya Sahitya Parishad” গ্রন্থে এই বিষ্ণুমূর্তি তিনটির চিত্র (Plates XXIV, XXV, XXVI) প্রকাশ করেন ও ইহাদের পরিচয় প্রদান করেন।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী হইতে প্রকাশিত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের “Eastern Indian School of Mediaeval Sculpture” গ্রন্থে মূর্তিগুলির আলোচনা ও চিত্র প্রকাশিত হয়।

এই অপূর্ব-সুন্দর বিষ্ণুমূর্তি তিনটি ১৯৪৭-৪৮ খ্রীঃ লণ্ডনে Royal Academy of Art রয়েল একাডেমি অফ আর্ট কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক শিল্প-প্রদর্শনীতে বঙ্গায় সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রেরিত ও প্রদর্শিত হয় এবং বিশ্ব-শিল্প-রসিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

দুর্ভাগ্যক্রমে উল্লিখিত তিনটি মূর্তির মধ্যে তৃতীয় মূর্তিটি ষড়ভুজ শ্রবীকেশ বিষ্ণুমূর্তিটি ১৭ই ফাল্গুন ১৩৬৩ (১লা মার্চ ১৯৫৭) রমেশ-ভবনের নিম্নতলস্থ প্রদর্শনী-কক্ষ হইতে চুরি যায়। সাগরদৌঘী হইতে প্রাপ্ত তিনটি বিষ্ণুমূর্তির মধ্যে এইটিই ছিল সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, আয়তন ১'-১৩" ইঞ্চি। আষাঢ় ১৩৬৪ বঙ্গাব্দে (জুন ১৯৫৭) এই অপহৃত মূর্তিটি কলিকাতার জনৈক বিশিষ্ট শিল্প-সংগ্রহকারী ধনাঢ্য ব্যক্তির নিকট হইতে ৫০০ পাঁচ শত টাকা মূল্যে পরিষদ ক্রয় করেন এবং পরিষৎ মন্দিরে পুনরায় আনয়ন করেন।

কয়েক বৎসর পরে ১৪ই জানুআরি ১৯৬৫, ৩০শে পৌষ ১৩৭১, বৃহস্পতিবার, পৌষ-সংক্রান্তির মধ্যরাত্রে পরিষদভবনের দ্বিতলে চিত্রশালার তালা ভাঙিয়া সাগরদৌঘীর অপর ছুইটি বিষ্ণুমূর্তি, উপরিলিখিত প্রথম ও দ্বিতীয় বিষ্ণুমূর্তি—দণ্ডায়মান ত্রিবিক্রম বিষ্ণুমূর্তি (সাগরদৌঘী বিষ্ণুমূর্তির মধ্যে এইটিই ছিল উচ্চতম ২'-১৫") ও ললিতক্ষেপ মুদ্রায় পূর্ণপ্রক্ষুটিত পদ্মে (মহাস্বজপীঠে) উপবিষ্ট শ্রবীকেশ বিষ্ণুমূর্তি—চুরি হয়। এই তৃতীয় মূর্তিটির পাদপীঠ এখনও

পরিষদের চিত্রশালায় আছে। পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগে সংবাদ দেওয়া হয় কিন্তু মূর্তি দুইটির পুনরুদ্ধার সম্ভব হয় না।

Unesco ও Interpol-এ এই অপহরণ-সংক্রান্ত কোনও তথ্য অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় নাই।

১৯৭৪ সালের জানুআরি-ফেব্রুআরি মাসে বর্তমান পরিষৎ সম্পাদক, পরিষৎ সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক শ্রীমুন্সীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অনুমতি লইয়া, পরিষদের চিত্রশালায় বর্তমানে রক্ষিত এবং চিত্রশালা হইতে অপহৃত বিষ্ণুমূর্তির কয়েকখানি আলোকচিত্র বিশ্বের কয়েকটি বিখ্যাত মিউজিয়মে পাঠান এবং অমুরূপ বা সদৃশ কোনও বিষ্ণুমূর্তি সেখানে থাকিলে তাহার বিবরণ জানাইবার অনুরোধ করিয়া পত্র লেখেন। আমেরিকার বস্টন মিউজিয়ম অফ ফাইন আর্টসের কিউরেটর য়ান ফন্টেন (Jan Fontein) ২৭শে মার্চ ১৯৭৪ তারিখের পত্রে পরিষৎ সম্পাদককে জানান যে প্রেরিত আলোকচিত্রগুলির মধ্যে একটি বিষ্ণুমূর্তির অমুরূপ মূর্তি (ঈষৎ বিকৃত অবস্থায়) বস্টন মিউজিয়মে আছে এবং ঐ মূর্তি ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারা ক্রয় করিয়াছেন। বস্টন মিউজিয়মের বার্ষিক বিবরণে ঐ বিষ্ণুমূর্তির যে আলোকচিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে উহা পরিষদের চিত্রশালা হইতে ১৪ জানুআরি ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে অপহৃত সাগরদীঘীর উচ্চতম বিষ্ণুমূর্তি; বিক্রয়ের পূর্বে মূর্তির পাদদেশে একটি ক্ষুদ্র প্রণত মূর্তি অপসারিত হইয়াছে। বস্টন মিউজিয়মের কিউরেটর তাঁহার ২৭শে মার্চ ১৯৭৪ তারিখের পত্রে পরিষৎ সম্পাদককে লিখেন :

“the bronze had suffered minor damage before it reached this museum. The small kneeling figure at the base has disappeared, and the statue of one of the attendants has been detached from its base.”

মূর্তিটি পরিষদ হইতে অপহরণের পর পাঁচ বৎসর ভারতে

লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল এবং বিভিন্ন শিল্পসামগ্রী-বিক্রেতার হাত ঘুরিয়া পরে উহা আমেরিকায় নীত হয় ও বস্টন মিউজিয়ম কর্তৃপক্ষের নিকট ৫০ হাজার ডলার (চার লক্ষ টাকা) মূল্যে বিক্রীত হয়। ১৯৩৩ খ্রীঃ দিল্লী হইতে প্রকাশিত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের “Eastern Indian School of Mediaeval Sculpture” গ্রন্থে প্রকাশিত ঐ মূর্তির চিত্র (Plate LXVIIc) দেখিয়া বস্টন মিউজিয়ম কর্তৃপক্ষ উহা ক্রয় করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ গ্রন্থে মূর্তিটি যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পত্তি তাহা উল্লেখ না থাকায় বস্টন মিউজিয়ম কর্তৃপক্ষ পরিষদ হইতে মূর্তি অপহরণের পুলিশ-রিপোর্ট এবং পরিষদের স্বত্ব-স্বামিত্ব প্রমাণের অন্যান্য দলিলপত্র প্রেরণের অনুরোধ জানান। এতৎসংক্রান্ত পুলিশ-রিপোর্ট অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া না গেলেও পরিষদের ৬৫ বৎসরের পুরাতন নথিপত্র এবং ২৫ বৎসর পূর্বকার সংবাদপত্রাদির বিবরণ ও আলোকচিত্রাদি হইতে পরিষদের স্বত্ব-স্বামিত্বের প্রমাণের নিদর্শন সঙ্কলন করিয়া পরিষৎ সম্পাদক বস্টনে পাঠান। পরিষদের স্বত্ব-স্বামিত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে পরিষদের মূর্তি পরিষৎ মন্দিরে প্রত্যর্পণের জন্য সম্পাদকের অনুরোধে বস্টন মিউজিয়ম কর্তৃপক্ষ অসাধারণ সৌজন্য প্রদর্শন করেন এবং সকল পক্ষের স্বার্থ রক্ষা করিয়া একটি চুক্তিপত্র সম্পাদনের পর পরিষৎ সম্পাদকের প্রস্তাব অনুযায়ী ওয়াশিংটনে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের হস্তে উহা সমর্পণ করিতে স্বীকৃত হন এবং পরিষৎ সম্পাদককে লেখেন :

“The museum regrets to find one of its finest Indian bronzes to have been stolen, but we trust its return will redress the situation.”

বস্টন মিউজিয়ম ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিপত্র এই নিবন্ধের শেষে প্রকাশিত হইল।

চুক্তিপত্র সম্পাদিত হইলে পরিষৎ সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক শ্রীমুণীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তার জন্য ১৩ই জুন ১৯৭৪ পত্র লেখেন এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া তাঁহার ২৪শে জুন ১৯৭৪ তারিখের পত্রে জানান যে ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রকে ও আমেরিকায় ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের দফতরে তিনি এ বিষয়ে নির্দেশ প্রেরণ করিতেছেন এবং বস্টন মিউজিয়মের কিউরেটর Jan Fonteinকে তিনি এ বিষয়ে ধন্যবাদ-জ্ঞাপক পত্র পাঠাইতেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত আস্তুনি লন্সলট দিয়াস ১২ই জুলাই ১৯৭৪ রাজভবনে পরিষৎ সম্পাদকের সহিত আলোচনাকালে এতৎ সংক্রান্ত কাগজ-পত্র দেখিয়া প্রয়োজনীয় সাহায্যের ব্যবস্থা করেন।

বস্টন মিউজিয়মের কিউরেটর ওয়াশিংটনে ভারতীয় দূতাবাসে একটি অমুষ্ঠানে ভারতের রাষ্ট্রদূত টি, এন, কাওলের T. N. Kaul-এর হাতে বিষ্ণুমূর্তিটি সমর্পণ করেন। ভারতের রাষ্ট্রদূত বস্টন মিউজিয়ম কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলেন :

“To art collectors this may be worth \$ 50,000 ; to us it is priceless. ...

I hope this example will be followed by others and other countries.”

যে শিল্প-বিক্রেতা মূর্তিটি বস্টন মিউজিয়মে বিক্রয় করিয়াছিলেন তিনি পরিষৎ সম্পাদকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কিভাবে মূর্তি তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল তাহা ব্যাখ্যা করিবেন বলিয়া বস্টন মিউজিয়মের কিউরেটর পরিষৎ সম্পাদককে লিখিয়াছিলেন। ঐ শিল্প-বিক্রেতা অজ্ঞাবধি পরিষৎ সম্পাদকের সহিত সাক্ষাৎ করেন

নাই; তিনি বস্টন মিউজিয়ামের কর্তৃপক্ষকে মূর্তির মূল্য স্বরূপ ৫০ হাজার ডলার (৪ লক্ষ টাকা) প্রত্যাৰ্ণ করিয়াছেন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সহায়তায় ভারত সরকারের বায়ে মূর্তিটি নিউ ইয়র্ক হইতে বিমান যোগে দিল্লীতে আনীত হয় এবং পরিষৎ সম্পাদকের হস্তে উহা অর্পিত হইলে দিল্লী হইতে উহা বিমান-যোগে কলিকাতায় আনীত হয়। ভারতবর্ষ হইতে অপহৃত, বিদেশে নীত ও বিক্রীত প্রাচীন মূর্তির ভারতে প্রত্যাবর্তনের ইহাই প্রথম দৃষ্টান্ত।

পশ্চিমবঙ্গের মহামাণ্ড্য রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত আত্মনি লল্ললট দিয়াস পরিষদ ভবনে অদ্য ২৯শে মাঘ ১৩৮১, ১১ই ফেব্রুআরি ১৯৭৫, দশ বৎসর পূর্বের অপহৃত বিষুমূর্তিটি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতেছেন। বস্টন মিউজিয়ামের কর্তৃপক্ষ যে অসামান্য সৌজন্য প্রদর্শন করিয়া বিষুমূর্তিটি পরিষদে প্রত্যাৰ্ণ করিয়াছেন এবং প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত আত্মনি লল্ললট দিয়াস বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতি যে আন্তরিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন ও তৎপরতার সহিত যে সহায়তা করিয়াছেন, সেজন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ তথা সমগ্র দেশবাসী তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ ॥

শ্রীমদনমোহন কুমার

সম্পাদক

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ॥

MUSEUM OF FINE ARTS

BOSTON · MASSACHUSETTS · 02115

Office of the Director

This agreement is made this 22nd day of May 1974, by and between the Bangiya Sahitya Parisad of Calcutta, India, (the "Parisad") and the Museum of Fine Arts of Boston, Massachusetts (the "Museum"). This agreement arises through the purchase in 1970 of a bronze image of Vishnu cast in Bengal in approximately the eleventh century. The Museum has recently discovered that this image is the property of the Parisad and was stolen from it in early 1965. This agreement is made to expedite and insure the safe and speedy return of the image to the Bangiya Sahitya Parisad.

It is agreed that the Museum may accept all written directions from the Indian Embassy in Washington, D.C. with regard to return of the image and that compliance with these instructions shall operate as a full discharge and release to the Museum by the Parisad. The Museum shall pay all expenses related to the delivery of the object to the Embassy in Washington if such a delivery is requested.

In witness whereof the parties hereto set their hands and seals this 22nd day of May 1974.



BANGIYA SAHITYA PARISAD

By: Madan Mohan Coomer
Madan Mohan Coomer, Hon'y. Secretary

SEAL OF
MUSEUM OF FINE ARTS
BOSTON, MASS.
FOUNDED A.D. 1870

MUSEUM OF FINE ARTS

By: Merrill C. Rueppel
Merrill C. Rueppel, Director



বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ মন্দিরে ২৯ মার্চ ১৯৮১ বিষ্ণুমূর্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা উৎসবের পার্বে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাঠ
 ত্রিমুখ আশ্বিনী লঙ্গলট দ্বিয়ারের হস্তে পরিষৎ-সম্পাদক কটক প্রদত্ত মৌল-মোহরকরা পামে বিষ্ণুমূর্তির আধারের চাঁদ ও
 এতৎসংক্রান্ত দলিলপত্র মাননীয় রাজ্যপাল পরিবর্শন করিতেছেন, পাশ্বে আচার্য্য হুনোত্রিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও আচার্য্য
 ঐরমেশচন্দ্র মজুমদার, পশ্চাৎপটে আচার্য্য্য রামেন্দ্রহৃদয় ত্রিবেদীর ও পুণ্যহোত্বে রমেশচন্দ্র দত্তের তৈলচিত্র।



মাননীয় রাজাপাল কর্তৃক বিষ্ণুমূর্তির সীলমোহরকরা আধার উন্মোচনের পর মাননীয় রাজাপাল শ্রীযুক্ত আশুনি লঙ্গলট দিয়ারা ও পরিবৎসম্পাদক অধ্যাপক শ্রীমদনমোহন কুমার আধার হইতে বিষ্ণুমূর্তি উত্তোলন করিয়া সমবেত দর্শকগণের সমক্ষে প্রদর্শন করিতেছেন।



পরিষৎ মন্দিরে বিষ্ণুমূর্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে মাননীয় রাজাপাল শ্রীযুক্ত আব্দুল লসলট দিয়াস রমেশ-ভবনের সভাকক্ষে ভাষণ দিতেছেন। রাজাপালের পার্শ্বে পরিষৎ সভাপতি ও পরিষৎ সম্পাদক, যেতপদ্মাসনে স্থাপিত বিষ্ণুমূর্তি, পশ্চাৎপটে পুণ্যলোক রমেশচন্দ্র দত্তের তৈলচিত্র।



বিশ্বমূর্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা উৎসবের পর সভাকক্ষ ত্যাগের পূর্বে মাননীয় রাজ্যপাল রূপার বাটি হইতে বেতচন্দন লইয়া বিশ্বমূর্তির চরণ চর্চিত করিতেছেন ও প্রণাম নিবেদন করিতেছেন। বিশ্বমূর্তির পশ্চাতে জাতীয় আচাৰ্য্য শ্রীহরীতীকুমার চট্টোপাধ্যায়, রাজ্যপালের পার্শ্বে পরিব্রজ সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীমদনমোহন কুমার, পশ্চাৎপটে মনীষী বঙ্কিমচন্দ্রের তৈলচিত্র।



বাঁকুড়া জেলায় তালডাংরা থানার হাড়মাসড়া গ্রামে পুনরুৎখার সময় প্রাপ্ত চতুর্ভুজা শক্তিমূর্তি ।
পরিবৎ সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীমদনমোহন কুমারের হস্তে হাড়মাসড়া গ্রামের যুবকগণ শ্রীপ্রভুসকুমার
রায়, শ্রীসোমনাথ রায় ও শ্রীযুতাজয় রায় কর্তৃক ৯ চৈত্র ১৩৮১ (২৩ মার্চ ১৯৭৫) তারিখে প্রদত্ত ।



আলোকচিত্র : শ্রীঅজিতমোহন গুপ্ত]

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহশালায় হারানো বিষ্ণুমূর্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

ফ্রেব্রুয়ারি ১২, ১৯৭৫।

রাজ্যপাল ত্রীযুক্ত আস্তনি লন্ডলট্ দিয়াস মহোদয়ের ভাষণ।

আচার্য্য ত্রীহনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, আচার্য্য মজুমদার, অধ্যাপক কুমার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশিষ্ট সদস্যবর্গ এবং বন্ধুগণ,

আজ সন্ধ্যায় এই ক্ষুদ্র কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ অহুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছি, এ আমার পরম সৌভাগ্য বলে মনে করি। একাদশ শতাব্দীর যে ব্রোঞ্জ বিষ্ণুমূর্তি এখানকার সংগ্রহশালায় রক্ষিত ছিল, কিন্তু অপহৃত হয়ে সমুদ্রপারে চলে গিয়েছিল, সেটি পুনরুদ্ধারের পর আজ তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা-উৎসব।

সুতরাং এই উপলক্ষ্যটির বিশেষ গুরুত্ব আছে। গুরুত্ব আছে, কারণ, ধর্ম ও হৃদয়ানুভূতির দিক থেকে মূল্যবান একটি মহার্ঘ সম্পদের পুনরুদ্ধার এবং সংগ্রহশালায় তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হ'ল। গুরুত্ব আছে, কারণ বহু-আরাধ্য দেবতা আজ স্ব-গৃহে ফিরে এলেন। আমার সম্মুখে নেই যে এই পবিত্র সারস্বত মন্দিরের অত্মরাগী সকলেই ঘটনাটিকে মহা আনন্দের বিষয় বলে গণ্য করবেন।

কি ক'রে এটি এবং আরও দু'টি মূর্তি অপহৃত হয়েছিল, কি ক'রে তাদের মধ্যে একটি মূর্তি ফিরে পাওয়া যায়, এবং বর্তমানে পুনরুদ্ধার করা যে ব্রোঞ্জ মূর্তিটি সংগ্রহশালায় পুনঃপ্রতিষ্ঠার সৌভাগ্য আমি লাভ করেছি, এটিই বা কেমন করে উদ্ধার হ'ল, তার চমকপ্রদ নেপথ্যকাহিনী অধ্যাপক কুমার একটু আগেই আপনাদের শুনিয়েছেন। আরও বিস্তৃত বিবরণ আজ এই উপলক্ষ্যে পরিষৎ-প্রকাশিত পুস্তিকাধিনিতে স্থান পেয়েছে।

আজ এই উপলক্ষ্যে সর্বসমক্ষে প্রথম অভিনন্দন জানানো কর্তব্য অধ্যাপক কুমারকে; বহু পরিচয় ও কষ্ট করে তিনি গবেষণা ও অন্বেষণ করে এটি খুঁজে বার করেছেন, প্রথম নৃত্ত সন্ধানের পর অধ্যাপকের সঙ্গে তার অন্বেষণ করেছেন, আর তারই ফলে এই অমূল্য সম্পদ আমরা ফিরে পেয়েছি। পরিষৎ সদস্যগণ, বসন্ত: সমগ্র দেশবাসী এই অমূল্য সম্পদ পুনরুদ্ধারের জন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতার ঋণে ঋণী।

বিভীষত: এই উপলক্ষ্যে আমি সাধারণের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাতে চাই বসন্ত মিউজিয়মের কর্তৃপক্ষকে; তাঁদের সহযোগিতা ও অঙ্গগ্রহ না পেলে এই মহামূল্য সম্পদ উদ্ধার কোনদিন সম্ভব হ'ত না। বিশেষত: বসন্ত চাকরলা সংগ্রহশালার তত্ত্বাবধায়ক

ডঃ ফটেন এবং অধিকর্তা ডঃ ক্যাপেলের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। এই উদ্ধার-সম্পর্কিত তাঁদের পত্রাবলীর ফটো-প্রতিলিপি পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
 ব্রোঞ্জ মূর্তিটির পুনঃ-প্রাপ্তিতে সহায়তার জ্ঞাত বস্টন চারুকলা সংগ্রহশালার কর্তৃস্থানীয় এই দুই ব্যক্তির নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা অপরিণীম।

আপনারা ইতিপূর্বেই অবগত হয়েছেন যে আমাদের তিনটি মূর্তি ছিল। পূর্বে একটির উদ্ধার হয়েছিল, এখন একটির হ'ল, তৃতীয় মূর্তিটি এখনও রয়েছে কোথাও অজ্ঞাতবাসে। জানিনা তৃতীয় মূর্তিটি আবিষ্কারের জ্ঞাত অধ্যাপক কুমার তাঁর গবেষণার ও অল্পসন্ধানের স্বজ্ঞাল বিস্তার করেছেন কিনা। দেশে বা বিদেশে কোথাও না কোথাও মূর্তিটি নিশ্চয়ই আছে। এই সুযোগে আমি উক্ত মূর্তির বর্তমান মালিকের কাছে আবেদন জানাই, তিনি তাঁর গায়া কাজ করুন, মূর্তিটি এখানকার সংগ্রহশালার ফিরিয়ে দিন। আমি নিশ্চিত যে কেউ যদি মূর্তিটির বর্তমান অবস্থান সম্বন্ধে কোন খোঁজখবর পান তবে অল্পগ্রহ ক'রে পরিষৎ কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেবেন, যাতে সেই স্বত্র ধরে তৃতীয় মূর্তিটিও ফিরে পাওয়া যেতে পারে। এই মূর্তি আহরণ এবং পুনরুদ্ধারের ঘটনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে মূল্যবান শিল্পদ্রব্য নিয়ে চোরাই ব্যবসা এখনও চলছে এবং বেশী পরিমাণেই চলছে। বহু পুরাকীর্তি এবং শিল্প-সামগ্রী কোন না কোন রকম চোরা-পথে এদেশের বাইরে চলে যাচ্ছে। এমন মাস যায় না যখন মন্দির বা মিউজিয়ম থেকে কোন না কোন বস্তু চুরি যাবার খবর আমরা কাগজে না পড়ি।

আমি এখানে দুটি মিউজিয়ম বা সংগ্রহশালার—ভারতীয় যাদুঘর ও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সংগ্রহশালার অধিপাল (Chairman), সে দুটি মিউজিয়াম থেকেও চৌধ ও অপহরণের ফলে কতকগুলি জিনিস আমরা হারিয়েছি। ক্রিষ্টীর বা সাদবি'র নিলাম-ঘরে ভারতের মূল্যবান প্রত্নবস্তুর নিলামের খবরও আমরা প্রায়ই পড়ি, কিন্তু সেগুলির হস্তান্তরে কিছু করবার ক্ষমতা নেই বলে নিজেদের বড় অসহায় বোধ করি।

আমি আনন্দিত যে এ বিষয়ে ক্রমশঃ জনমত গড়ে উঠছে এবং যে সব জিনিস সমুদ্র-পারে চলে গিয়েছে তার পুনরুদ্ধারে সরকার উদ্যোগী হয়েছেন। বস্তুতঃ আমার ধারণা, এ ব্যাপার ধামতে পারে তখনই, যখন জনসাধারণ আরও সতর্ক হবে, যখন জনমত দৃঢ়ভাবে স্থির করবে যে—প্রথমতঃ এ-জাতীয় মূল্যবান শিল্পদ্রব্যের আভ্যন্তরিক কেনা-বেচা চলতে দেওয়া হবে না; যদি কোথাও অবৈধ কেনা-বেচা হয় তবে অবিলম্বে কর্তৃপক্ষকে সে সংবাদ জানিয়ে দিতে হবে; শুধু তাই নয়, বৈধভাবেও এ ধরনের জিনিস বেসরকারী ক্ষেত্রে হস্তান্তরিত হ'লে সেরূপ ঘটনা সংশ্লিষ্ট সরকারী মহলের নজরে আনা উচিত, মুখ্যতঃ মিউজিয়ম বা এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের গোচরে আনা উচিত, যাতে অপরকে বিক্রয়ের পূর্বে সেখানকার কর্তৃপক্ষ সেগুলি গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের প্রথম সুযোগ পান।

মিউজিয়ম বা সংগ্রহশালাগুলিকে পুরাবস্তু ও শিল্পসামগ্রী কেনবার জ্ঞাত নির্দিষ্ট কিছু

অর্থ দেওয়া হয়। কাজেই এসব জিনিস কেনবার সুযোগ প্রথম তাঁদেরই পাওয়া উচিত।

এইসব শিল্প-সামগ্রী গোপনে বিদেশীদের হাতে চলে না যায়, এ বিষয়ে নিশ্চিত ব্যবস্থার জ্ঞান জনসাধারণের সতর্ক দৃষ্টিই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন। অনতিকাল পূর্বে স্থানীয় সংবাদপত্র-গুলিতে একটি বিজ্ঞাপন দেখেছি, তাতে একজন বিদেশী আগন্তুক ঘোষণা করছেন যে তিনি প্রত্নবস্তু ও শিল্পসামগ্রী ক্রয়ে আগ্রহী। এইরূপ ক্ষেত্রেই জনসাধারণের সতর্কতা এবং জনমত কার্যকর হ'তে পারে এবং আমাদের ঐতিহ্যমণ্ডিত মূল্যবান দ্রব্যগুলি দেশের অভ্যন্তরে রক্ষিত হতে পারে।

আমার মনে হয়, কেন্দ্রীয় সরকার এবং দেশাধুয়গী ব্যক্তিদের কর্তব্য উপযুক্ত একটি অর্থভাণ্ডারসহ জাতীয় 'গ্রাস' (ট্রাস্ট) গঠন করা যার উদ্দেশ্য হবে, ব্যক্তিগত সংগ্রাহকদের কাছ থেকে প্রত্নবস্তু, শিল্প-সামগ্রী, ঐতিহাসিক নথিপত্র, পুরাতন দলিল দস্তাবেজ প্রভৃতি পুরা-কীর্তিসংগ্রহে উত্তোগী হওয়া এবং সাধারণের সংগ্রহশালায় সেগুলি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা। এই ধরনের জাতীয় 'গ্রাস' (ট্রাস্ট) রাশিয়া, আমেরিকা, ইংলও এবং ইউরোপের নানাদেশে গঠিত হয়েছে।

মাস দুই আগে আমি মক্কোতে গিয়েছিলাম। সেখানে কতকগুলি মিউজিয়মে আমি গিয়েছি এবং পূর্বতন শাসনকালের বহু মনোহর সম্পদ সেখানে প্রদর্শিত হচ্ছে দেখেছি। সেখানে ১৯১৭ সালে প্রচারিত লেনিনের একটি অমুশাসনে জনসাধারণকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারা যেন বর্বরের ঝায় ঐসব স্মরণ্য বস্তুর ধ্বংস সাধন না করে, কোন প্রাসাদ বা ভবন বিকৃত না করে, কোন শিল্পকীর্তি বা জাতীয় সম্পদ অপসারণ না করে, বরং সরকারী মিউজিয়মে প্রদর্শনের ব্যবস্থার জ্ঞান যেন অমুরূপ জাতীয় সম্পদ তারা সরকারকে দিয়ে দেয়।

আমি আশা করি, চোরা-চালান কঠোরভাবে দমন করবার জ্ঞান এবং প্রত্নবস্তু ও মূল্যবান শিল্প-সম্পদ ব্যক্তিবিশেষের কাছে বিক্রয় সম্বন্ধে সরকারকে সংবাদ দেওয়ার জ্ঞান আইন প্রণয়নের অত্যাৱশ্যকতা কেন্দ্রীয় সরকার এখন উপলব্ধি করছেন। আরও কয়েকটি বিষয়ে সরকারের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন। সরকারী বা বেসরকারী যে সকল প্রতিষ্ঠানে মূল্যবান বস্তু, ছাপা পুঁথি বা ঐতিহাসিক নথিপত্রের সংগ্রহ আছে, তাদের হাতে যথোপযুক্তভাবে সম্পদ সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার জ্ঞান, সংগৃহীত দ্রব্যগুলির বর্ণনামূলক তালিকা প্রণয়ন, বিষয় নির্দেশ এবং সেগুলির আলোকচিত্র-গ্রহণের জ্ঞান অর্থদানের প্রয়োজন। নির্দিষ্ট কাল অন্তরে এই সমস্ত দ্রব্যাদির বিশেষত সাধারণ প্রতিষ্ঠানে ও মিউজিয়মে রক্ষিত দ্রব্যাদি—প্রত্যক্ষভাবে মিলিয়ে দেখা দরকার।

সংরক্ষণ ছাড়া আলোকচিত্র-সম্বন্ধিত প্রত্যেকটি বস্তুর তালিকাও পণ্ডিত ও গবেষকদের, পক্ষে সমান আবশ্যক। এই তালিকাগুলি যদি হাল-তারিখী up-to-date) না হয় এবং

সর্বদা হাল-তারিখী করে রাখা না হয়, তবে বিভিন্ন সংগ্রহশালায় ও গ্রন্থাগারে যে মূল্যবান সম্পদ অনেক সময়ে লুকিয়ে থাকে, পণ্ডিত ও গবেষকদের পক্ষে তার হাদিস পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। পুরোনো পুঁথি, পাণ্ডুলিপি এবং ঐতিহাসিক দলিল রক্ষার দিকে আমাদের আরও মনোযোগ দেওয়া উচিত। সম্প্রতি তামিলনাড়ুতে পুরাতন দ্রষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বা তারও পূর্ববর্তী প্রাচীন কতকগুলি ঐতিহাসিক দলিল নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। হয়তো আরও কোন কোন রাজ্যে এমনিতরো ঘটনা ঘটেছে। আমি মনে করি, কি রকম দলিল রক্ষণীয়, সে বিষয়ে সরকারী নির্দেশ অবিলম্বে ঘোষণার প্রয়োজন।

কয়েকটি মিউজিয়ম, লাইব্রেরি, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমি সংযুক্ত, আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমার ধারণা স্তাস-রক্ষা, সংরক্ষণ, তালিকা-প্রস্তুতি এবং প্রত্যেক জিনিস মিলিয়ে দেখার ব্যাপারে আমাদের মিউজিয়মগুলির কার্যকলাপ ভালোভাবে তদারক করবার জন্য একটি জাতীয় কমিসন গঠনের আশু প্রয়োজন। আমি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির কাছে আরও স্পষ্টরূপে করি যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির রক্ষার উদ্দেশ্যে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ও আত্মকূল্য সম্প্রসারণের আবশ্যক; যাতে তাঁদের সংগৃহীত অমূল্য সম্পদগুলি তাঁরা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে পারেন এবং প্রতিষ্ঠানটিকে স্বচ্ছভাবে পরিচালনা করতে পারেন তার জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা যেন তাঁরা পান।

এই সন্ধ্যায় আমি আপনাদের আর বেশী সময় নিতে চাই না। সাহিত্য পরিষদে ত্রোত্র বিক্ষুণ্ণিটির পুনঃপ্রতিষ্ঠা উৎসবে অংশ গ্রহণ করার আমন্ত্রণ পেয়ে আমি নিজেই ভাগ্যবান মনে করছি, সেই কথাই আর একবার উল্লেখ করি। আশা করি, এই বিক্ষুণ্ণিটি পুনঃপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে পরিষদের অমূল্য উত্তরাধিকার ও নিকৃৎ উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হবে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে প্রদত্ত মাননীয় রাজ্যপালের মূল ইংরেজী ভাষণটি ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস (USIS) ও ভয়েস অফ আমেরিকা (Voice of America) কর্তৃক টেপ রেকর্ডে গৃহীত ও শ্রীঅমিয়কুমার গাঙ্গুলীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

অনুবাদ : অধ্যাপক শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে অপহৃত বিষ্ণুমূর্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠা উৎসব

পরিষৎ সভাপতির ভাষণ

(২৯ মাঘ ১৩৮১, বুধবার ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫)

শ্রীস্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

আজ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্মরণীয় দিন। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের পাল-রীতির যে বিষ্ণুমূর্তি পরিষদের সংগ্রহশালা থেকে দশ বছর আগে চুরি গিয়েছিল এবং বিদেশে চোরাচালান করে ৫০ হাজার ডলারে, চার লক্ষ টাকায়, আমেরিকায় বিক্রি করা হয়েছিল, সেই অপহৃত বিষ্ণুমূর্তি পুনরুদ্ধারের পর আজ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত আস্তিনি লম্পলট দিয়াস মহোদয় আজকের এই শুভদিনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সেই মূর্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠা করবেন।

এই উপলক্ষ্যে একখানি পুস্তিকা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে মুদ্রিত হয়েছে, তাতে আমাদের মূর্তির ছবি আছে, মূর্তির সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য আছে; সেটি এই শুভদিনে আমি পরিষদের পক্ষ থেকে সাধারণ্যে প্রকাশ করছি এবং এই গ্রন্থের প্রথম কপিখানি মাননীয় রাজ্যপালকে পরিষদের পক্ষ থেকে সাদরে উপহার দিচ্ছি।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মদনমোহন কুমারকে অহুরোধ করছি তিনি স্বাগত ভাষণ পাঠ করবেন, পরিষদের সংগ্রহশালা সম্বন্ধে দু'চার কথা বলবেন, এবং এই মূর্তির ইতিহাস, কি করে এটি আমাদের কাছ থেকে বেরিয়ে গেল তার বিবরণ এবং যেটা তিনি বলেননি—তার নিজের আগ্রহ, অহুসঙ্কিসা ও চেষ্টায়—এবং সেই সঙ্গে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী মহোদয়ার সহায়তা এবং তৎপরতায় অপহৃত বিষ্ণুমূর্তি কিভাবে ফিরিয়ে আনা হল তা আজ সর্বসাধারণের কাছে প্রকাশ করার জন্ত। পরিষদের অপহৃত সম্পদ পুনরুদ্ধারের জন্ত সম্পাদক শ্রীযুক্ত মদনমোহন কুমার গত তিন বৎসর যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, নানা বিঘ্নবিপদ ও সমালোচনা তুচ্ছ করে অতন্ত্র চেষ্টা করেছেন তার জন্ত কেবল মাত্র পরিষদের সদস্য নন, বঙ্গবাসী তথা ভারতবাসী মাজেই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। এই মূর্তি পুনরুদ্ধারের জন্ত তিনি নানা সূত্র ধরে অহুসঙ্কান ও চেষ্টা করেছেন, আমাকে বার বার তিনি এ সম্বন্ধে নানা তথ্য ও তাঁর অহুমান ও অহুসঙ্কানের বিষয়ে অবহিত করেছেন। তাঁর চেষ্টা—তাঁর স্বপ্ন ও কল্পনা—আজ সফল হয়েছে, মূর্তি আজ আমাদের ঘরে ফিরে

এসেছে। বিভিন্ন মূর্তির ছবি তুলে আমার অল্পমতি নিয়ে তিনি নানা জায়গায়, বিশেষ বিভিন্ন সংগ্রহশালায় পাঠিয়েছেন এবং মূর্তি সন্ধান করে বের করার পর পরিষদের স্বস্ত-স্বামিত্ব প্রমাণ করার জন্ত যে সমস্ত পুরাতন তথ্য ও দলিল নানা জায়গা থেকে আশ্চর্য্য ভাবে খুঁজে বের করে তিনি বস্টন মিউজিয়াম থেকে মূর্তি-টি ফিরিয়ে আনার আয়োজনের পথ প্রস্তুত করেছেন, তার জন্ত তিনি প্রকাশে অভিনন্দনযোগ্য। তাঁকে আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জ্ঞাপন করি। এই সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র, ফোটোগ্রাফ এবং তথ্য প্রমাণ ইত্যাদি সহ তিনি ভারতের মূর্তি ভারতে ফিরিয়ে আনার জন্ত ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রতিবেদন পেশ করেন এবং তাঁর অহরোধ মত আমি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে একখানি পত্র দিই ভারতের প্রধানমন্ত্রী-রূপে এ-বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তার জন্ত। শ্রীমতী গান্ধী তৎক্ষণাৎ শ্রীযুক্ত মদনমোহন কুমারের প্রেরিত সমস্ত কাগজপত্র ফোটোগ্রাফ ও দলিল-পত্র দেখে সহায়তা করেন, ওয়াশিংটনে আমাদের রাষ্ট্রদূতকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন, বস্টন মিউজিয়ামের কিউরেটরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে চিঠি দেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ এবং আজ এই উপলক্ষ্যে সে কথা আমি বিশেষভাবে উল্লেখ করি।

বস্টন মিউজিয়ামের কর্তৃপক্ষকে তাঁদের সৌজ্ঞেয় জন্ম, আমাদের মূর্তি আমাদের কাছে ফিরিয়ে দেবার জন্য পরিষদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত আন্তনি লঙ্গলট দিয়াস পরিষৎ সম্পাদককে এ বিষয়ে নানা ভাবে সাহায্য করেছেন। এই উপলক্ষ্যে তাঁকেও আমাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

অধ্যাপক শ্রীমদনমোহন কুমার মূর্তি ফিরিয়ে আনার সময় এবং পরিষদে মূর্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত কলকাতার পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে বিশেষ সহায়তা পেয়েছেন। এই উপলক্ষ্যে কলকাতা পুলিশের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই।

মূর্তি ফিরিয়ে আনার পর পরিষদের সংগ্রহশালায় যেখানে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হবে পরিষৎ সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীমদনমোহন কুমার সেটির প্রয়োজনীয় সংস্কার ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য বিশেষ দরকারী কতকগুলি কাজ সম্পূর্ণ করিয়ে মূর্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠার আয়োজন করেন। আমাদের বাড়ি ভাঙা—তার প্রয়োজনীয় মেরামত করান হয়, ছাদের উপর দিয়ে সংগ্রহশালার বারান্দায় নামার সম্ভাবনা বন্ধ করার জন্ত বিস্তীর্ণ লোহার গ্রিল দিয়ে সে পথ আটকানো হয়, কোলাপসিবল্ গেট বসিয়ে সংগ্রহশালা সুরক্ষিত করা হয় এবং সংগ্রহশালার প্রত্যেকটি জানালা ও লোহার গরাদে পরীক্ষা করে সেগুলির পরিবর্তন ও সংস্কার করার পর মূর্তি পরিষদে পুনঃ প্রতিষ্ঠার আয়োজন সম্পাদক করেন। এই অত্যাবশ্যক কাজগুলি সম্পূর্ণ করার পর মাননীয় রাজ্যপালের সময়মত আজ শুভদিনে এই মূর্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। অন্তর্বর্তী কালে মূর্তি রক্ষার দায়িত্ব শ্রীযুক্ত মদনমোহন

কুমারকেই দেওয়া হয়েছিল, আমার নির্দেশ মতই তিনি মূর্তি তাঁর বাড়িতে অষ্টপ্রহর সতর্ক ও সযত্ন প্রহরায় রেখেছিলেন, মাননীয় রাজ্যপালের নির্দেশে কলকাতা পুলিশের নিরাপত্তা-বাহিনী তাঁকে এ বিষয়ে সর্ববিধ সহায়তা করেছেন। এই কথাগুলি আজ প্রকাশ্য ভাবেই আমি বলছি এই কারণে যে মূর্তি পুনরুদ্ধারের পর খবরের কাগজে নানা চিঠি বেরিয়েছে নানা সন্দেহ ও সংশয় প্রকাশ করে, সম্পাদক তার কোনও জবাব দেননি, সব সমালোচনা সম্পর্কে তিনি নারব ছিলেন।

ভারতের বিভিন্ন সংগ্রহশালা, মন্দির ও প্রকাশ্য স্থান থেকে বহু মূর্তি অপহৃত হয়েছে তাদের মধ্যে যেগুলি বিদেশে চোরাচালান হয়ে চলে গিয়েছে এ পর্য্যন্ত সরকারী বা বেসরকারী উদ্যোগে তার একটিও ভারতে ফিরিয়ে আনতে পারা যায়নি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এই অমূল্য বিষ্ণুমূর্তি ভারতে ফিরিয়ে আনার জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ আজ গৌরবান্বিত। পরিষৎ সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীমদনমোহন কুমারের অতন্ত্র চেষ্টায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমে সাগরপার থেকে—বিদেশে নীত ও বিক্রীত—যে অমূল্য ভারতীয় প্রত্নসম্পদ—সহস্র বর্ষ পূর্বের গোড়বজের পালরীতির ধাতুময় বিষ্ণুমূর্তি—ভারতে প্রথম ফিরে এসে এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহশালায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হল সেকথা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তথা আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হবার যোগ্য।

এখন আমি শ্রীযুক্ত মদনমোহন কুমারকে অহুরোধ করছি তিনি সভায় তাঁর স্বাগত ভাষণ পাঠ করুন ॥

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অপহৃত বিষ্ণুমূর্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠা উৎসবে নিবেদন

শ্রীমদনমোহন কুমার

আজকের এই পুণ্য অহুষ্ঠানে পূজনীয় সভাপতি মহাশয়ের আদেশ শিরোধার্য করে সমবেত স্বধীবন্দের নিকট পরিষদের পক্ষ থেকে আমি বিষ্ণুমূর্তি পুনরুদ্ধার সম্পর্কে কয়েকটি কথা নিবেদন করছি। সভাপতি মহাশয় নির্দেশ দিয়েছিলেন একটি স্বাগত ভাষণ সভায় পাঠ করার জ্ঞা। কিন্তু আজ সারাদিনের কর্মব্যস্ততায় আমি স্বাগত ভাষণ লেখার অবসর পাইনি, লিখতে আরম্ভ করে অল্প একটু লেখার পর লেখা শেষ করতে পারিনি, তাই মুখেই বলছি, তার জ্ঞা সভাপতি মহাশয়ের কাছে এবং আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

সাহিত্য পরিষদের অধিদেবতা বঙ্গবাণীকে প্রথমেই প্রণাম জানাই। বঙ্গভাষা, বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গসংস্কৃতির বিস্তৃত অবলুপ্ত পরিচয় পুনরুদ্ধারের জ্ঞা গত ৮২ বছর ধরে যে সব মনীষী অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, াদের স্বপ্নে সাহিত্য পরিষদ মন্দির প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে, তাঁদের সকলকে এই পুণ্য অহুষ্ঠান উপলক্ষ্যে প্রণাম জানাই। বঙ্গসংস্কৃতির অল্পসন্ধান করতে গিয়ে তাঁরা বঙ্গভূমির যৈড়স্থ্যময় রূপ দেখেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যে-রূপের বর্ণনা করেছিলেন তাঁর অনবচ্চ ভাষায়, বঙ্গভূমির সেই যৈড়স্থ্যময় রূপ—“মা যাহা ছিলেন”, “মা যাহা হইবেন”—সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতারা মাতৃভূমিতে দেখেছিলেন, তাই মাতৃভাষা এবং মাতৃভূমির পূজায় তাঁরা পরিষদ-প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই আত্মোৎসর্গ করে-ছিলেন। পরিষদের ৮২ বছরের ইতিহাসে তাঁদের স্বপ্ন ও সাধনা চিরদিন প্রেরণা যুগিয়েছে। এই জীর্ণ প্রাচীন গৃহে, স্বল্পালোকিত কক্ষে যখন আমরা কাজ করি তখন কত নিস্তর সন্ধ্যায় আমাদের চারপাশের মনীষী ও পূর্বসূরীদের এই প্রাচীন মর্মর মূর্তিগুলি, প্রলম্বমান এই পুরাতন তৈলচিত্রগুলি আমাদের প্রেরণা দেয়, তাঁদের সত্য আমাদের কর্মশক্তিকে নীরবে স্পর্শ করে। আজকের এই পুণ্য অহুষ্ঠানে তাঁদের সকলের শুভাশীর্বাদ প্রার্থনা করি।

নমস্কার জানাই মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত আস্তিনী লঙ্গলট্ দিয়াসকে। তিনি যে কী অপরিণীম প্রেমের চোখে, ভালবাসার চোখে এই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে দেখেছেন, তা আপনারা অনেকেই জানেন না। পরিষদের প্রয়োজনে যখনই সভাপতি মহাশয় বা আমি তাঁর দ্বারস্থ হয়েছি তাঁর সমস্ত কাজ ফেলে তিনি তখনই আমাদের সাহায্য করেছেন; এবং আজ যে এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা হচ্ছে এর পিছনে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত আস্তিনী লঙ্গলট্ দিয়াসের তৎপরতা,

আত্মকূল্য এবং সাহায্যই এটা সম্ভবপর করেছে। ছ'মাস আগে যেদিন মাননীয় রাজ্যপাল পরিষদের ৮২-তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এখানে এসেছিলেন সেদিন তিনি আমাদের চিত্রশালা (মিউজিয়ম) পুঁথিশালা ও লাইব্রেরির অমূল্য সম্পদ ও আর্থিক দুর্বস্থা দেখে যুগপৎ আনন্দ ও বেদনা বোধ করেছিলেন, তাঁর কণ্ঠে সেই আনন্দ ও বেদনা ঘোষিত হয়েছিল; অন্তরের প্রেরণায় স্বতঃপ্রসূত হয়ে, তিনি পরিষদের উন্নয়নের জন্ত দশ হাজার টাকা দান করেছিলেন। আমরা সেই দশ হাজার টাকা দিয়ে কাজ শুরু করেছি। গত কয় মাসে আমরা কিছু কিছু দুর্বস্থা দূর করতে পেরেছি; কিন্তু সাহিত্য পরিষদের স্বল্প পরিসর কক্ষগুলিতে গত ৮২ বছর ধরে এত অমূল্য প্রত্নবস্তু ও রত্নসম্ভার সংগৃহীত হয়েছে যে, তা এই স্ফায়তন কক্ষগুলিতে রক্ষা করা সম্ভব নয়। অভাব স্থানের, অভাব অর্থের, অভাব বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামের ও আধুনিক উপকরণের, অভাব আত্মনিবেদিত কর্মীর।

সাহিত্য পরিষদে সংগৃহীত সমস্ত মূর্তির, প্রত্নবস্তু ও পুরাকীর্তির এবং পুরাতন চিত্রগুলির বর্ণনাত্মক পরিচয় দিয়ে একটি ভাল ক্যাটালগ তৈরি করা প্রয়োজন। আমাদের মিউজিয়মে স্থানাভাবের জন্ত বহু নিদর্শন পরিষদের বিভিন্ন স্থানে, খোলা বারান্দায়, সিঁড়ির নীচে ও উপরে ইত্যন্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল। গত দু'বছর ধরে আমরা সেগুলিকে খোলা বারান্দা ও সিঁড়ির উপর ও নীচে থেকে সরিয়ে স্বল্পপরিসর কক্ষে তালা বন্ধ করেছি, সেগুলির প্রত্যেকটির বর্ণনাত্মক তালিকা ক'রে, সংক্ষিপ্ত পরিচয়-ফলক লিখে, মিউজিয়ামের জন্ত প্রশস্ত স্থানের ব্যবস্থা ক'রে সাজিয়ে রাখা দরকার। নিজের দেশকে জানবার জন্তই দেশবাসীর চোখের সামনে সেগুলিকে তুলে ধরা দরকার। বিদেশী দর্শকের কাছেও বঙ্গ সংস্কৃতির এই নিদর্শনগুলি সুসজ্জিত ক'রে দেখান দরকার।

আমাদের একটা মস্ত স্ববিধা আছে। আমাদের ১৪ কাঠা জমি। পুণ্যশ্লোক মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর দান এই ভূখণ্ড, বঙ্গবাণীর পূজারীদের দানে এই ভবন প্রতিষ্ঠিত; লালগোলা মহারাজা ঐতর্যকীর্তি যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় ও লক্ষ্মীর অগাধ বরপুঞ্জেরা বঙ্গবাণীর এই দেউল নির্মাণে মুক্তহস্তে সহায়তা করেছেন; রমেশচন্দ্র দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি এই পরিষদের উন্নয়নের জন্ত আত্মনিয়োগ করেছেন; আচার্য্য রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদীর মত মনীষী সম্পাদকরূপে এর কর্ণধার ছিলেন; রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বৎসলভের মত অসাধারণ পণ্ডিত এর চিত্রশালা ও পুঁথিশালা সংগঠন করেছেন; ব্যোমকেশ মুস্তফী ও নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের মত আত্মভোলা কর্মী নিজেদের সাংসারিক দুঃখ-দারিদ্র্য উপেক্ষা করে পরিষদের কাজে জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাঁদের স্বপ্ন অপূর্ণ রয়ে গেছে, পরাধীনতার শৃঙ্খলে সহস্র অস্ববিধার মধ্যে তাঁরা যা করে গেছেন এবং ভবিষ্যৎ বংশীয়দের সম্পূর্ণ করার ভার দিয়ে গেছেন, তা পূর্ণ করার দায়িত্ব সমগ্র জাতির।

আমাদের এই ১৪ কাঠা জমির উপর দ্রুত নির্মাণ আঁত প্রয়োজন। প্রস্তাবিত

তৃতীয় তলাটি শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত (air-conditioned) করতে হবে, জীর্ণ পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি, প্রাচীন চিত্রপট, মনীষীদের ব্যবহৃত পোষাক-পরিচ্ছদ, ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, হস্তলিপি, ডায়ারি এবং অগ্ন্যাহু পুরাকীর্তি ও প্রত্নবস্তু কালের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করতে হলে এ ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই। তাহলেই আমাদের প্রাচীন পুঁথিপত্র, প্রাচীন শিল্পকর্ম, পুরাকীর্তি ও প্রত্নবস্তুর যে অমূল্য সম্ভার—এক কথায় বন্ধ সংস্কৃতির যে সমস্ত অমূল্য সম্পদ এখানে দীর্ঘদিন ধরে লোকচক্ষুর অন্তরালে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে, সেগুলির পূর্ণ পরিচয় এখনও প্রকাশিত হয়নি সেগুলি—আমরা ভবিষ্যৎ কালের জন্ত রেখে যেতে পারব, মিল্টনের ভাষায় which posterity will not willingly let die, আমাদের বংশধরেরা সেগুলির অপমৃত্যু ঘটতে দেবে না, পূর্বপুরুষের অমূল্য রিক্তরূপে রক্ষা করবে।

রাজ্যপালকে ধন্যবাদ, অশেষ ধন্যবাদ, তিনি সেই কাজে আমাদের সহায়তা করেছেন কিছুটা। তবুও কেন্দ্রীয় সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট অনুরোধ নয়—আমাদের দাবী, জনসাধারণের দাবী—বাঙলা দেশের সাহিত্য-পরিষদকে তার পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্ত যেন সরকারের দাক্ষিণ্য ও আত্মকূল্য থেকে আমরা বঞ্চিত না হই, রূপণের মত মুষ্টিভিক্ষা দিয়ে সাহিত্য পরিষদকে তাঁরা বিদায় না করেন। বাঙলার জনসাধারণ—ধনী দরিদ্র—তাঁরা অক্লপণ হস্তে দান করেছেন। আমার শিক্ষক ডক্টর স্বকুমার সেন পরিষদের প্রতিষ্ঠা-দিবস-উৎসবে সভাপতির ভাষণে একদিন বলেছিলেন “বাঙালী তার সিঁদুর-মাখানো লক্ষ্মীর ঝাঁপির মুড়াটুকু পর্যন্ত দিয়ে গেছে সাহিত্য পরিষদে রক্ষার জন্ত।” আজকের দিনে সেই মহাপ্রাণতা দুর্লভ হয়েছে। তবুও আমরা জানি, জনসাধারণের সাহায্য পেলে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে আমরা পূর্ণ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব।

আজ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইতিহাসে একটি পরম শুভদিন। দশ বছর আগে পোষ-সংক্রান্তির শীতের মধ্যরাত্রে, বৃহস্পতি বারে, এই বিষ্ণুমূর্তি এখান থেকে অপহৃত হয়েছিল। তারিখ ছিল ১৪ই জ্যৈষ্ঠাবদি, ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দ। তারিখটি পরিষদের কার্য-বিবরণীর পুরাতন খাতায় ছিল। আমি কৌতূহলী হয়ে পুরানো পাজি খোঁটেছিলাম—পোষ-সংক্রান্তির নিশ্চিতি রাতে, বৃহস্পতি বারে, বিষ্ণুমূর্তি এখান থেকে চলে গিয়েছিলেন, আজ দশ বছর পরে বিষ্ণুপদী সংক্রান্তিতে, বাসন্তী শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে পরিষদ মন্দিরে তাঁর পুনঃপ্রতিষ্ঠা হচ্ছে। আজ বড় শুভ দিন, এবং এই দিনটি স্বয়ং রাজ্যপাল নির্বাচন করেছিলেন; আমরা করিনি। দশ বছর পরে হারানো মূর্তি আমরা ফিরে পেলাম, আমাদের পরম আনন্দের কথা। এই অমূল্য শিল্পকীর্তি চুরি গিয়েছিল আমাদের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার জন্ত। আমাদের উপযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল না। ভিতর এবং বাহির,

দুই দিক থেকেই এই মূর্তি চুরির আয়োজন হয়েছিল, তার সম্পূর্ণ কাহিনী প্রকাশ করার সময় এখনও হয়নি, এখনও একটি মূর্তি আমাদের ঘরে ফেরেনি ; যথা সময়ে আমরা সমস্ত নেপথ্য-কাহিনী প্রকাশ করব। এই উপলক্ষে আমি তার আংশিক বিবরণ দিচ্ছি।

১৪ই জানুয়ারি ১৯৬৫-তে মূর্তিটি চুরি হবার ক’দিন পরে পরিষদের তৎকালীন কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। পুলিশে রিপোর্ট করার পর পুলিশ যখন তৎপর হয় ও অহুসন্ধান শুরু করে তখন মূর্তিটি দীর্ঘকাল—পাঁচ বছর—কলকাতায় ও কলকাতার বাইরে বিভিন্ন স্থানে সরিয়ে রাখা হয়। পাঁচ বছর পরে যখন জনসাধারণের চিরচঞ্চল মূর্তি ব্যাপারটি ভুলে যায় এবং পরিষদ-কর্তৃপক্ষ নীরব ঔদাসীন্নে নিশ্চেই হন, পুলিশের রিপোর্টটিও ফাইলবন্দী হয়ে যায়, তখন পুলিশ ও কাস্টম্‌সের চোখে ধুলো দিয়ে মূর্তিটি কয়েকটি হাত-ফেরত হয়ে সমুদ্রপারে চোরা চালান করা হয়। মূর্তিটি আমেরিকায় যায় এবং সেখানে ৫০ হাজার ডলারে—চার লক্ষ টাকায়—বিক্রীত হয়। এই প্রসঙ্গে একটি কথা আপনাদের কাছে বলতে চাই—সাহিত্য-পরিষদের বহু মূর্তির ও পোড়ামাটির (terracotta) অলংকরণ ও শিল্পসামগ্রীর ফোটোগ্রাফ অবৈধভাবে, পরিষদের নিয়মাবলী লঙ্ঘন করে, অগ্রহণভাজন বহু ব্যক্তি নিয়েছিলেন, সেই সব নেগেটিভ থেকে বহু কপি প্রস্তুত করে স্বদেশের ও বিদেশের শিল্প-‘রসিক’ ও পুরাকীর্তি-ব্যবসায়ী ও শিল্পসামগ্রী-বিক্রেতার—Curio and Art dealerদের—কাছে পছন্দ ও দরদস্তুরের জগা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। অবৈধভাবে ছবি তোলায় ও নেগেটিভ নিয়ে যাওয়ার এই কাজ অত্যন্ত কঠোর হস্তে আমি দমন করেছি, তাতে জনপ্রিয়তা হারিয়েছি, নিন্দিত হয়েছি, বন্ধু শত্রু হয়েছেন, নানা আঘাত লাগুন। অপবাদ সয়েছি—পরিষৎ-সভাপতি সে-সব কথা জানেন। এই হারানো মূর্তি পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন গত দু’বছর ধরে দেখেছি, স্বপ্ন যে সফল হবে এমন সম্ভাবনা ছিল না। প্রাথমিক চেষ্টা যখন ব্যর্থ হল, নৃত্র সঙ্কানের যখন পথ খুঁজে পেলাম না, তখন ভাবলাম যে-পথে গেছে অহুমান করছি সেই পথেই চেষ্টা করে দেখলে কেমন হয়? সভাপতি মশায়ের কাছে আমার অহুমানের কারণগুলি জানিয়ে তাঁর অনুরমতি নিয়ে পরিষদের মিউজিয়মে যে বিষ্ণুমূর্তিগুলি আছে সেগুলির ছবি তুললাম, যে তিনটি মূর্তি হারিয়েছিল তার একটি আমরা পূর্বেই ফিরে পেয়েছি সেটিরও ছবি তুলি, যে-দুটি মূর্তির কোনও সন্ধানই পাচ্ছিলাম না সে-দুটি মূর্তির আর্ট প্লেট art plate ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ-প্রকাশিত স্বর্গত মনোমোহন গাঙ্গুলীর ‘Handbook to the Sculptures in the Museum of the Bangiya Sahitya Parisad’ বইয়ে আছে এবং তারই মধ্যে পুনরুদ্ধার করা যে মূর্তিটি এই ব্যঞ্জে সীলমোহর করা আছে—বাননীর রাজ্যপাল যেটি এখন উন্মোচন করবেন—সেটির ছবি এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকার Encyclopaedia Britannica-র ১৯৬১-র সংস্করণে

ভালো আর্ট পেপারে মুদ্রিত আছে, অবশ্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নাম সেখানে উল্লিখিত নেই। *Encyclopaedia Britannica*-র পূর্ববর্তী সংস্করণগুলিতে এই ছবি খুঁজে পাইনি। আশ্চর্যের বিষয় পরবর্তী সংস্করণ ১৯৬৬-তে মুদ্রিত *Encyclopaedia Britannica*-য় এই ছবিটি নেই। ১৯৬৫-তে আমাদের মূর্তি চুরি গিয়েছিল। যাই হোক ১৯৬১-র ব্রিটানিকা থেকেও আমি এই ছবিটির ফোটো তোলাই। তারপর যা আমাদের ঘরে আছে আর যা আমাদের ঘরে নেই তার সব ছবিগুলি মিশিয়ে, পরিষদের সভাপতি মশাইয়ের অমুমতি নিয়ে, বিশ্বের বিভিন্ন বিখ্যাত মিউজিয়ামে পাঠাই এবং মূর্তিগুলির অমূল্যরূপ রীতির কোনও বিক্ষুব্ধতা তাঁদের সংগ্রহে থাকলে তার বিবরণ জানাতে অমরোধ করি—বিক্ষুব্ধতা সত্ত্বেও একটি আলোচনা-নিবন্ধ প্রস্তুতের জন্ত বিবরণ সংগ্রহ প্রয়োজন তাঁদের জানাই। একমাত্র বস্টন মিউজিয়ম অফ ফাইন আর্টসের কর্তৃপক্ষ অশেষ সৌজশের সঙ্গে জানালেন যে, প্রেরিত ছবিগুলির মধ্যে একটি মূর্তির অনেকটা অমূল্যরূপ মূর্তি তাঁদের সংগ্রহশালায় আছে, তবে দুটির মধ্যে একটু পার্থক্যও আছে, তাঁদের বিক্ষুব্ধতার পাদপীঠে দুটি প্রগত ভক্তমূর্তি নেই—একটি প্রগত ভক্তমূর্তি আছে। যে বিক্ষুব্ধতা আজ মাননীয় রাজ্যপাল এখানে উদ্ঘাটন করবেন তার পাদদেশে একটি প্রগত মূর্তি—“a small kneeling figure”—পক্ষবান্ গরুড়ের মূর্তি ছিল, সেটিকে বিক্রয়ের পূর্বে খুলে নেওয়া হয়েছিল বা পৃথকভাবে বিক্রয় করা হয়েছিল। বিক্ষুব্ধতার দুদিকে দুটি দণ্ডায়মান পরিকর মূর্তি ছিল, সে দুটির মধ্যেও একটিকে সকেট socket খুলে আলাদা করা হয়েছিল। যিনি বিক্রি করেছিলেন তিনি whole saler পাইকারী ব্যবসায়ী কিনা জানিনা, তবে তিনি যে retailer খুচরা ব্যবসায়ী কোনও সন্দেহ নেই। তিনি খুচরো ব্যবসা করতে গিয়েছিলেন। টুকরো টুকরো করে মূর্তিগুলিকে আলাদা করে বেচলে দাম বেশি পাবেন বলে, প্রথম মূর্তিটিকে ধোলেন। তারপর পাদপীঠের অপর প্রগত ক্ষুদ্র মূর্তিটি—সেটির মাথার মুকুট আগেই একটু ভাঙা ছিল—খুলতে গিয়ে তার মাথার মুকুটটি ভেঙে যায়। যখন তিনি দেখলেন যে খুলতে গেলে নষ্ট হয়ে যাবে, তখন খোলা বন্ধ করলেন। এক পাশের দণ্ডায়মান পরিকর মূর্তি fixed আবদ্ধ আছে, আর এক পাশের দণ্ডায়মান পরিকর মূর্তিটি বিচ্যুত, সৌভাগ্যক্রমে সেটিও আমরা পেয়েছি।

বস্টন মিউজিয়ম অফ ফাইন আর্টস আমাদের জানালেন যে তাঁরা মূর্তিটি ১৯৭০ সালে কিনেছেন। আমার খটকা লাগলো। ১৯৬৫-তে চুরি হল, আর ১৯৭০-এ ওঁরা কিনলেন। বস্টন মিউজিয়ামের ১৯৭০, ১৯৭১-এর Annual Report বার্ষিক বিবরণ সংগ্রহ করে দেখলাম সেখানে মূর্তির ছবি বেরিয়েছে। মিলিয়ে দেখলাম সে ছবি আমাদের অপরূপ মূর্তির—পক্ষবান্ গরুড় কেবল উড়ে চলে গেছেন। ওঁদের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ চললো, দাবি জানালাম ওঁদের কাছে। ওঁরা বললেন যে, মূর্তিটির ছবি দেখে তাঁরা “reputable dealer”-এর কাছ থেকে এই মূর্তি কিনেছেন; ১৯৩৩ সালে দিল্লী

থেকে প্রকাশিত একখানি বইয়ে এই মূর্তির ছবি আছে এবং সে বইয়ে বা প্রকাশিত ছবিতে কোথাও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নাম নেই, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের যদি কোনও স্বত্ব-স্বামিত্ব থাকে তাহলে পুলিশ-রিপোর্ট ও অগ্ন্যান্য দালল দিয়ে তা প্রমাণ করতে হবে। ওঁদের কিউরেটর আমাকে লিখলেন :

“I wonder if we could ask you to provide us with a copy of the Police Report or other records or documents which would support your title to the object which clarify the circumstances of its disappearance.”

ইতিমধ্যে এই মূর্তি ভারত অথবা বাংলাদেশ—India or Bangladesh—কোথাকার মিউজিয়ম থেকে অপহৃত, এ প্রশ্ন বস্টন মিউজিয়ম অফ ফাইন আর্টসের কর্তৃপক্ষের কাছে জানিনা কারা উত্থাপন করলেন। বস্টন মিউজিয়ামের কর্তৃপক্ষ আমার কাছে লিখিত পত্রে জানালেন : **“rather confusing story about it having been stolen from an Indian or Bangladesh museum reached us recently”**—এ প্রশ্নেও আবার একটা সমস্যা বাড়লো।

দুর্ভাগ্যক্রমে, পুলিশ রিপোর্টের যে কপি পরিষদের অফিসে ছিল তা কয়েক বছর আগেই অদৃশ্য হয়ে যায়। সে-ফাইল বহু অহুসন্ধানেও আমরা খুঁজে পাইনি। কলকাতার পুলিশ বিভাগে সন্ধান করেও কোনও পুলিশ-রিপোর্টের কপি বার করতে পারিনি। তারপর ইউনাইটেড নেশনস্ এডুকেশনাল, সায়াস্টিফিক্ অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশনে UNESCO-য় এবং আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থায় Interpol-এ অহুসন্ধান করি। কোনও দেশের মূল্যবান সম্পদ বা প্রত্নবস্তু চুরি গেলে বা বিদেশে চালান হতে পারে সম্ভেহ হলে দেশ-বিদেশের নানা প্রতিষ্ঠান ও সরকার থেকে এঁদের কাছে সংবাদ দেওয়া হয় এবং এঁরা এ-বিষয়ে নজর রাখেন বা অহুসন্ধান করেন। এই দুটি আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে জানা গেল যে এইরকম কোনও মূর্তি যে ভারত থেকে চুরি গেছে বা বিদেশে চালান হয়েছে এমন কোনও সংবাদ তাঁদের কাছে নেই বা কোনও দিন সরকারী বা বে-সরকারী কোনও সূত্রেই পৌঁছায়নি। বস্টন মিউজিয়ামের কর্তৃপক্ষও ঐ দুটি আন্তর্জাতিক সংস্থায় অহুসন্ধান করলেন এবং আমাকে লিখলেন যে : **“An investigation of the Interpol and Unesco files revealed no information”**—কি বিচিত্র অবস্থা। আশা-নিরাশা ও মানসিক উদ্বেগের মধ্য দিয়ে আমাদের হারানো বিষ্ণুমূর্তি যে ফিরে পেয়েছি তা ভাবলে আমার নিজেরই বিশ্বাস লাগে। আজকে বিষ্ণুমূর্তি যে আমাদের ঘরে এসেছেন, বিষ্ণু আসবেন বলেই এসেছেন, এর পিছনে আমাদের কাকুর কৃত্তিব নেই। তাঁকে অপহরণ করে কেউ পরিষদকে বঞ্চিত করতে পারে না। সাহিত্য-পরিষদ দরিদ্র হবে না, নিঃস্ব হবে না। আমার বুকের একটা মস্ত বড় বল এই মূর্তির অপ্রত্যাশিত পুনরাবির্ভাবে।

পুলিস রিপোর্ট যখন পাওয়া গেল না তখন স্বত্ব-স্বামিত্ব প্রমাণের এবং মূর্তি যে ভারতের, বাংলাদেশের নয়, তা প্রমাণের জন্ত পুরাতন নথিপত্র ও ধূসর পাণ্ডুলিপি ঘাঁটতে শুরু করলাম। বস্টন মিউজিয়মকে আমরা দেখালাম যে ১৯৩৩-এর চের আগে ১৯০২ সালে এই মূর্তি সম্বন্ধে আমাদের হাতের লেখা জীর্ণ পুরাতন কার্যবিবরণীতে আমাদের স্বত্বের প্রমাণ রয়েছে। ফোটোস্ট্যাট কপি পাঠালাম সেই কার্যবিবরণীর, সঙ্গে তার ইংরেজি অঙ্কবাদ। মূর্শিদাবাদের কান্দী সাগরদীঘীর কাছ থেকে এ মূর্তি পেয়েছিলেন স্বর্গত কিশোরীমোহন সিংহ। সাহিত্য পরিষদের পুরাতন সদস্য-তালিকায় তাঁর নাম আছে; এবং তিনি ইংরাজী ১৯০৫ সালে, বাঙলা ১৩১২ সালে কয়েক মাস—আগ্নি মাস পর্যন্ত—এখানে সহকারী সম্পাদক ছিলেন, আচার্য্য রামেন্দুসুন্দর জিবেদী তখন সম্পাদক। কিশোরীমোহনের কাছ থেকে পরিষৎ সম্পাদক পুণ্যশ্রীক রামেন্দু-সুন্দর জিবেদী এই মূর্তিটিকে এখানে নিয়ে আসেন ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে। তখনও পরিষদের চিত্রশালা বা মিউজিয়ম আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা হয়নি; কিন্তু বাঙালী ধীরে ধীরে এখানে আপনা আপনিই মিউজিয়ম গড়ে তুলছিল। ১৩১৬ বঙ্গাব্দের ২৬শে অগ্রহায়ণ—১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর—কবি বিজ্ঞেন্দ্রলাল রায়ের সভাপতিত্বে মাসিক অধিবেশনে পরিষদের সাধারণ সদস্যদের সামনে মূর্তি প্রদর্শিত হয়; রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিন মূর্তির প্রাথমিক পরিচয় সদস্যদের কাছে ব্যাখ্যা করেন। সেদিন যে-সব মনীষী ও পণ্ডিত ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন তাঁদের স্বাক্ষরিত হাজিরা ও কার্যবিবরণ পরিষদের পুরাতন নথিপত্রে আছে। ৬৫ বছর আগেকার সেই পুরাতন নথি আমাদের স্বত্বস্বামিত্বের অগ্রতম দলিল। একটানা ৩৮ বছর এই মূর্তি পরিষদের চিত্রশালায় ছিল, দেশ-বিদেশের নানা পুরাতত্ত্ববিদ শিল্পরসিক এর সৌন্দর্য্যে ও শিল্পকলায় মুগ্ধ হয়ে বিভিন্ন তারিখে যে সমস্ত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন সেগুলিও আমাদের অঙ্কুল প্রমাণ। ৩৮ বছর পরিষদ মন্দিরে থাকার পর এই মূর্তি এখান থেকে বিলেতে যায় ১৯৪৭-৪৮ সালে লণ্ডনে রয়্যাল একাডেমি অফ ফাইন আর্টসের Royal Academy of Fine Arts-এর আয়োজিত আন্তর্জাতিক শিল্প-প্রদর্শনীতে International Art Exhibition-এ। সেখানে এক লক্ষ টাকা নাকি তখন এই মূর্তির দাম উঠেছিল। আন্তর্জাতিক শিল্প প্রদর্শনীতে বহুজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে পরিষদের ১১শ শতকের বিষ্ণুমূর্তি; বিদেশের বাজারে এর দাম যাচাইয়ের পর পরিষদের বিষ্ণুমূর্তি তিনটির উপর লোকের দৃষ্টি পড়ল। বিদেশী কাগজে প্রকাশিত প্রদর্শনী-সংক্রান্ত বিবরণ খুঁজে তার ফোটোস্ট্যাট কপি নিয়ে, পরবর্তীকালে Statesman পত্রিকায় সাহিত্য পরিষদের সম্পদ-সম্ভার বিষয়ে সচিত্র নিবন্ধে বিষ্ণুমূর্তির প্রকাশিত ছবিসহ কাটিং ও Photostat Copy, এবং মূর্তি চুরি যাওয়ার কয়েকদিন পরে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত পরিষদের মূর্তি চুরির খবর এবং তার পরে প্রকাশিত একটি editorial বা সম্পাদকীয় নিবন্ধ খুঁজে বের করে তার ফোটোস্ট্যাট কপি ও ইংরেজি অঙ্কবাদ করে আমাদের স্বত্বস্বামিত্বের প্রমাণ

বস্টন মিউজিয়মের কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরি ; দেখাই যে, ১৯৩৩-এর চের আগে থেকে, ১৯০৯ থেকে আমাদের Title ও আজ থেকে ৬৫ বছর আগেকার Title ; যে মূর্তি তাঁরা সংগ্রহ করেছেন তা আমাদেরই মূর্তি, চোরাই মূর্তি তাঁদের প্রদর্শনশালায় রয়েছে একথা তাঁদের জানাই ; এবং যে ‘reputable dealer’ বিখ্যাত শিল্প-বিক্রেতার কাছ থেকে তাঁরা কিনেছেন তাঁর নাম-ঠিকানা “একান্ত গোপনীয় তথ্য” হিসেবেই আমাকে জানাতে অনুরোধ করি। কারণ এই জাতীয় শবিলকদের চেনা দরকার এবং দেশের লোককে চিনিয়ে দেওয়া দরকার। এঁর বা এঁর সহযোগীদের ও সম্পর্কিত ব্যক্তিদের চিরদিনের মত আমরা সাহিত্য পরিষদে তোকা বন্ধ করব এবং ভারতের সমস্ত মিউজিয়মে তাঁদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করার জ্ঞা ভারত সরকারের দ্বারস্থ হব।

বস্টন মিউজিয়মের কর্তৃপক্ষ অসামান্য সৌজন্মের সঙ্গে আমাদের মূর্তি আমাদের হাতে ফেরৎ দিতে স্বীকৃত হলেন এবং আমাকে লিখলেন যে যে বিক্রেতার মারফৎ তাঁরা মূর্তি কিনেছিলেন তাঁর নাম-ধাম-পরিচয় জানার অধিকার আমার আছে “With regard to the identity of the dealer through whom we purchased this object, we certainly feel you have every right to this information” এবং সেই বিক্রেতা—‘a man of fine reputation and integrity’—স্বয়ং এসে আমার সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে সাক্ষাৎ করবেন এবং কীভাবে মূর্তি তাঁর হস্তগত হয়েছিল আমার কাছে ব্যাখ্যা করবেন। ইতিমধ্যে মূর্তি হস্তান্তর বিষয়ে সকল পক্ষের স্বার্থরক্ষা করে—“which would protect the interests of all concerned” একটি আইনগত চুক্তি বন্ধীয় সাহিত্য পরিষদ ও মিউজিয়ম অফ্‌ ফাইন আর্টস্‌, বস্টন-এর মধ্যে সম্পাদনের জ্ঞা তাঁরা প্রস্তাব করলেন। সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি নিয়ে আমি সে প্রস্তাবে সন্মত হলাম। কিন্তু পরিষদের আর্থিক অবস্থায় বস্টনে গিয়ে মূর্তি গ্রহণ করা এবং বিমানে সে মূর্তি কলকাতায় আনার ব্যয় বহন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, সে আর্থিক সম্বল আমাদের ছিল না। তাই উভয় পক্ষের চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের পর বস্টন মিউজিয়ম মূর্তিটি বস্টন থেকে ওয়াশিংটনে তাঁদের খরচে আনবেন, বন্ধীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষে ওয়াশিংটনে ভারতের রাষ্ট্রদূত সেটি গ্রহণ করবেন এবং বন্ধীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষে ভারতের রাষ্ট্রদূত সেটি গ্রহণ করা “shall operate as a full discharge and release to the Museum by the Parisad” এই শর্ত স্থির হয়। ওয়াশিংটন থেকে ইনসিওরেন্স করে বিমানে এই মূর্তি ভারতে আনার বিমান ব্যয় বহন করাও পরিষদের পক্ষে দুঃসাধ্য। আমেরিকায় তখন এই মূর্তির বাজার দর ৭৫ হাজার ডলার ৬ লক্ষ টাকা), বস্টন মিউজিয়ম assessor-কে দিয়ে মূল্য নিরূপণ করে বস্টন থেকে ওয়াশিংটন পর্যন্ত ঐ মূল্যে মূর্তি ইনসিওরেন্স করে পাঠান। যাই হোক, বস্টনের আইনজ্ঞদের রচিত ও প্রেরিত চুক্তিপত্রটি কলকাতায় আইনজ্ঞদের অনুমোদন

করিয়ে আমি স্বাক্ষর ও সীলমোহর করে পাঠিয়ে দিই। সেই চুক্তিপত্রের ফোটোস্ট্যাট কাপ photostat copy আজকে এই উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকায় মুদ্রিত হয়েছে, ভবিষ্যতে ভারত অথবা বাংলাদেশ—“India or Bangladesh”—কার যুক্তি এই নিয়ে ঘেন আর প্রশ্ন না ওঠে। তারপর এ বিষয়ে আত্মপূর্বিক সমস্ত ঘটনার বিবরণ লিখে সমস্ত চিঠিপত্র correspondence-এর কপি ও পরিষদের ১১শ শতকের তিনটি বিষ্ণুমূর্তির দু কপি করে ছবিতে স্বাক্ষর ক’রে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে পাঠিয়ে যুক্তি ভারতে আনবার ব্যবস্থা এবং ওয়াশিংটন থেকে ভারত পর্য্যন্ত ইনসিওরের বায় ও বিমানে পাঠাবার ব্যয় বহনের জ্ঞাত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে অহরোধ করা স্থির করি। পরিষদের সভাপতি ভারতের জাতীয় আচার্য অধ্যাপক শ্রীহীনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই প্রস্তাব অহুমোদন করেন এবং তিনি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে ১৩ই জুন ১৯৭৪ তারিখে একখানি ব্যক্তিগত চিঠি লিখে আমার পত্রসহ সমস্ত কাগজপত্র, ফোটোগ্রাফ ও চুক্তিপত্রের নকল তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন, এবং এ বিষয়ে তাঁর ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপের ও সাহায্যের অহরোধ করেন। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং তাঁর ২৪শে জুন ১৯৭৪ তারিখের পত্রে আমাদের জানান যে, তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীযুক্ত স্বর্ণ সিংকে এবং আমেরিকায় ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রীযুক্ত টি. এন. কাওলকে এ বিষয়ে বন্ধীয় সাহিত্য পরিষদকে সর্ববিধ প্রয়োজনীয় সাহায্যের নির্দেশ দিয়েছেন এবং বস্টন মিউজিয়মের কিউরেটর য়ান ফন্টেনকে Jan Fonteinকে তিনি ধন্যবাদ-জ্ঞাপক একটি চিঠিও পাঠাচ্ছেন।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত আন্তনি লললট্ দিয়াস ১২ই জুলাই ১৯৭৪ রাজভবনে পরিষৎ সম্পাদকের সঙ্গে আলোচনাকালে সমস্ত কাগজপত্র দেখে প্রয়োজনীয় সাহায্য করেন। ১৯শে জুলাই বস্টন থেকে বিষ্ণুমূর্তিটি ওয়াশিংটনে, চুক্তিপত্র অহুসারে, Indian Embassyতে আনা হয় এবং ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীযুক্ত টি এন. কাওলের হাতে অর্পণ করা হয়। এই উপলক্ষে সেখানে একটি ছোট অহুষ্ঠান হয়—আমেরিকার সংবাদ-পত্রগুলিতে তার বিবরণ বহুল প্রচারিত হয়।

১০ই আগস্ট ১৯৭৪ রাত্রে, জন্মষ্টমীর পুণ্য তিথিতে, অপহৃত বিষ্ণুমূর্তি সমুদ্রপার থেকে এয়ার ইণ্ডিয়ার একখানি বিমানে স্বদেশ যাত্রা করবেন দিনস্থির করি। এই দিনটি পরিষৎ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী ছাড়া ভারতে আর কারুর কাছে প্রকাশ করা হয়নি। ১১ই আগস্ট সকালের প্লেনে আমি দিল্লী যাব পালাম বিমান-বন্দরে বিষ্ণুমূর্তি গ্রহণ করার জন্ত, এই আয়োজন হয়। আমার যাত্রার কয়েক ঘণ্টা আগে শেষ রাতে নতুন দিল্লী থেকে প্রধান মন্ত্রীর সেক্রেটারিয়েটের ডিরেক্টর শ্রীসারদাপ্রসাদ হাইদর ট্রাঙ্ক টেলিফোনে আমাকে জানান যে বিষ্ণুমূর্তি আসছেন না, ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে, এয়ার ইণ্ডিয়ার পাইলটরা হঠাৎ ধর্মঘট করেছেন। কলকাতা থেকে বিমানে দিল্লী যাত্রা বাতিল করে আমি কলকাতায় এয়ার ইণ্ডিয়ার রিজিওনাল ম্যানেজার শ্রী এইচ. ডি. বিলিমোরিয়ার মারফৎ

হ্যা ইয়র্কে টেলিফোন করে এয়ার ইন্ডিয়ান সঙ্গে যোগাযোগ করি, মূর্তি ওয়াশিংটনে Indian Embassy-তে থাকবে, বিদেশী কোনও বিমানে আনা হবে না, পাইলটদের ধর্মঘট মিটলে এবং এয়ার ইন্ডিয়ান অবস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হলে বিষ্ণুমূর্তি ওয়াশিংটন থেকে হ্যা ইয়র্ক আনা হবে এই সিদ্ধান্ত জানাই। ওয়াশিংটনে Indian Embassyর এডুকেশন মিনিস্টার শ্রীযুক্ত ইনাম রহমানকে এ বিষয়ে সংবাদ পাঠাই। 'শ্রেয়াংসি বহু বিদ্বানি ॥'

ইতিমধ্যে মূর্তি কেন আনা হচ্ছে না ইত্যাদি প্রশ্ন তুলে ও সন্দেশ প্রকাশ করে স্থানীয় সংবাদপত্রে কয়েকটি চিঠি প্রকাশিত হয়। পার্লামেন্টেও এর তরফ পৌছায়। ৩রা আগস্ট ১৯৭৪ নতুন দিল্লী থেকে একটি Express State Telegram পাই :

"Parliament Question due for answer in Rajya Sabha on 7th August '74 reads:

(a) Whether it is a fact that the Bronze Idol stolen from the Bangiya Sabitya Parisad by some was sold for Rupees 3'75 lakhs to the Boston Museum of Fine Arts,

(b) If so what steps Government have taken to get back the Idol, and

(c) The number of pieces stolen from the Museum during the years 1970-71, 1971-72 and 1973-74.

Please write all details to enable us to answer Parliament Question."

এ বিষয়ে অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিই এবং পূর্ণতর বিবরণ মূর্তি ঘরে ফিরলে প্রকাশ করা হবে সবিনয়ে জানাই। কোনও বিদেশী বিমানে এই অমূল্য মূর্তি ভারতে আনার আমরা পক্ষপাতী ছিলাম না, নিরাপত্তার নানা প্রশ্ন মনে জাগছিল। তিন মাসেরও উপর প্রতীক্ষার পর এয়ার ইন্ডিয়ান বিমান চলাচল স্বাভাবিক হলে ওয়াশিংটন থেকে নতুন দিল্লী পর্যন্ত ৭৫ হাজার ডলারে (৬ লক্ষ টাকা , উনসিওয়েন্স করে মূর্তি ওয়াশিংটন থেকে হ্যা ইয়র্ক আনা হয়, এবং এয়ার ইন্ডিয়ান বিমানে নতুন দিল্লী পাঠান হয়। ১১ই অক্টোবর ভিরেকটর জেনারেল অক্ আকিওলজি নতুন দিল্লী থেকে আমার বাড়ির ঠিকানায় আমাকে একখানি Express State Telegram পাঠান :

"Vishnu Image reaching Delhi from New York by Air India Flight No 110 on Sunday Thirteenth October 05 45 Hours (.) Please reach Delhi and take delivery at Palam Airport".

ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগের তৎপরতায় ১১ই তারিখের জরুরি স্টেট টেলিগ্রাম ১৫ই অক্টোবর ডেলিভারি হয়। অবশ্য ইতিমধ্যে প্রধান মন্ত্রীর সেক্রেটারিয়েটের ডিরেক্টর শ্রীসারদা প্রসাদ হাইদর নূতন দিল্লী থেকে ট্রান্স টেলিফোনে অতি প্রত্যাশিত জানিয়ে যুক্তি আসার সংবাদ আমাদের জানান এবং আমি নূতন দিল্লী না পৌঁছান পর্যন্ত যুক্তি গ্রাশনাল মিউজিয়মে রাখা হবে স্থির হয়। পূজার মরশুমে দিল্লীগামী কোনও প্লেনে তখন আসন নেই, মাননীয় রাজ্যপালের সহায়তায় সঙ্গে সঙ্গে প্লেনের আসন ব্যবস্থা হয়; আমি নূতন দিল্লী গিয়ে যুক্তিটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে গ্রহণ করি, অন্তর্বর্তী সময়টুকু যুক্তি নূতন দিল্লীতে গ্রাশনাল মিউজিয়মে রক্ষিত হয়। পূর্ব রাজ্যে রাজভবন থেকে মাননীয় রাজ্যপালের সহ সচিব শ্রীঅজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রেরিত টেলিগ্রামে আমার যাত্রার সংবাদ পেয়ে নূতন দিল্লীতে পশ্চিমবঙ্গের লিয়ার্শে। কমিশনার ডক্টর নীতীশ সেনগুপ্ত আমাদের নানাভাবে সহায়তা করেন। তাঁর সঙ্গে ডিরেক্টর জেনারেল অফ আর্কিওলজি ডক্টর এম. এন. দেশপাণ্ডের কাছে যাই, ডক্টর দেশপাণ্ডে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, “ভারত থেকে অপহৃত হয়ে বিদেশে চলে যাওয়া যুক্তি পুনরুদ্ধার হয়ে ভারতে এই প্রথম এলো, এর পূর্বে আর কোনও হারানো যুক্তি ভারতে ফিরে আসেনি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে ও আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।” তিনি আমাদের নিয়ে গ্রাশনাল মিউজিয়মে আসেন। গ্রাশনাল মিউজিয়মের কর্তৃপক্ষ অভিনন্দন ও প্রাথমিক আলোচনার পর আমার কাছে প্রস্তাব করেন, ভারতীয় শিল্পকলার এই অমূল্য নিদর্শনটি নূতন দিল্লীতে গ্রাশনাল মিউজিয়মে রাখার জন্ত, সারা বিশ্বের টুরিস্ট ও শিল্প-রসিকদের সমাগম দেখানো, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সৌজ্ঞেয় স্বীকৃতি সহ পরিচয়-ফলক দিয়ে একটি পৃথক্ কাঁচের আধারে তাঁরা যুক্তি রাখবেন। আমি সবিনয়ে হাসতে হাসতে বলি: “আমাদের ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর, আপনাদের প্রাসাদ, যুক্তি এখানে হৃদয় আধারে সুসজ্জিত ও সুরক্ষিত থাকবে নিশ্চয়ই; তবে সাহিত্য পরিষদের রত্ন পরিষদের দরিদ্র কুটিরই আপনাদের শুভেচ্ছাসহ নিয়ে যাই। ভারতবর্ষ ছেড়া কাঁধায় মুড়ে কোহিনূর রাখে, আমাদের দরিদ্র কুটিরই এই রত্ন আমরা সযত্ন রাখবো।” যুক্তি গ্রহণ করার পর সারারাত উত্তেজনা আনন্দে ঘুমুতে পারিনি। বঙ্গভবনের একটি বিলাস-বহুল কক্ষে পাশের শয়ান শয়ান—সীলমোহর-করা বাস্কে রক্ষিত—বিষ্ণু যুক্তির দিকে তাকিয়ে বিনিদ্র রাজি কেটেছে। সীলমোহর-করা বাস্কবন্দী বিষ্ণু চোখের সামনে অপরূপ প্রসন্ন হাসে বার বার ভেসে উঠেছেন।

পরদিন প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আহ্বাক্যে বিশেষ বিমানে উপযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থাসহ যুক্তি নিয়ে কলকাতায় ফিরি। যুক্তি গ্রহণ করার পরই পূর্বদিন সন্ধ্যায় রাজভবনে মাননীয় রাজ্যপালকে টেলিগ্রামে খবর দিই, দমদম বিমান ঘাঁটিতে তাঁর গাড়ি এবং নিরাপত্তা রক্ষীবাহিনী প্রস্তুত ছিলেন। যুক্তি প্রথমে রাজভবনে নিয়ে বাই, সেখান থেকে রাজ্যপালের নির্দেশে সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে নিয়ে আসি। আগের দিন রাতেই রাজ্যপালের নিকট

থেকে সংবাদ পেয়ে পরিষৎ সভাপতি জাতীয় আচার্য্য শ্রীহীনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় পরিষৎ সদস্যদের নিয়ে সেখানে দীর্ঘক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিলেন ; আচার্য্য শ্রীহীনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের হাতে মূর্তি তুলে দিই, তিনি চন্দন-কাঠের ধূপদানিতে একগুচ্ছ হরতি ধূপ জ্বলে বহু আকাজিক্ত আরাধ্য দেবতাকে অভ্যচনা করেন ।

আজ সেই বিষ্ণুমূর্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা মাননীয় রাজ্যপালের পুণ্যহস্তে । এই সীলমোহর-করা আধারের চাবিটি একটি সীলকরা পৃথক বাক্সে ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রীযুক্ত কাওল পাঠিয়েছেন, আমার কাছে গচ্ছিত সেই সীলমোহর-করা চাবিটি মাননীয় রাজ্যপালের হাতে আমি তুলে দিচ্ছি, তিনি আধার উন্মোচন করলে আমরা সবাই সে মূর্তির প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করে ধৃত হব । এই সঙ্গে একটি সীলকরা খামে রক্ষিত অপহৃত মূর্তির একখানি স্বাক্ষরিত ছবিও রাজ্যপালের হাতে তুলে দিচ্ছি—এই ছবির একখানি স্বাক্ষরিত কপি মাননীয় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে রক্ষিত আছে, একখানি স্বাক্ষরিত কপি ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রীযুক্ত টি এন কাওলের কাছে রক্ষিত আছে এবং একখানি স্বাক্ষরিত কপি এতদিন আমার কাছে রক্ষিত ছিল । মূর্তির আধার উন্মোচনের পর এই সীল-করা ছবি খুলে তার সঙ্গে আমাদের ফিরে পাওয়া বিষ্ণুমূর্তি সর্বসাধারণ্যে মিলিয়ে দেখে নেওয়া হবে । বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ তার ত্রাস রক্ষা করেছে, তার দায়িত্ব পালন করেছে তা প্রমাণিত হবে ।

পরিশেষে একটি কথা আপনাদের জানানো দরকার । বিদেশী সংবাদপত্রে প্রচারিত হয়েছে, কোনো মূল্য না নিয়েই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎকে মূর্তি দেওয়া হয়েছে । আমাদের সম্পদ আমরা ফিরে পাবো, মূল্য দিয়ে কেন কিনবো ? তবে এই সঙ্গে আরও একটি সংবাদ আপনাদের গোচরে আনি । যে বিক্রেতা চার লক্ষ টাকার এই মূর্তি বিক্রি করেছিলেন—তিনি সমগ্র টাকা বস্টন মিউজিয়মকে ফেরৎ দিয়েছেন এবং বস্টন মিউজিয়মকে তিনি জানিয়েছেন যে তিনি ‘অজ্ঞাত’ (“anonymous”) থাকতে চান । বস্টন মিউজিয়ম আমাদের লিখেছেন যে, তিনি এসে ব্যক্তিগত ভাবে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন । আমরা আজও তাঁর প্রতীক্ষা করছি । জানি না তিনি আসবেন কিনা !

বস্টন মিউজিয়মের কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা অশেষ ধন্য, কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁদের সহায়তা সৌজন্য ও সহায়তার জন্ত তাঁদের সাধুবাদ দিই । ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত আন্তনি লসলট্‌ দিয়াস, শ্রী টি. এন. কাওল এবং পরিষদের সভাপতি ভারতের জাতীয় আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীহীনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সহায়তা ও অশেষ চেষ্টার জন্তই আজ এই অমূল্য সম্পদ আমরা ফিরে পেলাম ; সেজন্ত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সদস্যবৃন্দ ও সমবেত স্বধীমণ্ডলীর পক্ষ থেকে তাঁদের আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি ।

আপনারা বীর! আজ সন্ধ্যায় এই শুভ উৎসবে এসেছেন তাঁদের সকলকে আমার প্রণাম ও নমস্কার নিবেদন করি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতি আপনাদের প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে গৌরবোজ্জ্বল করুক। এইটুকুই আজকের দিনে আমার প্রার্থনা ॥*

*ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস (USIS) কর্তৃক গ্রহীত টেপ রেকর্ড হইতে—
USIS-এর সিনিয়র এডিটর শ্রীঅমিয়কুমার গাঙ্গুলীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

সুহৃদর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

ডাঃ ত্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এম. এ, পি -এইচ. ডি.

১৯১০-১১ সাল। আমি তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে এম. এ. পড়ি। এম. এ. কোর্সে তখন ছিল আটটি পেপার। এর ছয়টি সকলকেই পড়িতে হইত। বাকী দুটি কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের মধ্যে একটি বাছাই করিয়া নেওয়া চলিত। আমার নির্বাচিত বিষয় ছিল প্রাচীন ভারতের ইতিহাস। আমাদের ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন জে. এন. দাসগুপ্ত—অক্সফোর্ডের ছাত্র—চিরকাল ইংলণ্ডের ও ইউরোপের ইতিহাস পড়াইয়াছেন। প্রাচীন ভারত ইতিহাসের কিছুই তিনি জানিতেন না। তবুও তিনিই থানিকটা পড়াইতেন। আর সংস্কৃতের অধ্যাপক নীলমণি চক্রবর্তী বাকিটা পড়াইতেন। নীলমণিবাবু আর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় দুইজনেই ৩৪রপ্রসাদ শাস্ত্রীর কাছে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা করিতে যাইতেন এবং অনেক দিন তাঁহার কাছে শিক্ষালাভ করেন।

রাসে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পড়াইতে পড়াইতে নীলমণিবাবু শাস্ত্রী মহাশয় ও রাখালদাসের প্রসঙ্গ তুলিতেন। প্রাচীন শিলালিপি ও প্রাচীন মুদ্রা পাঠে রাখালদাসের অসাধারণ দক্ষতার কথা তাঁহার কাছেই প্রথম শুনি। এম. এ. পাশ করার পরে যখন আমি প্রাচীন ভারতে ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করি তখন তিনি ঐ দুইজনের কাছে আমাকে পরিচয়পত্র দেন। আমি প্রথমে শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে আমাকে বিশেষ উৎসাহ দিলেন না। কথা প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন,—‘রাখাল ব্লক সাহেবের কাছে শিখেছে। তুমি ওদের সঙ্গে দেখা কর।’

এইভাবে রাখালদাসের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। তাঁহার বাড়িতে গিয়া দেখি—পরণে স্বন্দর কোঁচানো ধূতি, গায়ে গিলে-করা ফিনকিনে আদ্রির পাজাবী এবং গলায় কোঁচানো চাদর—এক যুবক একটি খুব তেজী ঘোড়া ছুতিয়া নিজেই গাড়ি হাঁকাইয়া বাহির হইবার উপক্রম করিতেছেন। তিনি বলিলেন, ‘একটা নতুন ঘোড়া কিনেছি। তাকে সায়েস্তা করতে হবে—তাই গাড়ি নিয়ে বেরুচ্ছি।’

ইহার পরও কয়দিন রাখালদাসের সঙ্গে দেখা হইয়াছে। কথাবার্তা কি হয়েছিল তাহা আরজ আর মনে নাই। কিন্তু তাঁহার বাবুয়ানি পোশাকের স্ব্ভিটিই মনে আছে।

তারপর একদিন কলিকাতার সিনেট হাউসে হঠাৎ তাঁহার সঙ্গে দেখা। সেখানে ঢাকার নলিনীকান্ত ভট্টশালীও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহার দুইজনেই আজ পরলোকে। সুতরাং কি ঘটনাচক্রে সেখানে দেখা—সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার প্রসঙ্গ বিশেষ কোন কারণে আমি সবিস্তারে বর্ণনা করিতে চাই না। মোটের উপর সেদিন আমরা তিনজনে ভারতের

প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। তখন এ বিষয়ের চর্চা খুব বেশী ছিল না—আলোচনা করার লোকও বেশী ছিল না। সুতরাং আমাদের তিন জনেরই এই বিষয়ে আগ্রহ থাকায়, আলোচনা খুব জমিয়া উঠিল। তাহার পরও রাখালদাসের সঙ্গে কয়েকদিন দেখাশোনা ও নানা আলোচনার মধ্য দিয়া আমাদের পরিচয় আরও নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ হইয়া ওঠে।

ইহার পর সরকারী চাকুরি পাইয়া আমি ঢাকায় চলিয়া গেলাম। ঢাকায় হংরেজি স্কুলের শিক্ষকদের শিক্ষা দিবার জন্ত একটি ট্রেনিং কলেজ ছিল। আমার উপর ভার ছিল সেই শিক্ষকদের ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া এবং কি ভাবে ইতিহাস পড়াইতে হইবে তাহাই শিক্ষা দেওয়া। এ কাজ আমার ভাল লাগিত না। আমি অবসর মত ভারতের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে পড়াশোনা করিতাম।

এই সময় রাখালদাসের প্রাচীন বাঙ্গলার ইতিহাস প্রকাশিত হইল। ঢাকাতে তখন 'প্রতিভা' নামে একখানি মাসিকপত্র ছিল। সম্পাদক ছিলেন অবিনাশ মজুমদার। তিনি এই গ্রন্থ সমালোচনার ভার আমার উপর দিলেন। মনের মত একটা কাজ পাইয়া খুব উৎসাহে এই বই পড়িতে আরম্ভ করিলাম। তখন আমার বয়স অল্প, পরের ভুল ধরিবার প্রবৃত্তিটা খুবই প্রবল। রাখালদাসের বাঙ্গলার ইতিহাস খুব মনোযোগ দিয়া পড়িলাম এবং অনেকগুলি ভুল বাহির করিলাম। যতদূর মনে পড়ে 'প্রতিভা' পত্রিকার পর পর দুই কি তিন সংখ্যায় আমার বিস্তৃত সমালোচনা বাহির হইল। রাখালবাবু তখন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক, সুতরাং আমার প্রত্যেক উক্তিটির স্বপক্ষে যথাসাধ্য যুক্তি ও নজির দেখাইলাম। ওই কারণেই সমালোচনা সুদীর্ঘ হইয়াছিল। কিন্তু পুস্তকের প্রশংসাও করিয়াছিলাম এবং খুব বিনয় সহকারেই ভুলত্রুটিগুলির উল্লেখ করিয়াছিলাম।

সমালোচনা প্রকাশিত হইবার পর ভয় হইল যে রাখালবাবু হয়ত আমার উপর খুব রাগ করিবেন। ভরসার মধ্যে ছিল এই যে ইহার পূর্বে রাখালবাবুর সঙ্গে যে অল্প আলাপ আলোচনা হইয়াছিল তাহাতে আমরা দুইজনেই ঐতিহাসিক মতামত প্রকাশের ব্যাপারে নিরপেক্ষ, নির্ভীক ও স্বাধীন আলোচনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছিলাম। কিন্তু তবু ভয় একেবারে খুঁচিল না।

মনের এই অবস্থা লইয়াই ছুটি উপলক্ষে কলিকাতায় আসিলাম। কয়েকদিন পরেই সুহৃদ্বর কালিদাস নাগের সঙ্গে দেখা। রাখালদাসের সম্বন্ধে আমার যে স্মৃতি তাহার সহিত কালিদাস ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। এই জন্ত তাঁহার সম্বন্ধে দুই একটি কথা এখানেই বলিয়া রাখি। কালিদাস নাগ আমার চেয়ে বয়সে কিছু ছোট। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে বিশেষ অগ্ররাগ থাকায় আমার ও রাখালদাসের সঙ্গে তাঁহার পরিচয়। ক্রমে এই পরিচয় আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব পরিণত হয়। কালিদাস ছিলেন মিষ্টভাবী, বিনয়নম্র স্বভাবের লোক—পরবর্তীকালে রাখালবাবুর সঙ্গে কাহারও কলহ হইলে মিটাইবার

জন্ম আমরা তাঁহাকেই নিযুক্ত করিতাম। রাখালদাসও কালিদাসকে খুব মেহ করিতেন। কালিদাস আমার ভবানীপুর বাসার কাছেই থাকিতেন। তাঁহার বাসস্থান ছিল আলিপুরের চিড়িয়াখানা। পাছে কেহ ইহার অসঙ্গত ব্যাখ্যা করেন সেইজন্য বলিয়া রাখা ভাল যে কালিদাসের মামা ছিলেন চিড়িয়াখানার অধ্যক্ষ এবং ইহার মধ্যে তাঁহার জন্ম একটি নির্দিষ্ট বাসভবন ছিল। কালিদাস নাগ সেখানেই থাকিতেন।

কালিদাস নাগের কাছে সব কথা খুলিয়া বলিলাম। তাঁহার সহিত রাখালদাসের কি কথাবার্তা হইয়াছিল জানি না। কালিদাস খুব প্রফুল্ল মুখে আসিয়া আমাকে জানাইলেন যে রাখালদাস সমালোচনা পড়িয়া রাগ করেন নাই বরং তাঁহার বহু ভুলত্রুটি দেখাইবার জন্য তিনি বিশেষ কৃতজ্ঞ। কালিদাস বলিলেন যে ইহার প্রমাণ স্বরূপ তিনি নিজে তাঁহার নূতন বই 'প্রাচীন মুদ্রা'র পাণ্ডুলিপি আমাকে দিবেন এবং আমি উহার ভুলত্রুটি যত দেখাইতে পারিব তিনি ততই খুশী হইবেন।

আমার বৃকের মধ্য হইতে একটা গুরুতর ভার নামিয়া গেল। সত্য সত্যই রাখালবাবু নিজে আসিয়া ঐ পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আমার কাছে রাখিয়া গেলেন এবং আমিও বিশেষ মনোযোগের সহিত উহা পড়িয়া আমার মন্তব্য সহ তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম। এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখি, রাখালবাবুর লেখায় এত ভুলচুক কেন থাকিত—যদিও ইহা তখন জানিতাম না, পরে স্বচক্ষে দেখিয়াছিলাম।

রাখালবাবু ছিলেন খুব আয়েষী লোক। নিজের হাতে প্রায় কিছুই করিতেন না। চাকরে জামাকাপড় পরাইয়া দিত, জুতার ফিতা বাঁধিয়া দিত। খাওয়ার পরে আর একজন হাতে জল ঢালিয়া না দিলে তিনি মুখ ধুইতে পারিতেন না। লেখার বেলায়ও তাই। অফিস হইতে কিরিবার সময় তাঁহার টাইপিষ্ট ভূদেববাবুকে সঙ্গে লইয়া বাড়ি কিরিতেন। জলযোগান্তে এক আরাম কেদারায় শুইয়া তিনি গড়গড়ায় তামাক টানিতেন। সঙ্গে সঙ্গে মুখে বলিয়া যাইতেন আর ভূদেববাবু লিখিয়া লইতেন। কঠিন শব্দ হইলে রাখালদাস বানান করিয়া বলিতেন। তাঁহার ইতিহাস, উপজ্ঞাস সবই যে এইভাবে লেখা, রাখালবাবু নিজেই তাহা আমাকে বলেন। পরে দুই একবার এই দৃষ্ট নিজেও দেখিয়াছি। এইভাবে লেখায় যে অনেক ভুলচুক থাকিবে তাহাতে আশ্চর্য বোধ করিবার কিছু নাই। এই লেখা দেখিয়া সংশোধন করিবার লোকও তখন বিশেষ মিলিত না। স্বতরাং এই সংশোধন ব্যাপারের মধ্য দিয়াই আমার সঙ্গে রাখালবাবুর ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হইল।

১৯১৪ সালে আমি ঢাকার চাকুরি ছাড়িয়া কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যোগ দিই। ইহার পর তিন চার বৎসর রাখালবাবুও কলিকাতায় ছিলেন। স্বতরাং পূর্বকায় ঘনিষ্ঠতা অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বে পরিণত হইল। তখন ভারতের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে বাহারা চর্চা করিতেন তাঁহাদের মধ্যে আট দশ জনকে লইয়া একটি বিনিষ্ট বগলী গঠিত হইল। এই দলটি ধীরে ধীরে আপনা আপনি গড়িয়া উঠিয়াছিল। রীতিমত কোন সভা করিয়া বা নিয়মাবলী তৈরি

করিয়া ইহার সৃষ্টি হয় নাই। ইহার পর চল্লিশ বৎসরেরও বেশী কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু অনেকটা অস্পষ্ট হইলেও এই দলের স্মৃতিটি এখনও মনে জাগিয়া আছে। রাখালবাবুর বাড়িতেই এই দলের বেশি বৈঠক বসিত; কিন্তু ঘুরিয়া ফিরিয়া দলের অল্প কয়েকজনের বাড়িতেও আমরা মিলিত হইতাম। দলের মধ্যে ছিলেন 'ঢাকার ইতিহাস' প্রণেতা যতীন্দ্রমোহন রায়, তখনকার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর সুপারিন্টেন্ডেন্ট হরেন্দ্রনাথ কুমার, রাখালবাবুর বিশিষ্ট বন্ধু ও প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রামদাস সেনের পুত্র বোধিসত্ত্ব সেন কালিদাস নাগ, হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রভৃতি। হেমবাবু ছিলেন রাখালবাবুর আন্তরিক সহৃদয় ও প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতত্ত্ববিভাগের অধ্যাপক। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস চর্চায় তাঁহার খুব আগ্রহ ছিল এবং এই জগৎই পুত্র চারুচন্দ্রকে উক্ত ইতিহাস পড়াইয়াছিলেন। ননীগোপাল মজুমদারও কিছুদিন পরে এই দলে ভর্তি হইয়াছিলেন; তিনি তখন সংস্কৃত কলেজে আই. এ. ক্লাসের ছাত্র। রাখালবাবুর বাড়িতেই তাঁহার সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ। রাখালবাবু তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিলেন—একজন budding Archaeologist. রাখালবাবুর এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছিল।

রামপ্রসাদ চন্দ্র কলিকাতায় আসিলে মাঝে মাঝে এই দলের বৈঠকে যোগ দিতেন। আরও কয়েকজন মাঝে মাঝে আসিতেন। কথা-সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে আমি প্রথমে রাখালবাবুর বাড়িতেই দেখি। তখন তিনি কেবল রেজুন হইতে ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতায় বসবাস আরম্ভ করিয়াছেন। আর দুইজন লোকও এই দলের সহিত বিশেষ ভাবে জড়িত ছিলেন। একজন রাখালবাবুর অকিসের স্টেনোগ্রাফার ভূদেববাবু, আর একজন সাহিত্য পরিষদের রামকমলবাবু।

সিমলা স্ট্রীটে রাখালবাবুর বাড়িতে বহু সন্ধ্যায় আমরা মিলিত হইয়াছি। মিষ্টানের ব্যবস্থা যে প্রচুর পরিমাণে হইত তাহা বলাই বাহুল্য। রাখালবাবু লোককে খাওয়াইতে ভালবাসিতেন এবং তাহার জন্ত ব্যবস্থাও করিতেন রাজসিক ভাবেই। ইহার বহু দৃষ্টান্ত এখনও মনে আছে। রাজসিক জলযোগ ছাড়াও মাঝে মাঝে রীতিমত নৈশভোজের ব্যবস্থা থাকিত।

এই বিবরণ হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে তুরি ভোজনই এই দলটির একমাত্র কার্য ও কাম্য ছিল। বস্তুত ভারতের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে সকলেরই একটা আন্তরিক অঙ্গুরাগ ছিল এবং তাহার জন্ত কিছু কিছু গঠনমূলক কার্যও আমরা করিয়াছি। এ বিষয়ে কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

তখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রচন্দ্র জিবেদী, বোমকেশ মুস্তকী প্রভৃতি ইহার কর্ণধার। পরিষদের সংলগ্ন 'রমেশ-ভবনে' একটি চিত্রশালা এখন মূল্যবান সম্পদে পরিপূর্ণ। কিন্তু তখন যে সমুদয় প্রাচীন স্মৃতি ও মুদ্রা সংগৃহীত হইয়াছিল তাহার কোন তালিকা বা বিবরণ ছিল না। এইটি

সংস্কারের ভার ত্রিবেদী মহাশয় রাখালবাবুর হাতে দিলেন। রাখালবাবুও আমাদের কয়েক জনকে লইয়া মহা উৎসাহে কাজে লাগিয়া গেলেন। প্রাচীন মুদ্রা ও মূর্তিগুলি কাল ও ভ্রমের অল্পসারে সাজাইয়া তাহার যথাযথ তালিকা ও বিবরণী প্রস্তুত হইয়াছিল। এই বিষয়ে রাখালবাবুই ছিলেন আমাদের নেতা। তাঁহার উপদেশ ও নির্দেশ মতই আমরা চলিতাম। পরিষদের কয়েকজন বিশিষ্ট সভ্যও আমাদের সহায়তা করিতেন।

কিন্তু ক্রমে একটা বিষয় গোলযোগের সৃষ্টি হইল। তখনকার দিনে একজন প্রাচীন ঐতিহাসিক বর্তমান কালের বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ইতিহাস চর্চার ধার ধারিতেন না। কিম্বদন্তী, কুলশাস্ত্র প্রভৃতির প্রতি তাঁহাদের অগাধ ঞ্জ্ঞা ছিল। ইহাদের সাহায্যে তাঁহারা অনেক চমকপ্রদ তথ্য আবিষ্কার করিয়া শিক্ষিত সমাজে প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন এবং কেহ কেহ বেশ অর্থও উপার্জন করিতেন। এইরূপ ঐতিহাসিকেরা কিরূপ প্রণালীতে বড়লোক বশ করিতেন তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছি।

একদিন বড়লাট লর্ড কারমাইকেল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পরিদর্শন করিতে আসিলেন। বলা বাহুল্য এই সম্পর্কে অনেক নামজাদা লোকেরও সমাগম হইয়াছিল। আমার উপর ভার ছিল, মূর্তি ও মুদ্রা প্রভৃতি ব্যাখ্যা করিবার।

লর্ড কারমাইকেল কিছু কিছু ব্যাখ্যা শুনিয়া অত্যন্তই গেলেন।

একটু পরেই রাধাচরণ পাল আসিলেন। ইনি স্বপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণদাস পালের পুত্র ও কলিকাতা পৌরসভার একজন প্রভাবশালী সভ্য ছিলেন। আমি কিছু বলিবার আগেই একজন প্রাচীন ঐতিহাসিক তাঁহাকে বলিলেন, “এই দেখুন আপনার পূর্ব-পুরুষের কীর্তি।” অর্থাৎ বাংলার পাল সম্রাটেরা রাধাচরণ পালের পূর্ব-পুরুষ, যেহেতু উভয়েরই উপাধি ‘পাল’। সুতরাং পালযুগের মূর্তি প্রভৃতি প্রাচীন নিদর্শন রাধাচরণ পালের পূর্ব-পুরুষেরই কীর্তি।

পাল মহাশয় শুনিয়া ত মহা খুশি। খ্রীচন্দ্ৰের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত ঐতিহাসিক তখনকার ধনী ও স্বপ্রসিদ্ধ এটর্নি গণেশচন্দ্র চন্দ্রের (নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের পিতা) বাড়িতে উপস্থিত। ঐতিহাসিক বলিলেন—“এইবার আপনাদের প্রাচীন বংশের সন্ধান মিলেছে। আপনার পূর্ব-পুরুষেরা যে কত বড় রাজা ছিলেন এতদিনে তা’র টের পাওয়া গেল।” এই ঐতিহাসিক বহু কুলশাস্ত্র সংগ্রহ করেন এবং আদিশুর সম্বন্ধে বহু তথ্য জাহির করেন। যখন নূতন তাম্রশাসন আবিষ্কারের ফলে তাঁহার কোন তথ্য ভুল বলিয়া প্রতিপন্ন হইত তখন তিনি অমনি আর একখানি কুলশাস্ত্র আবিষ্কার করিতেন—তাহাতে ঐ নূতন তথ্যটি যথাযথভাবে লিখিত থাকিত। অনেকেরই সন্দেহ ছিল যে কুলশাস্ত্রের পুঁথি জাল হইত। নূতন লেখা পুঁথিকে কি প্রণালাতে অতি প্রাচীন জীর্ণকীর্তি কীটদষ্ট পুঁথিতে পরিণত করা যায় একবার এক ভদ্রলোক তাহা আমার নিকট বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছিলেন যে তিনি একরূপ বহু পুঁথি জাল করিয়াছেন।

রাখালবাবু ইতিহাসের এই কদম্ব কলঙ্কে দূর করিবার জন্য বহু পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

আমাদের দলের মধ্যেও এ বিষয়ে খুব উৎসাহের সঞ্চার হয়। কিন্তু যে প্রাচীন ঐতিহাসিক এই দোষে বিশেষভাবে দোষী বলিয়া রাখালবাবু তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন তাঁহার তখন সমাজে লক্ষপ্রতিষ্ঠ এবং সাহিত্য পরিষদে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী প্রভৃতিও তাঁহাদের পক্ষে। স্তত্রাং প্রথমে বাদানুবাদ ও পরে তুমুল কলহ আরম্ভ হইল। সেই দিনকার সে সব বাকবিতণ্ডা কিরূপ তাণ্ডবে পর্যবসিত হইয়াছিল এবং বন্ধুবিচ্ছেদ ও সাহিত্য পরিষদের ভিত্তি শিথিল করিবার উপক্রম করিয়াছিল তাহা আজ সবিস্তারে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। মোটের উপর রাখালবাবুর ও সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দলের উপর সাহিত্য পরিষদের কর্তৃকর্তারা বিষম চটিয়া গেলেন। আমরাও কিছুদিন পরিষৎ হইতে দূরে রহিলাম।

এই সংঘর্ষের ফলে একদিকে যেমন পরিষদের প্রধান নায়কেরা আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন অতদিকে তেমনি রাজসাহীর বরেন্দ্র পন্ডিতদের দল আমাদের সঙ্গে মিলিত হইলেন। এই দলের তিনজন কর্ণধার ছিলেন—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শরৎকুমার রায় ও রমাশ্রাদ্দ চন্দ। পরে রাখাগোবিন্দ বসাকও এই দলে যোগ দেন। কোন ব্যক্তিগত কারণে রাখালবাবুর ও এই দলের মধ্যে মনোমালিগ্ন ছিল। কিন্তু কুলশাস্ত্রের জালিয়াতির বিরুদ্ধে যখন রাখালবাবুর নায়কতায় আমাদের সঙ্গে স্বর্গীয় সাহিত্য পরিষদের গোলযোগ বেশ তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে তখন আমাদের সঙ্গে ইহাদের মিলন ঘটিল। একজন প্রবীণ ও প্রাচীন ঐতিহাসিকের বিরুদ্ধে গোপনে একটি ষড়যন্ত্র হইল। তিনি একখানি কুলশাস্ত্রের একটি কি দুইটি শ্লোকের সাহায্যে একটা খুব বড় রকম তথ্যের আবিষ্কার করেন। যখন তাঁহাকে এ পুঁথি দেখাইতে বলা হইল, তিনি জবাব দিলেন যে নড়াইলের নিকটবর্তী একটি দুর্গসিগম্য গ্রামে এ পুঁথি আছে—কিন্তু পুঁথির মালিক (এক বিধবা ব্রাহ্মণী তাহা কিছুতেই হাতছাড়া করিবেন না। বরেন্দ্র সমিতি তাঁহাদের এক পণ্ডিতকে পাঠাইয়া এ পুঁথি হইতে প্রয়োজনীয় অংশ নকল করিয়া আনিলেন। দেখা গেল যে পূর্বের উপরের শ্লোকগুলি ঠিকই আছে, কিন্তু যে শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া পূর্বোক্ত প্রবীণ ঐতিহাসিক এক অভিনব মৌলিক তথ্যের আবিষ্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহার কোন সন্ধানই মিলিল না। আমরা ইহা গোপন রাখিয়া পরিষদের কর্তৃপক্ষকে বলিলাম যে, প্রকাশ্য এক সভায় এই বিষয়ে আলোচনা করা হউক। প্রবীণ ঐতিহাসিক সন্মত হইলেন। সভার দিনও নির্দিষ্ট হইল। কিন্তু কার্যকালে ঐতিহাসিক মহাশয় বেমালুম গা চাক দিলেন। এই রূপে বিনা যুদ্ধেই আমাদের জয় হইল।

এই সময়ে প্রায়তত্ত্ববিভাগের অধ্যক্ষ পণ্ডিত সুন্যর পাটনার খননকার্য করিতেছিলেন। তিনি এক স্বর্গীয় প্রবন্ধ পাটনার ধ্বংসাবশেষ আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতে অরখুন্দীয় ধর্মাবলম্বী পারসীক (অথবা) সম্ভ্যতাই ভারতে প্রবল ছিল—এমন কি গৌতম বুদ্ধও ইরাণীয় ছিলেন ইত্যাদি।

সুতরাং ভারতে ঐ যুগকে জরথুষ্ট্রীয় যুগ বলাই সঙ্গত। রাখালবাবু তখন প্রকৃতই বিভাগে কাজ করেন। সুতরাং আমাদের দল হইতে প্রকাশ্যভাবে প্রতিবাদ করা সঙ্গত হইবে না। সেইজন্য 'Nimrod' (নিমরোদ) এই বেনামীতে শ্রীহরেন্দ্রনাথ কুমার মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধে ইহার তীব্র প্রবিবাদ করেন।

তখন দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর ও কানীপ্রসাদ জয়সোয়াল দুইজনেই কলিকাতায় ছিলেন। দুই জনেই ভারতের প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। কিন্তু কতকগুলি কারণে রাখালবাবুর সহিত ভাণ্ডারকরের বিষয় মনোমালিণ্য ঘটিয়াছিল। কিন্তু ইহা যে কত গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছিল তাহা প্রথমে বুঝিতে পারি নাই। নিম্নলিখিত ঘটনাতে তাহা টের পাইলাম।

পূর্বেই বলিয়াছি ভূরিভোজের ব্যবস্থাটা বরাবরই আমাদের দলের একটা নৈশিষ্টা ছিল। সাধারণতঃ রাখালবাবুই ইহার ব্যবস্থা করিতেন। একবার আমার বাড়িতে সকলের নৈশভোজনের ব্যবস্থা হইল। আমি ভাণ্ডারকরকেও নিমন্ত্রণ করিলাম। ঘটাসময়ে সকলেই উপস্থিত হইলেন। কিন্তু রাখালবাবু আসিয়া যেই সন্মিলন যে ভাণ্ডারকরকেও নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে অমনি বলিলেন ভাণ্ডারকর আসিলে তিনি আমার বাড়িতে অগ্রগ্রহণ করিবেন না। বন্ধুরা সকলেই বুঝাইলেন—কিন্তু রাখালবাবু কিছুতেই গোঁ ছাড়িলেন না। আমার তখনকার অবস্থা সকলেই বেশ বুঝিতে পারিবেন। আমি অগত্যা হেমচন্দ্র দাশগুপ্তের শরণাপন্ন হইলাম। আমাদের দলের মধ্যে তিনিই রাখালবাবুর সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এবং একমাত্র তাঁহাকেই রাখালবাবু কিছুটা সমীহ করিতেন—ইহা আমি জানিতাম। সুতরাং তাঁহাকে বলিলাম যেভাবেই হউক আমাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করুন। আমি তখন ভবানীপুরে থাকিতাম। যে কোন মুহূর্ত্তে ভাণ্ডারকর আসিতে পারেন—তাহা হইলে একটা কেলেঙ্কারি ব্যাপার হইবে। হেমবাবু রাখালবাবুকে লইয়া বাহির হইয়া হরিশ মুখার্জী রোডে গেলেন। সেখানে অনেক রকম বুঝাইলেন এবং সর্বশেষে বলিলেন যে রাখালবাবু যদি আমাকে এইরূপ অপদস্থ করেন তবে তিনি আর কখনও তাঁহার বাড়িতে জলগ্রহণ করিবেন না। যাহা হউক কোন রকমে তিনি রাখালবাবুকে রাজি করাইয়া সঙ্গে নিয়া আসিলেন। ইতিমধ্যে ভাণ্ডারকর আসিয়া রাখালবাবুর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন—আমরা বলিলাম, তিনি এখনও আসেন নাই। একটু পরেই হেমবাবু ও রাখালবাবু ফিরিলেন। আশ্চর্যের বিষয় রাখালবাবু এমন স্বাভাবিকভাবে ভাণ্ডারকরের সঙ্গে কথাবার্তা বলিলেন যেন উভয়ের মধ্যে কোন গোলমালই নাই। তারপর খুব আনন্দের মধ্যে আহার-পর্ব শেষ হইল। যতীন রায় ২০টি হাঁসের ডিম খাইলেন (তখনও বাড়িতে মুরগীর ডিম চালা হয় নাই)। হেমবাবু দেড় সের নই খাইলেন। এই রকম এক একটি আহার্য বিষয়ে এক একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ইহা আমাদের সকলের জানা ছিল। রাখালবাবুর বাড়ির পাড়ারোডেই তাহার প্রথম পরিচয় পাইয়াছিলাম। কে কোন জিনিস কত বেশি খায়

রাখালবাবুর তাহা মুখস্থ ছিল এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা থাকিত। এই জন্ত আমাদের কাহারও বাড়িতে খাওয়ার ব্যবস্থা থাকিলেও খুব অসুবিধা হইত না।

রাখালবাবু যে কেবলই বাড়িতেই খাওয়াইতেন তাহা নহে। রেল-পথে ভ্রমণের সময়েও এদিকে তাঁহার দৃষ্টি থাকিত। একবার পাটনায় কোন সম্মেলন উপলক্ষে আমরা কয়েকজন একসঙ্গে কলিকাতা হইতে রওনা হইলাম। রাজে খাওয়ার পরে যাত্রা করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে পৌছিয়া জয়সোয়ালের বাড়িতে উঠিব এইরূপ ব্যবস্থা ছিল, স্ত্রতরাং সঙ্গে খাবার লইবার কোন ঝগড়াটের বালাই ছিল না। হাওড়ায় একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় রাখালবাবু, আমি, যতীন রায়, রামকমলবাবু ও আর একজন এবং পার্শ্বের কামরায় আরও দুই তিন জন ছিলেন। রাখালবাবুর সঙ্গে দেখিলাম দুইটি বড় ঢাকা ডেক্‌চি। জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহার মধ্যে কি? তিনি বলিলেন—ও জয়সোয়ালের জন্ত কিছু মিঠাই। রাজে উপরের বাক্সে ঘুমাইয়া আছি, অকস্মাৎ রাখালবাবুর চীৎকারে ঘুম ভাঙিল। আমার উদ্দেশ্যে কয়েকটি অশ্রীল সোধোধন করিয়া যাহা বলিলেন তাহার মর্মার্থ এই যে ডেক্‌চিতে আড়াই সের মাংসের কোণ্ডা ছিল—যতীন রায় টের পাইয়া তাহা খাইতে আরম্ভ করে—পরে আরও দুই একজন যোগ দিয়াছে এবং ডেক্‌চি খালি হইতে বেশি দেরি নাই, স্ত্রতরাং তাড়াতাড়ি আমি যদি নামিয়া না আসি তবে আমার ভাগ্যে পড়িবে শূন্য। নামিয়া দেখিলাম, তখতও মহানন্দে ভোজন-পর্ব চলিতেছে। আমিও যোগ দিলাম। দেখিতে দেখিতে সেই বৃহৎ ডেক্‌চি একেবারে খালি হইল। ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম। তখন মাজি দুইটা।

পরদিন দুপুরে জয়সোয়ালের বাড়িতে খাইতে বসিয়া এত বেশি খাওয়া আরম্ভ হইল যে দেখিতে দেখিতে ভাত, রুটি সব শেষ হইয়া গেল। ভয়ে জয়সোয়াল বেচারী মহা লজ্জিত হইল। কিন্তু রাজে ডবল বন্দোবস্ত হইল এবং বহু খাবার নষ্ট হইল।

এই প্রসঙ্গে পুণায় নিখিল ভারতীয় প্রাচ্য সম্মিলনীর (All India Oriental Conference) প্রথম অধিবেশনের কথা মনে পড়িতেছে। রাখালবাবু তখন পুণায় প্রত্যুত্তম বিভাগের কর্তা। কিন্তু কোন কারণে তিনি সম্মিলনীর কর্তৃপক্ষের সহিত বগড়া করিয়া অধিবেশনে যোগদান না করিয়া পুণায় বাহিরে চলিয়া গেলেন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে আমরা অনেকে এই অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলাম। আমরা ডেলিগেটদের জন্ত নির্দিষ্ট স্থানে ছিলাম। কিন্তু আহারের ব্যবস্থা ছিল খুব খারাপ। প্রথম দিন আমাদের পেটই ভরিয়া না। প্রৌঢ় সতীশচন্দ্র বিদ্যভূষণ ও মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ ওর্কডুষণ আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তাঁহারা আমাকে বলিলেন যে, অন্য কোন ব্যবস্থা না করিলে তো আর প্রাণ বাঁচেন না। আমি (এবং আর একজনও আমার সঙ্গে ছিলেন, কিন্তু কে, তাহা ঠিক মনে নাই) রাখালবাবুর বাড়ির সন্ধানে চলিলাম। জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া বাড়ি খুঁজিয়া বাহির করিলাম। চাকর বলিল, বাবু বাড়ি নাই। তাহা জানিতাম—স্ত্রতরাং

রাখালবাবুর বড় ছেলে তুলসীকে (তখন ছেলেমানুষ—সে অল্প দিন পরেই মারা যায়) বলিলাম—‘তোমার মাকে বল দরজার আড়ালে দাঁড়াতে—অনেক কথা আছে।’ রাখাল বাবুর স্ত্রী আমাদের দলের সকলকেই বেশ জানিতেন। কিন্তু কখনও আমাদের সামনে আসিতেন না। তিনি দরজার ওপাশে আসিয়া দাঁড়াইবার পর আমি তাঁহাকে সব অবস্থা খুলিয়া বলিলাম এবং পরদিন দুপুরে তাঁহার ওখানে খাইতে আসিব তাহাও জানাইলাম।

ছেলের মারফৎ তিনি জানাইলেন যে সেই রাজ্জেই যেন আমরা তাঁহাদের বাড়িতে খাই। আমি বলিলাম—তাহাতে অনেক অসুবিধা হইবে। পরদিন মধ্যাহ্ন-ভোজনের ব্যবস্থা পাকাপাকি করিয়া ফিরিয়া আসিয়া খবর দিলাম।

পরদিন খুব ভোরে, তখনও আমাদের ভাল করিয়া ঘুম ভাঙে নাই, আমরা বিছানায় শুইয়া আছি। দরজায় দুমদাম শব্দ আর অশ্রাব্য গালাগালি। ব্যাপার বুঝিতে দেহি হইল না। দরজা খুলিয়া দেখি স্বয়ং রাখালবাবু। তিনি সম্ভবতঃ পুণার কাছেই কোথাও ছিলেন—আমাদের খবর পাইয়াই রাতারাতি ফিরিয়াছেন। তাহার পর রোজ তাঁহার বাড়িতে ভূরি ভোজনের ব্যবস্থা। অধিবেশন শেষ হইবার পরও আমাকে কয়েক দিন তাঁহার বাড়িতে থাকিতে হইল। তিনি কিছুতেই আসিতে দিলেন না।

আমি পুণার কাছাকাছি অনেক ঐতিহাসিক স্থান এমন কি শিবাজীর দুই একটি দুর্গও দেখিবার সুযোগ পাইলাম। ওদিকে বোম্বাই হইতে মাছ ও টেলিগ্রাম করিয়া কলিকাতা হইতে মিষ্টান্ন আনিবার ব্যবস্থাও হইয়াছিল।

পুরাতত্ত্বের প্রতি রাখালবাবুর একটি সহজাত আন্তরিক নিষ্ঠা ছিল। একদিন কলিকাতায় জাদুঘরে তাঁহার অফিস ঘরে গিয়া দেখি দেয়ালে একটি ছোট প্রাচীন লেখের প্রতিলিপি টাঙানো। আর রাখালবাবু গভীর অভিনিবেশ সহকারে সেটা দেখিতেছেন। আমাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন যে এই লিপিটি তক্ষশিলায় পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু অক্ষরগুলি অপরিচিত—প্রাচীন ব্রাহ্মী অথবা খরোষ্ঠী নয়। পশ্চিম এশিয়ায় প্রাচীন যুগে ব্যবহৃত অক্ষরগুলির নমুনা পাইলে হয়ত পড়িতে পারিতাম। কিন্তু যে সব বইয়ে এই সব অক্ষরের নমুনা আছে তাহার অনেক বই-ই এখানে পাওয়া যায় না। কদিন ধরিয়া চেষ্টা করিতেছি কিন্তু কিছুই করিতে পারি নাই। রাখালবাবুর অহুমান খুবই ঠিক ছিল। কারণ এই লিপিটি আরামীয় অক্ষরে লেখা অশোকের লিপি। কিছুদিন পরে একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত ইহার পাঠোদ্ধার করেন। প্রয়োজনীয় বইগুলি এদেশে পাওয়া গেলে রাখালবাবুই হয়ত ইহার পাঠোদ্ধার করিতে পারিতেন।

মহেঞ্জোদাড়োর ধ্বংসাবশেষ হইতে যে সকল প্রাচীন চিত্রলিপিযুক্ত সীল বা মুদ্রা এবং অন্তান্ত জিনিস পাওয়া গিয়াছিল এদেশে উপযুক্ত গ্রন্থের অভাবে তাহার প্রাচীনত্ব এবং পশ্চিম এশিয়ার প্রাচীনতম সভ্যতার নিদর্শনের সহিত তাহার নিকট সম্বন্ধের কথা রাখালবাবু সঠিক ধরিতে পারেন নাই। মহেঞ্জোদাড়োর ধ্বংস আবিষ্কারের কৃত্তি তাঁহারই এবং ইহার জন্ত

প্রত্যন্ত অগতে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। কিন্তু ইহার যথাযথ প্রকৃতি নির্ধারণ করিবার গৌরবও বিদেশী পণ্ডিতেরাই অর্জন করিয়াছেন। আমার বেশ মনে আছে কলিকাতার বাড়িতে বসিয়া রাখালবাবু আমাকে ইহার কতকগুলি নিদর্শন দেখাইয়া বলিয়াছিলেন যে এ যাবৎ ভারতে প্রাচীন যুগের যে সব নিদর্শন বাহির হইয়াছে এগুলি তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং অনেক বেশি প্রাচীন। কিন্তু প্রথমে ইহার বেশি আর তিনি অগ্রসর হইতে পারেন নাই।

রাখালবাবু কিভাবে মহেঞ্জোদাড়োর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার কার্ণে ব্রতী হন সে সম্বন্ধে তাঁহার নিকট যাহা শুনিয়াছি তাহাই লিখিতেছি। বিশেষ কারণে কিছু কিছু বাদ দিয়া লিখিতে হইতেছে। কারণ এই কাহিনীর দুইজন প্রধান নায়কই আজ পরলোকগত এবং আমার বিশেষ বন্ধু ও শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

ঘটনাটা একটু গোড়া হইতেই আরম্ভ করিতে হয়। পূর্বেই বলিয়াছি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারমাইকেল অধ্যাপক দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর ও রাখালবাবুর মধ্যে বিশেষ মনোমালিন্য ছিল। কি কারণে ইহার আরম্ভ হয় সঠিক বলিতে পারি না। 'প্রবাসী' ও 'Modern Review' পত্রিকায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ভাণ্ডারকরের বিরুদ্ধে অনেক গ্লেষ ও বিজ্ঞাপনক মন্তব্যযুক্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ায় উভয়ের মধ্যে অসন্তোষ বাড়িয়া ওঠে। 'কাশিমের মার্কা' নামক প্রবন্ধ ইহার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রাগৈতিহাসিক যুগের একখানি প্রস্তর-স্রব্যে কয়েকটি অক্ষর দেখিয়া ভাণ্ডারকর অহমান করিয়াছিলেন এগুলি অতি প্রাচীন ব্রাহ্মী অক্ষরের নিদর্শন। কিন্তু এ লেখাটি বস্তুতঃ জাদুঘরের কর্মচারী 'কাশিম' নামক একজনের খোদিত একটি ইংরেজী তারিখ উল্টা করিয়া ধরিয়া পড়িবার ফলেই বিপত্তি ঘটিয়াছিল। এই ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া ভাণ্ডারকরের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করা হয় এবং তাঁহাকে শিক্ষিত সমাজে হাত্তাস্পদ করিবার চেষ্টার কোন জট হয় নাই। রাখালবাবু নিজের নামে কিছু লিখিতেন না বটে, কিন্তু এই লেখাগুলি যে তাঁহারই প্রেরণা ও চক্রান্তের ফল, এ সম্বন্ধে ভাণ্ডারকরের মনে কোন সন্দেহ ছিল না। আমারও এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এ বিষয়ে আমার কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই। কারণ রাখালবাবু এক বিষয়ে খুব উদার ছিলেন। আমি তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করি সুতরাং এই সমুদয় ব্যাপারে আমার কোন প্রকার যোগাযোগ থাকিলে আমার ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। এই জন্য রাখালবাবু বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত কোন ব্যাপারে আমাকে দলে টানিতেন না এবং যাহাতে আমার নাম কোন রকমে ইহার সহিত জড়িত না হয় তাহার সম্বন্ধে সতর্ক ছিলেন। আমিও এই সমুদয় ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতে অনিচ্ছুক ছিলাম এবং বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত সকল প্রকার আলোচনা ও যড়যন্ত্র হইতে দূরে থাকিতাম। কিন্তু তথাপি বন্ধু-বান্ধবদের নিকট যেটুকু শুনিয়াছি তাহাতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই যে ভাণ্ডারকরের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রের

পুনঃ পুনঃ তীব্র আক্রমণের মূলে ছিলেন রাখালবাবু। 'কাশিমের মার্কা' প্রবন্ধ বাহির হইবার পূর্বেই রাখালবাবুর মুখে কাশিমের গল্প শুনিয়াছিলাম এবং তিনি ভিন্ন জাহাজের এই সকল পুরনো কথা আর কাহারও জানিবার সম্ভাবনা ছিল না।

রাখালবাবুর সহিত ভাণ্ডারকরের যখন এই প্রকার অহিনকুল সংঘর্ষ তখন রাখালবাবু প্রত্যন্ত বিভাগের পশ্চিমচক্রের (Western Circle) অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইয়া পুণায় গমন করেন। ভাণ্ডারকরের বাড়িও পুণায় এবং তিনিও রাখালবাবুর পূর্বে উক্ত পশ্চিমচক্রের অধ্যক্ষ ছিলেন। রাখালবাবু পুণাতে যাইয়া ভাণ্ডারকরের বিরুদ্ধে অনেক কিছু সন্ধান করিয়া বাহির করেন। ক্রমে তাঁহার অফিসের লোকেরা টের পাইল যে রাখালবাবু ভাণ্ডারকরের প্রতি বিশেষ বিরূপ। ইহার ফলে সর্বত্র যাহা হইয়া থাকে এক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল। রাখালবাবুর অধীনস্থ কর্মচারীরা উপরিওয়ালাকে খুশি করিবার জন্ত ভাণ্ডারকরের বিরুদ্ধে অনেক রকম কুৎসা তাঁহার কর্ণগোচর করিতে লাগিল। একজন বলিল যে ভাণ্ডারকর যখন অধ্যক্ষ ছিলেন তখন সিন্ধু প্রদেশের একটি পুরাতন ধ্বংস সঙ্কে ভারত সরকার হইতে এক চিঠি আসে। তাহাতে নির্দেশ ছিল যে তিনি যেন উক্ত স্থান পরিদর্শন করিয়া একটা রিপোর্ট দেন। কিন্তু ঐ ধ্বংসাবশেষ যেখানে, সেখানে যাওয়া এবং থাকা ও খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা এত কষ্টকর ছিল যে ভাণ্ডারকর মূল ধ্বংসগুলি না দেখিয়াই লোকের মুখে খবর লইয়া একটা রিপোর্ট পাঠাইয়াছিলেন। রাখালবাবু এই খবর শুনিয়া খুব খুশি হইলেন। ইহা সত্য হইলে যে ভাণ্ডারকরের মারণান্ত্র তাঁহার হাতে আসিবে ইহা বুঝিতে তাঁহার দেরি হইল না। সুতরাং রাখালবাবু অবিলম্বে ঐ ধ্বংস দেখিতে যাইবার ব্যবস্থা করিলেন। ইহাই বিখ্যাত মহেনজোদাড়ো এবং এই ভাবেই ঘটনাচক্রে রাখালবাবু এই ধ্বংসস্থলের আবিষ্কার করেন। স্থানটি যে খুব দুরধিগম্য ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। রাখালবাবু নিজেই আমাকে বলিয়াছিলেন যে কয়দিন তিনি কেবল উটের মাংস খাইয়াই ছিলেন।

ভাণ্ডারকরের বিরুদ্ধে পূর্বোন্নিখিত সংবাদপত্রের মারফৎ আন্দোলন এবং মহেনজোদাড়ো অভিযান—এ দু'য়ের মধ্যেই ব্যক্তিগত আকোশ ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐতিহাসিক আলোচনার প্রকৃত আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হওয়ার বিরুদ্ধে একটি সতেজ প্রতিক্রিয়াশীল মনোবৃত্তির পরিচয়ও ইহার মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। রাখালদাসের স্বভাব ও চরিত্রের অনেক দোষ ছিল কিন্তু ঐতিহাসিক আলোচনার মধ্যে মেকি জিনিস তিনি কোন দিনই সহ্য করেন নাই। তিনি বরাবরই ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। ব্যক্তিগত কারণে এই প্রতিবাদ কখনও কখনও অসংযত ও রূঢ় আকার ধারণ করিলেও সেই সময়কার বাংলাদেশে এইরূপ নির্ভীক আলোচনার প্রয়োজন ছিল। বাংলা দেশের ঐতিহাসিক আলোচনার মধ্যে তখন কিরূপ মেকি চলিত আজকালকার তরুণ ঐতিহাসিকেরা তাহার সঠিক ধারণা করিতে পারিবেন না। বাংলাদেশে পরবর্তী কালে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে

ইতিহাস আলোচনার পদ্ধতি যে অনেকাংশে উন্নতি লাভ করিয়াছে—তাহার মূল রাখালবাবুর দান উপেক্ষণীয় নহে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ব্যাপারে তাঁহার এই মনোবৃত্তির প্রথম পরিচয় পাই—সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। এ সম্বন্ধে তার বহুদিনকার পরের আর একটি কথা লিখিতেছি।

কাশীপ্রসাদ জয়সোওয়ালের সহিত রাখালবাবুর ও আমাদের দলের কিরূপ সৌহার্দ্য ছিল তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। তিনি ছিলেন ব্যারিস্টার। তাঁহার ঐতিহাসিক গবেষণায়ও ব্যারিস্টারী মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যাইত। অর্থাৎ তিনি একটা সিদ্ধান্ত মনে মনে ঠিক করিয়া যে কোন প্রকারে তাহা প্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট হইতেন। স্বপক্ষের প্রমাণগুলি অতিরঞ্জিত ও বিপক্ষীয় প্রমাণগুলি কুটতর্কের সাহায্যে ছেঁয় প্রতিপন্ন করিবার দিকে তিনি খুব যত্নশীল ছিলেন। কলিকাতার জাহ্নবীর পাটনা হইতে সংগৃহীত দুইটি মূর্তি ছিল (সম্ভবতঃ এখনও আছে)। এগুলি মৌর্য যুগের যক্ষমূর্তি বলিয়াই পরিচিত ছিল। মূর্তিগুলির পিঠের উপর কয়েকটি অক্ষর খোদিত ছিল। জয়সোওয়াল তাহা পাঠ করিয়া ঘোষণা করিলেন যে এ দুইটি শিবনাগবংশীয় দুই রাজার মূর্তি। কিন্তু তাঁহার পাঠ ও লিপির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে তাঁহার মতামত কেহই বড় একটা গ্রাহ্য করিলেন না। রাখালবাবু প্রাচীন লিপি পাঠে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন—এ বিষয়ে তাঁহার মতামতের উপর সকলেরই বিশেষ আস্থা ছিল। জয়সোওয়াল তাঁহাকে ধরিলেন। কিন্তু তিনি বন্ধুর সঙ্গে একমত হইতে পারিলেন না।

একদিন জয়সোওয়াল আমাকে ও একজনকে যতদূর মনে পড়ে কালিদাস নাগকে) সঙ্গে লইয়া জাহ্নবীর গেলেন। খুব গোপনে তাঁহার মূল্যবান আবিষ্কারের কথা জানাইলেন। আমাকে ঐ অক্ষরগুলি দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি ইহাতে যে শিবনাগ-বংশীয় রাজার নাম পড়িয়াছেন তাহা ঠিক কিনা। অনেকক্ষণ দেখিয়া বলিলাম যে অক্ষরগুলি এত অস্পষ্ট যে নিশ্চিতরূপে কোন পাঠ উদ্ধার করা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়—তবে উহা যে অতি প্রাচীন তাহা মনে করিবার কোন কারণ দেখি না। তারপর আমি বলিলাম যে এ বিষয়ে রাখালবাবুই বড় অভিজ্ঞ। তাঁহাকে দেখাইলেই তো সব গোল মিটয়া যায়।

জয়সোওয়াল স্পষ্টাঙ্গটি কিছু না বলিলেও তাঁহার কথা শুনিয়া মনে হইল যে রাখালবাবুর সহিত এ বিষয়ে তাঁহার কথাবার্তা হইয়াছে এবং তিনি একমত না হওয়াতেই জয়সোওয়াল আমাদিগকে স্বীয় দলভুক্ত করার চেষ্টায় ছিলেন।

পরে কয়েক বৎসর পর্যন্ত জয়সোওয়ালের এই নূতন আবিষ্কার সম্বন্ধে অনেক বাদানুবাদ ও তর্কবিতর্ক হয়। কিন্তু রাখালবাবু বন্ধুত্বের খাতিরে কখনও জয়সোওয়ালের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। হাতীশঙ্কর খারবেলের লিপি পাঠ সম্বন্ধেও রাখালবাবু জয়সোওয়ালের অনেক উদ্ভট মতের প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

রাখালবাবু প্রত্নতাত্ত্বিকদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। প্রাচীন মুদ্রা ও শিলালেখ বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল।

শ্রদ্ধা-বিষয়েও তাঁহার অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ ও গ্রন্থ আছে। পূর্ব-ভারতে যথা-যুগের ভাষ্য-সম্বন্ধে তাঁহার গ্রন্থ এখনও পণ্ডিতগণের নিকট সমাদর লাভ করিয়া থাকে। শকাব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁহার সূচিস্থিত ও বহুল তথ্যপরিপূর্ণ প্রবন্ধ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে প্রথমে স্বাধীনমাজে তাঁহার গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করে।

তিনি বহু প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধার করিয়াছেন এবং বহু প্রাচীন মুদ্রার যথাযথ বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছেন। কেবল হিন্দু-যুগের নহে, মুসলমান-যুগের লিপি ও মুদ্রা বিষয়েও তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। বাংলাভাষায় এই সকল বিষয় আলোচনা করা তাঁহার একটি বিশেষ কৃতিত্ব।

হিন্দু ও মুসলমান যুগের বাংলার ইতিহাস রচনা করিয়া তিনি বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন। বাংলা ভাষায় ভারতের প্রাচীন মুদ্রা সম্বন্ধেও তিনি একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

বাংলা কথাসাহিত্যেও তাঁহার বহু দান আছে। পাষণ্ডের কথা, শশাক প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থে তিনি প্রাচীন ইতিহাসের মনোরম চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

একদিকে তিনি অভ্যস্ত বিলাসী ও আয়েষী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার অসংখ্য রচনাবলী ও প্রত্নতাত্ত্বিক অমূল্যবস্তুর জগৎ কঠোর শ্রমের বিষয় আলোচনা করিলে তাঁহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্য রকমের ধারণা হয়।

প্রাচীন যুগের কোন চিহ্ন বা ধ্বংসাবশেষ সম্বন্ধে তাঁহার যেন একটা অতীন্দ্রিয় স্মৃদৃষ্টি ছিল। ঢাকা নর্থব্রুক হলের নিকটস্থ ডালবাজারের মন্দিরে চণ্ডীমূর্তি বহুকাল অবধি শহরের একটি জনবহুল স্থানে অবস্থিত। নলিনীকান্ত ভট্টশালীর জায় প্রত্নতাত্ত্বিক ঢাকাতেই বরাবর বাস করিয়াছেন এবং তিনিই রাখালবাবুকে ওখানে লইয়া যান। কিন্তু রাখালবাবু মাত্র কয়েক মিনিট দেখিয়াই উহার পাদপীঠে যে লক্ষণ সেনের লিপি উৎকীর্ণ আছে তাহা আবিষ্কার করেন। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে কাজ করিবার সময় তিনি এরূপ বহু আবিষ্কার করিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

তিনি নিজেই গল্প বলিয়াছেন যে অনেক সময় প্রাচীন মূর্তি, মুদ্রা বা ধ্বংসের অমূল্যবস্তুর মাইলের পর মাইল হাটিয়া গিয়াছেন। অথচ দৈনন্দিন জীবনে তাঁহার বাবুগিরি দেখিলে ইহা বিশ্বাস করা কঠিন হইত। আমি যখন ঢাকায় ছিলাম তখন কয়েকবার তিনি সরকারী পরিদর্শনের কাজে ওখানে গিয়াছেন। বরাবরই তিনি আমার বাড়িতে উঠিতেন। প্রতিবারই সরকারী চাকর এবং তাঁহার গোয়াদেশীয় পাচক সঙ্গে নিতেন। তাঁহার সঙ্গে মালের বিরাট লটবহর বাইত। ক্যাম্পখাট, বন্দুক, ৫/৬ টা হারিকেন, বিছানা, বাক্স, তৈজসপত্র প্রভৃতি এত বাইত যে গরুর গাড়ি ছাড়া তাহা লইয়া যাওয়া বাইত না। ইহার আবিষ্কাশ জিনিসই যেমন বাইত সেই অবস্থায়ই ফিরিয়া আসিত; প্যাক খুলিবারও দরকার হইত না।

আহারের পর তাঁহার হাতে চাকরে জল ঢালিয়া না দিলে চলিত না। প্যাটালুনের বোতাম বা জুতার ফিতা তিনি নিজ লাগাইতে পারিতেন না, চাকরে লাগাইয়া দিত। অগুণতি কাপড়-চোপড় বাহা তাঁহার সঙ্গে আসিত সকলই চাকরের জিম্মায় থাকিত। তিনি উহার কোন খবরও রাখিতেন না। তিনি ঢাকা হইতে আশেপাশে নানা জায়গায় যাইতেন, বাহিরে রাজিবাস করিতেন না। তথাপি একরূপ সম্ভাবনা হইতে পারে মনে করিয়া পুরাপুরি ক্যাম্পের সরঞ্জাম লইয়া ঢাকায় আসিতেন। তাঁহার ধুতি-চাদর, গিলে-করা পাঞ্জাবী, কোট-প্যাণ্ট সবই বেশ মূল্যবান ছিল। তিনি কৌচানো কাপড় পরিভেন। নচেৎ ধুতি পরিবার পর চাকরকে কৌচা ঠিক করিয়া দিতে হইত। একবার নাটোরের মহারাজা জগদ্বিনোদ রায় আমাদের কয়জনকে লইয়া নাটোরে গিয়াছিলেন। রাজবাড়িতে সকল ব্যবস্থাই রাজোচিত। যে কয়জন লোক ছিল, প্রতিদিন রাজবাড়ির পুকুর হইতে ততগুলি রোহিত মৎস্য ধরা হইত—বাহাতে প্রত্যেকের পাতে একটি করিয়া মাছের মুড়া দেওয়া যায়। এই অল্পপাতে থাকা খাওয়া, শোওয়ার সকল ব্যবস্থা। একদিন মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—আমাদের কাহারও কোন অসুবিধা হইতেছে কিনা। রাখালবাবু বলিলেন—“মহারাজ, নিজ হাতে কাপড়ের কৌচা ঠিক করিয়া দিতে পারি না—তাহাতেই একটু মুশকিলে পড়িয়াছি।”

রাখালবাবুর পিতা ধনী ছিলেন। রাখালবাবুও বাল্যকাল হইতেই বিলাসিতার মধ্যে মাহুয হইয়াছেন। শেষ জীবনে তিনি অর্থাভাবে অনেক কষ্ট পাইয়াছেন। আরও নানা-প্রকার অশান্তিও তাঁহাকে ভোগ করিতে হয়। নানা কারণে তিনি প্রত্যন্তস্থ বিভাগের চাকুরি ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি কিছুদিন হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। কিন্তু ঐ পদের মর্যাদা থাকিলেও বেতন-খুব বেশি ছিল না। এই সময় ছাড়াও ব্যক্তিগত অনেক কারণে তাঁহার শেষ জীবন খুব অশান্তিপূর্ণ ছিল। পুরাতন বন্ধুদের মধ্যেও অনেকের সঙ্গে তাঁহার মনোমালিঙ্গ ঘটিয়াছিল। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই তাঁহার জীবনলীলার অবসান হয়। রাখালবাবুর ঐতিহাসিক প্রতিভা তাঁহাকে চিরদিন কীৰ্ত্তিমান করিয়া রাখিবে। কিন্তু বন্ধুবৎসল রাখালদাসের স্মৃতি আমার মত অল্প কয়েকজনের মনেই এখনও জাগরুক আছে। অদূর ভবিষ্যতে তাহা সম্পূর্ণভাবেই বিলুপ্ত হইবে। সেই জন্তই পুরাতন স্মৃতি মনন করিয়া কয়েকটি কথা লিগিয়া রাখিলাম।

ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর আচার্য্য ঐরমেশচন্দ্র মজুমদার রচিত এই স্মৃতিকথার পাণ্ডুলিপিট বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে রাখালদাসের নবতিতম জন্মদিবস উপলক্ষে আয়োজিত প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়। রাখালদাসের ব্যবহৃত পোষাক-পরিচ্ছদ, ব্যবহৃত ত্রয়াদি, আলোকচিত্র, চিঠিপত্র, তাঁহার পুনার বাসভবনের কটোয়াক্স, তাঁহার লিখিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ এবং তাঁহার পত্নী কাকনমালা দেবীর রচনাবলীর সহিত তাঁহার সম্বন্ধে লিখিত বিভিন্ন রচনা এই প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়।

রাখাল-স্মৃতি

শ্রীমুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

রাখালদাসের কাছে আমি ভাইয়ের মত মেহ পেয়েছি। তাঁকে বড় ভাইয়ের মতই দেখেছি এবং তিনি আমার সঙ্গে বহু বিষয়ে অগ্রজের মতই ব্যবহার করেছেন। নিজের কাজেও তাঁর কাছ থেকে আমি উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা পেয়েছি। তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে প্রথমেই মনে একটা বেদনা জাগে যে তিনি জীবনের সর্বপ্রধান আকাজক্ষাকে পূর্ণ করে যেতে পারেননি—তাঁর আগ্রহ ছিল, বিশ্বাসও ছিল যে মহেন-জো-দড়োর ডগ্গাবশেষের তিনি আবিষ্কার করেন তার লিপির পাঠোদ্ধার তিনি করে যেতে পারবেন। এই সম্বন্ধে একটা ব্যাপার আমার কাছে অদ্ভুত লাগে—তিনি একবার আমাকে বলেছিলেন, “ওরে, আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে ৪৭ বৎসর বয়সে পড়েই আমি মহেন-জো-দড়োর মুদ্রার লিপি পড়তে পারব।” তিনি ৪৫ বৎসর বয়সেই নিজের জীবনের আরকু কাজ অসমাপ্ত রেখে দেহত্যাগ করেন। যদি ইহলোকের আরকু কাজের জের পরলোকেও চলে, তাহলে তাঁর সেই সাধনা, সেই প্রারকু কর্ম আমাদের চোখের অন্তরালে পরলোকে সম্পূর্ণ হয়ে সিদ্ধিলাভ করেছে।

রাখালদাসের সম্বন্ধে প্রসঙ্গ করতে আরম্ভ করে প্রথমেই একটা কৈফিয়ৎ দিতে চাই যে এই প্রসঙ্গ ঠিকমত সন তারিখের হিসেব ধরে করতে পারব না। রাখালদাসের সম্বন্ধে টুকরো-টাকরা ছোট-খাট অনেক কথা মনে জাগছে কিন্তু সময়ের হিসেব করে, পরস্পরা বজায় রেখে হয়ত সব বলতে পারব না। মাহুঘ রাখালের কথাটাই বেশির ভাগ মনের মধ্যে জাগছে, আর আমার কাছে প্রত্নতাত্ত্বিক আর ঐতিহাসিক, গবেষক আর রসপ্রস্তু রাখালের চেয়ে মাহুঘ রাখালই যেন বেশি করে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

কবে, কোন বছর রাখালের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় তা মনে নেই। খুঁজে হিসেব করে সেকথা বার করতে হয়। তবে মনে হয় ইংরাজী ১৯১৬ কি ১৯১৭ সালের দিকে কোন সময়ে। তখন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রধান কর্ণধার, বোধ হয় সভাপতি ছিলেন। আমি সে-সময় সাহিত্য পরিষদের কাজে অংশগ্রহণ করতে আরম্ভ করেছি। তখন আমাকে বোধহয় ছাত্র-সভ্যদের অধ্যক্ষ করা হয়েছিল। কোন প্রতিষ্ঠানে থেকে বস্তুটুকু সাধ্য তাতে কাজ করে বাবার চেষ্টা করতুম, “ভাত খাই, কাঁসি বাজাই” নীতিতে দলদলি থাকলে যথাসম্ভব তা এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করতুম। ঐ সময় দেখেছিলুম যে পরিষদের নীতি আর পরিচালনা নিয়ে প্রবীণে আর নবীনে একটা মতানৈক্য আর সঙ্গে সঙ্গে দ্বন্দ্ব বেধে যায়। পরিষদের প্রতিষ্ঠাতাদের অনেকেই ছিলেন প্রবীণের দলে,

শাস্ত্রীমশাইকে কেন্দ্র করে। নবীনের দলে ছিলেন রাখালদাস, অনামধন্য অধ্যাপক গবেষক ও শিক্ষানেতা ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, বহরমপুরের ৬ বোধিসত্ত্ব সেন, কলকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর পাঠাগারের তত্ত্বাবধায়ক সুরেন্দ্রনাথ কুমার, অধ্যাপক ডাঃ হুশীলকুমার দে। এঁরা ছাড়া প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত, ডাঃ যত্ননাথ সরকারও নবীনের দলে ছিলেন। এ ছাড়াও হুঁচার জন ছিলেন—তাদের নাম মনে পড়ছে না।

তবে সম্ভবতঃ নাটোরের মহারাজা শ্রীযুক্ত জগদীন্দ্রনাথ রায়, অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ঔপন্যাসিক ব্যারিস্টার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ছিলেন। তবে রাখালদাসের মত এঁরা ততটা সক্রিয় ভাব প্রকট করেন নি। আমি মোটামুটি ভাবে নবীনদের দৃষ্টিভঙ্গী মেনে নিলেও এই ব্যাপারে নিজের মানসিক রুচি অল্প রকম থাকায় তেমন বড় অংশ নিতে পারিনি। তারপরে ১৯১৯ সালে ডাঃ হুশীলকুমার দে আর আমি—হুঁজনে ইউরোপে যাত্রা করি। হুশীলবাবু আমার মাস কয়েক আগে চলে যান। এই ইউরোপ-প্রবাসের অল্প তিন বৎসর রাখালের সঙ্গে আমার সংযোগ ছিল হয়ে যায়। কিন্তু রাখালের প্রতি আমার মনে সাহিত্য পরিষদের দলাদলির অন্তস্তিক্ত ও ক্লিষ্ট পরিবেশের মধ্যেও একটা কেমন আকর্ষণ এসে গিয়েছিল। তার প্রধান কারণ হচ্ছে নানাবিধে এঁদের স্পষ্টবাদিতা—যা মনে হ’ত এঁরা সোজা-সুজি বলতেন—ঢেকে ছেপে কথা কইতেন না। আর একটা জিনিস ছিল যে এঁদের ভাষার বীধন ছিল না—কথাবার্তা এবং রসিকতা ভাষার শ্রীল-অশ্রীলের উর্ধ্বে অতিক্রম করত। সেই কারণেই এঁদের কথাবার্তার রসের উৎস উচ্ছ্বসিতভাবে দেখা দিত। অবশ্য সে রস ছিল শ্রেষ্ঠ রস—আদি রস—“রসানাম্ আদিঃ শ্রেষ্ঠঃ।” এ বিষয়ে রাখালদাসের সঙ্গে পাল্লা দিতেন বোধিসত্ত্ব—হুঁজনেই মুর্শিদাবাদের এবং হুঁজনেই বালাবন্ধু। অহঙ্কল্প আমরা একটু আলগোছে দাঁড়িয়ে উপভোগ করতুম। রুচিবাগীশেরা হয়ত এই জন্ত রাখাল ও তাঁর দলের ওপর চটতেন কিন্তু আমার মনে হয়ত একটু প্রচুর প্রাকৃতজ্ঞানোচিত মনোভাব থাকায় দরুণ কোন ক্ষোভ বা বিরাগের কারণ পেতুম না।

১৯১৯-২২ সাল পর্যন্ত ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে গুরুকুল বাস করে আমি কিয়ৎ এলুম। ইতিমধ্যে রাখালের জীবনে অনেক পরিবর্তন এসে গিয়েছে। তিনি ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে কাজ করতেন—প্রাণ দিয়ে তিনি নিজের কর্তব্য পালন করতেন—যা ছিল ব্যবসায় তাই হয়ে উঠেছিল তাঁর কাছে ব্যসন। এ রকম ইতিহাসের রসে মগ্ন হইয়া আমি কখনও দেখিনি। তাঁর কাজের মধ্যে যেটা গবেষণার দিক—যে দিকে ছিল তথ্য আহরণ করা, আবিষ্কার করা আর তথ্যের ব্যাখ্যা করা প্রধান কাজ, সেদিকে তিনি ছিলেন অনবদ্য। আর তাঁর কাজের মধ্যে যেটা ছিল পরিকল্পনার দিক, বৈষয়িক দিক, শুনেছিলুম সেদিকে তাঁর কড়কগুলি গলদ দেখা দিয়েছিল। সকলেই আমরা জানি যে প্রতিভাশালী ব্যক্তিকে ধরাবীধা নিয়মের নিগড়ে বাঁধা যায় না—তাঁদের একটু নিয়মের অবহেলা মেনে নিতেই হয়।

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্তা ছিলেন সার জন মার্শল এবং মার্শল সাহেব ছিলেন গুণজ্ঞ—তিনি গুণী এবং বিদ্বানের কদর ও সম্মান জানতেন। সেই জ্ঞান শুনেছি রাখালের কতকগুলি আবিষ্কারের আর অল্প কাজে তিনি এত খুশি ছিলেন যে তাঁর ‘কর্ম-বিভাগের বৈষয়িক দিকে রাখালের দোষত্রুটি তিনি উপেক্ষা করতেন—মার্জনা করতেন। সে সব ইতিহাস নিয়ে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এই কথার অবতারণার এই উদ্দেশ্য যে রাখালের ঐতিহাসিক কৃতিত্ব এত উচ্চস্তরের ছিল যে অল্প কোন অসঙ্গতি সেখানে নাগাল পেরে না।

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের আলোচনায় রাখাল অনেক নতুন কথা বলে গিয়েছেন। আর তাঁর গবেষণা যে এক একটা মনোগ্রাফ বা নিবন্ধরূপে প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি প্রত্যেকটি মূল্যবান। প্রাচীন ভাস্কর্য ও শিলালেখের নষ্টকোশী উদ্ধার, প্রাচীন সংস্কৃত ফার্সি পুঁথিপুস্তক ঘেঁটে ঐতিহাসিক তথ্য নিষ্কাশণ, রাজনৈতিক ইতিহাস, সামাজিক ইতিহাস, শিল্পকলার কথা, এসব ত তাঁর নবদর্পণগত ছিল; ইতিহাসের উপাদানকে নিয়ে তিনি যেন ছিনিমিনি খেলতে পারতেন। তাঁর গুরু শাস্ত্রী মহাই যাকে “পাথুরে প্রমাণ” বলতেন, রাখালদাস ছিলেন সেই “পাথুরে প্রমাণ” প্রয়োগের গুস্তাদ। নীরস ইতিহাস হস্তামলকব্যং তাঁর করতলগত ছিল। এর চেয়েও বড় কথা—তিনি সেই ইতিহাসকে প্রাণবন্ত করে ফুটিয়ে তুলতে পারতেন। তাঁর প্রতিভা ছিল একাধারে ভাবগির্জা অর্থাৎ critical আর কারগির্জা অর্থাৎ creative। রাখালের কাছে ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে বিখ্যাত ইংরেজ একপত্রী পণ্ডিত ভিনসেন্ট স্মিথ-এর লেখা দেখেছিলুম—তিনি রাখালের লেখা “বাক্সালার ইতিহাস” বাক্সালা ভাষায় দেখে আফ্রোশ্য করেছিলেন যে তিনি বাক্সালা জানেন না বলে এই বই কাজে লাগাতে পারছেন না—কিন্তু তিনি মনে করেন যে এই বই পড়বার জন্তই বাক্সালা ভাষা শেখা যেতে পারে, তবে তিনি অনেক বুড়ো হয়ে পড়েছেন, নতুন করে বাক্সালা শেখা কাম্য হলেও তা আর তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হচ্ছে না। এই রকম উক্তি থেকেই রাখালের গবেষণা কার্য বা ভিনসেন্ট স্মিথ ইংরেজীর মাধ্যমেই পড়েছিলেন তার সম্বন্ধে নিজের আস্থা জ্ঞাপন করেন। “বাক্সালার ইতিহাস” মোগলযুগের আরম্ভ পর্যন্ত যা তিনি দুই খণ্ডে প্রকাশ করে যান তা তাঁর অবিনশ্বর কীর্তি। এ ছাড়া তাঁর কতগুলি বড় বড় বই আছে।

তাঁর প্রাচীন বাক্সালার আর সেন যুগের শিল্প সম্বন্ধে বইখানি প্রকাশ করে ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ নিজেদেরই গৌরব বর্ধন করেছেন। তাঁর “উড়িষ্কার ইতিহাস” সম্বন্ধে বিরাট বইখানি উড়িষ্কারবাসীদের মধ্যে নিজেদের প্রাচীন ঐতিহ্য সম্বন্ধে একটা মার্জনীয় গর্ববোধ স্থাপিত করতে সহায়তা করেছে। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় কীর্তি সিন্ধু প্রদেশে মহেন্দ্র-জো-দড়োর ভগ্নাবশেষের আবিষ্কার। আর এই, আবিষ্কারের জন্ত তাঁর নাম ভারতবর্ষে ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এই আবিষ্কারকে revolutionary বা ক্রান্তিকারী বলা চলে। মহেন্-জো-দড়ো আবিষ্কারের পূর্বে প্রাচীন ভারতের মানুষের হাতের কাজ, শিলালেক্ষ খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের ওদিকে কিছু পাওয়া যায়নি। ভারতের ঐতিহাসিক যুগ—পাথুরে প্রমাণের যুগ ছিল মোর্ঘ্যুগ থেকে। মহেন্-জো-দড়ো আবিষ্কারের ফলে যেন এক লাফে ভারতের ঐতিহাস, সংস্কৃতি ও সভ্যতার পাথুরে প্রমাণ চতুর্থ শতক থেকে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রকে গিয়ে পৌঁছল।

রাখালদাসের মহেন্-জো-দড়ো আবিষ্কার ঘটেছিল নিতান্ত আকস্মিক ভাবে—অনপেক্ষিত ভাবে। তিনি আমাদের বলেছিলেন যে গ্রীক ইতিহাসে তিনি পড়েছিলেন যে আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণ করে পূর্বপাঞ্জাবে এসে থেমে গেলেন। ভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকায় ঢুকতে তিনি সাহস করলেন না। তার দু'টো কারণ ছিল—১. তাঁর সৈন্যরা বহুদিন ধরে দেশ ছেড়ে এসে বিদেশ বিজুঁয়ে যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল—তারা আর নতুন অজানা দেশে যেতে অস্বীকার করলে, রণযুগো সেপাই হয়ে গেল রণযুগো। ২. তারপর আলেকজান্ডার খবর পেলেন যে পূর্বভারতে প্রাচ্য বা 'Prosioi' জাতি বাস করে—যুদ্ধে তারা ছিল দুর্ধ্ব আর তাদের সৈন্যও ছিল অজস্র। এই দুই কারণে তাঁর গজার দেশে আসা আর হ'ল না, তিনি ফিরে যাবার মতলব করলেন। যাবার আগে তিনি বিপাশা নদীর তীরে পাথরের বড় বড় বারোটি বেদী তৈরী করলেন—তাঁর গ্রীক দেবতাদের উদ্দেশ্যে। তারপর তিনি দক্ষিণ পাঞ্জাব হয়ে, সিন্ধু প্রদেশ হয়ে ব্যাবিলনের দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন।

এখন রাখালের আগ্রহ হ'ল এই বিরাট বেদীগুলির তিনি ভগ্নাবশেষ আবিষ্কার করতে পারেন। সেইজন্য তিনি দক্ষিণ পাঞ্জাব থেকে মজা নদী সরস্বতীর খাদ ধরে, যে নদী 'বিনশন' অর্থাৎ রাজস্থানের মরুভূমিতে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, সেই নদীর খাদ ধরে সিন্ধু প্রদেশে এসে উপস্থিত হলেন। এইখানে লারকানা জেলায় সিন্ধু নদীর ধারে মহেন্-জো-দড়োর সুউচ্চ টিলা দেখতে পেলেন। তাঁর মনে হ'ল এ জায়গা আগে কেউ খুঁড়ে দেখেনি। এখানে চাই কি নতুন কিছু পাওয়া যেতে পারে। তিনি খননকার্য আরম্ভ করলেন, আর তার পরে অপ্রত্যাশিত ভাবে মহেন্-জো-দড়োর প্রাচীন শহরের ভগ্নাবশেষের আবিষ্কার করলেন। রাখালদাস নিজের জ্ঞানগোচর মত এই ভগ্নাবশেষের বিভিন্ন স্তরের একটা তারিখ স্থির করলেন। এই আবিষ্কারের অনেক ফটো নিলেন আর যথারীতি সরকারীভাবে তাঁর প্রধান সার জন মার্শল (Sir John Marshall)-এর কাছে প্রতিবেদন পেশ করলেন। সার জন মার্শল এই আবিষ্কারের মূল্য তখনই বুঝতে পারলেন। ইউরোপে প্রাচীন গ্রীসে প্রথমস্ত খ্রীষ্টপূর্ব সাত শ' আট শ'র ওদিকে যে কিছু ছিল তা' বহুকাল ধরে কেউ জানত না। কিন্তু এখন থেকে প্রায় ৮০ বৎসর পূর্বে জার্মান প্রত্নতাত্ত্বিক Schliemann (স্লীমান) এশিয়া মাইনর-এ প্রাচীন ট্রয় নগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন। তাতে করে গ্রীকগভ্যতার আধার বরূপ আরও প্রাচীনতর একটি সভ্যতার স্তর সম্বন্ধে আমরা

প্রথম জানতে পারলুম। স্ট্রীমানের এই আবিষ্কার গ্রীকজাতির প্রাচীন ইতিহাসের আলোচনায় যুগান্তর এনে দিলে। Mycenae (মাইসিনী) বা Mukenai (মুকেনাই) এবং Tiryns (তিরিন্স) নগরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেল। Crete (ক্রীট) দ্বীপে Knossos নগরের প্রাচীন প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ সার আর্থার ইভান্স (Sir Arthur Evans) বার করলেন—গ্রীসের ইতিহাস খ্রীষ্টপূর্ব ৭০০/৮০০ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০-এর দিকে পৌঁছে গেল। Schliemann-এর আবিষ্কারের মত রাখালদাসের মহেন্-জো-দড়ো আবিষ্কার এই রকম চমক-প্রদ ব্যাপার ছিল, Sir John Marshall Schliemann-এর সঙ্গে রাখালদাসের তুলনা করে ইউরোপে প্রচার করলেন। কিন্তু রাখালের হাত থেকে এই এতবড় আবিষ্কারটা খনন কার্ধ্যের দ্বারা সম্পূর্ণ করবার ভার তিনি নিজেই নিলেন এবং রাখালদাসের প্রাথমিক কৃতিত্বের কথাটা একটু সংক্ষেপে নমো নমো করেই সেয়ে দিলেন। রাখালের যে আশা ছিল, এই আবিষ্কার নিজে সম্পূর্ণ করবেন, সেটার যোগাযোগ হ'ল না—তিনি পশ্চিম ভারত থেকে পূর্ব ভারতে বদলী হলেন। তবে সার জন মার্শল-এর মত লোকের হাতে পড়ায় মহেন-জো-দড়ো নিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক আলোচনা আর গবেষণা সার্থক ভাবেই হয়েছিল। সার জন মার্শল বিরাট কয়েক গণ্ডে এই মহেন-জো দড়োর প্রত্নকথা খুব পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে আলোচনা করেন। ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের নিয়ম ছিল যে কর্তৃপক্ষের হুকুম না হলে কোনও অধস্তন কর্মচারী কোন আবিষ্কার বা গবেষণা তাঁর নিজের কৃতিত্ব হলেও প্রকাশ করতে পারতেন না। সুতরাং এই নিয়মে রাখালদাসের মুখ বন্ধ হ'ল, এই গবেষণা সম্বন্ধে তাঁর যা বক্তব্য তা বলবারও তাঁর পথ রইল না। এই অবস্থা রাখালদাসের পক্ষে যে বিশেষ অস্বস্তিকর ছিল, তা সহজেই অস্বস্তি করতে পারা যায়। তখন তিনি কলকাতায় সিমলা স্ট্রীটে একটা বাড়ি ভাড়া করে থাকতেন। তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল পূর্বভারতে আর কর্মক্ষেত্র ছিল কলকাতায় Indian Museum-এ। এটা আমার বিলাত থেকে ফিরে আসবার, ১৯২২ সালের পরের কথা। তখন মহেন-জো-দড়োর নাম সমস্ত সভ্যজগতে ছড়িয়ে গিয়েছে। আমরা রাখালের বাসায় এসে প্রায়ই আড্ডা দিতুম। যারা যারা আসতুম, তাদের সকলের নাম মনে পড়ছে না। তবে বন্ধুবর কালিদাস নাগ আসতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপক নারায়ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আসতেন। বন্ধুবর শিশির-কুমার ভাট্টাও আসতেন। আমার বোধ হয় রমেশ মজুমদার মশাইও আসতেন। আমার কাজের প্রতি রাখালের আস্থা পেতুম এই ভাবে। তিনি আমাকে একদিন বললেন, “দেখ্ সুনীতি, এরা তো আমাকে মহেন-জো-দড়ো সম্বন্ধে কিছু প্রকাশ করতে দেবে না। এ সম্বন্ধে তোর কিছু লিখতে বাধা নেই। আমি তোকে সমস্ত মাল-মশলা দিচ্ছি, ছবি দিচ্ছি, তুই এই বিষয়ে কিছু লেখ আর এ সম্বন্ধে আমার যা ধারণা তাও তুই প্রকাশ করে দে। এইভাবে ভবিষ্যতের জন্য একটা record থাকুক।”

আমি তাতে সানন্দে রাজী হলুম, তবে একটু ভয়ে ভয়ে। কারণ আমার আলোচ্য

বিষয় ছিল ভাষাতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব নয়। তবুও আমি রাখালকে বললুম, “দাদা, তোমার যা যা বক্তব্য, সেগুলি যথাযথ তোমার বক্তব্য বলেই দেব। তবে এই আবিষ্কার বিষয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা করে কতকগুলো কথা মনে জাগছে ভাষাতত্ত্বকে আশ্রয় করে, সেগুলো আমি আমারই বক্তব্য বলে দিতে চাই।” তাতে রাখাল পূর্ণ সম্মতি দিলেন, আর বললেন, “বেশ ত, আমি ত এই চাই তোর কাছ থেকে।”

তারপর রাখালের দেওয়া উপাদান নিয়ে Modern Review-তে ১৯২৪ সালের ডিসেম্বর সংখ্যায় একটা প্রবন্ধ বার করলুম। তার নাম দিলুম “Dravidian Origins and the Beginning of Indian Civilization”। তাতে মহেন্-জো-দড়ো আর ভারতের অগ্র জায়গার প্রাগৈতিহাসিক জাতিদের সঙ্গে পূর্ব ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের Aegean জাতির সঙ্গে একটা যোগ অনুমান করি, আর ভারতের ড্রাবিড় জাতি এই Aegean জাতির সঙ্গেই সম্পৃক্ত, একথা কতকগুলি ভাষাতাত্ত্বিক আর অগ্র প্রমাণের বলে স্থাপিত করবার চেষ্টা করি। রাখালের প্রসাদে আমার লেখা এই প্রবন্ধটি মহেন্-জো-দড়ো আবিষ্কারের সন্থকে একটি প্রথম যুগের প্রবন্ধ, আর, বোধ হয়, কোন ভারতবাসীর লেখা প্রথম প্রবন্ধ। আমি বেশ গুছিয়ে রাখালের আবিষ্কারের কথা এতে লিখে দিই। এই প্রবন্ধ পরে ইউরোপে নানা স্থানে আলোচিত হয়। পারী (Paris) সোসিয়েতে আশিয়াটিক-এ অধ্যাপক Sylvan Levi এই সংখ্যার Modern Review কয়েক কপি আনিয়ে একটি বিশেষ অধিবেশনে এই প্রবন্ধের আলোচনা করেন। কিছু কাল পরে Sir John Marshall-এর বড় বই বেরুবার আগে জার্মান প্রাচ্যবিজ্ঞা সভার পত্রিকায় এক জার্মান পণ্ডিত মহেন্-জো-দড়োর উপরে একটি প্রবন্ধ লেখেন। বোধ হয় জার্মান ভাষায় এটি ছিল প্রথম প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধের শেষের দিকে তিনি প্রমাণপঞ্জী হিসেবে মহেন্-জো-দড়ো সন্থকে সেই সময় পর্যন্ত বা কিছু বেরিয়েছে তার খবর তিনি যতটা পেয়েছিলেন তার উল্লেখ করে দেন। আমার প্রবন্ধের খবর তিনি পেয়েছিলেন। কিন্তু সেটি দেখবার সুযোগ তাঁর হয়নি। আর আমার পদবীটাও তিনি সঠিক-ভাবে জানতে পারেননি। সেইজন্য তিনি আমার প্রবন্ধের লেখক হিসেবে আমার নাম দেন S. K. Chaunjee রূপে, আর ‘চাউনজি’ শব্দের বন্ধনীর মধ্যে ছাপিয়ে দেন (Chatterji ?) —খুব সম্ভব কোন হাতের লেখা ‘নোট’ থেকে ‘Chatterji’র ‘t’ দুটির মাত্রা পড়ে যাওয়ায় ও ‘or’কে ‘n’ রূপে পড়ায় এই নামের বিকার।

রাখাল এই প্রবন্ধ দেখে খুবই খুশী হন; এটা আমার কাছে একটা বিশেষ আত্মপ্রসাদের কথা। আমি বিলেত থেকে ফিরে আসবার পর—আর এই প্রবন্ধ লেখবার পর তিনি আমাকে একেবারে অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্রেণীতে গ্রহণ করলেন। কত সন্ধ্যা তাঁর বাসা বাড়িতে আমি কাটিয়ে এসেছি—তাঁর সরল গল্পের সঙ্গে, ইতিহাসের সঙ্গে সমাজতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, শিল্পকলা, সাহিত্যনীতি প্রভৃতি কত বিষয়ে আলোচনা করেছি। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা কওয়া ছিল মনের রসায়ন স্বরূপ। নতুন কিছু না কিছু তিনি প্রায়ই আমাকে

বলতেন—এমন সহজ সাবলীল ভাবে যে ডাতে ভারী জিনিসও হালকা হয়ে দেখা দিত। রাখালদাস তখন বহুমুত্রে ভুগছিলেন এবং এই ব্যাধিই কয়েক বৎসর পরে তাঁর কালস্বরূপ হয়েছিল। তিনি ডাক্তারের পরামর্শ মত starch অর্থাৎ শ্বেতসার বিশিষ্ট খাদ্য, যেমন ভাত আলু আর চিনি বর্জন করতে বাধ্য হয়েছিলেন, আর তিনি যথাসম্ভব মাংস খেয়েই থাকতেন। রাখাল একটু ভোজনবিলাসী ছিলেন, আর যারা খাইয়ে লোক হয় তারা খাওয়াতেও ভালবাসে। এই জন্ত রাখালের আতিথ্যও ছিল সর্বজনবিদিত। তাঁর নিজের এক বহুদিনের পুরাতন গোয়ানী রাঁধুনী ছিল—কোকনভাবী ব্রীষ্টান—মাংস রান্নায় সে ছিল ওস্তাদ আর রাখাল সকাল সন্ধ্যায় তারই রান্না খেতেন—আমাদেরও তাঁর এই রাঁধুনীর রন্ধনকলার সঙ্গে বহুবার পরিচয় হয়েছিল। তবে সাধারণতঃ তাঁর বৈঠকখানায় বসে আমরা চা, পানির ভাজা, মুড়ি, কড়াই ভাজা, কখনও কখনও মিঠাই খাবার সন্দেশ—লঘু জলপানই করতুম। রাখালের গর্ব ছিল যে তাঁর পূর্বপুরুষ আওরঙ্গজেব বাদশাহের কাছ থেকে কিছু জমিদারী পেয়েছিলেন।

ইতিহাস-চর্চা প্রসঙ্গে মুসলমান যুগের কথা আলোচনা করবার জন্ত তিনি কিছুটা ফার্সীও শিখেছিলেন। তাঁর বাড়ি ছিল বহরমপুর। মুর্শিদাবাদ বহরমপুরের বাদশাহী আর নবাবী আমলের কিছুটা হাওয়া তাঁর মনে বইত। মোগলাই আদব-কায়দা, রীতরসম্, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি সম্বন্ধে তিনি বেশ ওয়াকিবহাল ছিলেন। বঙ্গবর শিশিরকুমার ভাট্টা যখন ‘আওরঙ্গজেব’ অভিনয় করেন, রাখাল তখন স্বতঃপ্রসূত হয়ে সতেরোর শতকে মোগল আর রাজপুত পোশাক-পরিচ্ছদ কাচদা-কাচন সম্বন্ধে শিশির ও তাঁর দলকে ডালিম দেন। নিজের হাতে ‘আওরঙ্গজেব শিশিরের’ মাথায় মোগলাই পাগড়ি বেঁধে দেন। মোগল দরবারের ‘কুর্নিশ’ কি রকম হ’ত তা শিখিয়ে দেন। এই কুর্নিশের একটু বৈশিষ্ট্য ছিল। বাদশাহের সামনে ঝুঁকে মাটিতে ডান হাত ঠেকিয়ে তবে সেই হাত কপালে ছুঁতে হত ; আর সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাত দিয়ে বাঁ কানের উপরে পাগড়ি ছুঁয়ে থাকতে হ’ত। এই কুর্নিশের ইতিহাস তিনি একদিন আমাদের শুনিয়েছিলেন। একবার আকবরের বড় ছেলে সেলিম, যিনি পরে জাহাঙ্গীর বাদশাহ হয়েছিলেন, দরবারে তাঁর মহামহিম পিতাকে যথারীতি কুর্নিশ করছিলেন। সে সময় পর্বন্ত বাঁ হাত দিয়ে পাগড়ি ছোঁবার রীতি ছিল না। কিন্তু শাহজাদা সেলিম যখন ডানহাত ভুমে ঠেকিয়ে আর মাথা झুইয়ে ডানহাত দিয়ে যখন মাটি স্পর্শ করছিলেন তখন তাঁর মনে আশঙ্কা হ’ল, মাথার পাগড়ি বুঝি আলগা হয়েছে, পড়ে যেতে পারে। দরবারে একুশ ঘটনা একটা বড় দরের বেয়াদবী হবে। সেই জন্ত যুবরাজ সেলিম বাঁ হাত দিয়ে পাগড়ি চেপে ধরলেন। তারপর ডান হাত দিয়ে ভূমিস্পর্শ করে যথারীতি মাথায় ঠেকালেন। এই নতুন ভঙ্গীটুকু আকবর বাদশাহের কাছে বেশ ভাল লাগল, আর সেই থেকে তিনি নিয়ম করে দিলেন যে দরবারী কুর্নিশ এই ভাবেই করতে হবে। তিনি এইরকম নানান খুঁটিনাটি জানতেন আর বেশ চিন্তাকর্ষক ভাবে বলতেন

আর প্রয়োগও করতেন।

যদিও রাখালদাস মহেন্দ্র-জো-দড়ো সত্বে তাঁর বক্তব্য নিজের কথায় বলবার স্বযোগ পেলেন না তাতে তিনি দমেন নি। মহেন্দ্র-জো-দড়ো আর হরপ্পাতে যে সমস্ত মুদ্রা বা শিলমোহর পাওয়া গিয়েছিল তাতে যে লিপি ছিল তার পাঠোদ্ধার তখনও কেউ করতে পারেননি, এখনও পর্য্যন্ত কেউ পারেননি। এই লিপি পড়বার জ্ঞান অনেকে আগ্রহান্বিত হলেন। রাখালদাস এই লিপি উদ্ধারের কাজে যেতে গেলেন। তবে তিনি ছিলেন নিছক পণ্ডিত—আন্দাজী অনুমান খণ্ডের উপর দিয়ে চলতে চাইতেন না। এই লিপির পাঠোদ্ধার করার জ্ঞান তিনি মধ্যপ্রাচ্যের আর পশ্চিম এশিয়ার ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের যত প্রাচীন আর অপ্রাচীন লিপি ছিল, যেগুলির সঙ্গে মহেন্দ্র-জো-দড়োর লিপির সাদৃশ্য বা সংযোগ থাকা সম্ভবপর ছিল, সেই সব লিপি বিষয়ে বড় বড় প্রামাণিক বই আনিয়া সেই সব লিপির গভীর চর্চা আরম্ভ করে দিলেন। এই জ্ঞান তাঁকে বিস্তর অর্থব্যয় করতে হয়েছিল, সময় দিতে হয়েছিল প্রচুর আর পরিশ্রমও করতে হয়েছিল অগাধ। ভারতের এই প্রাচীন লিপির উদ্ধারের চেষ্টা তাঁর জীবনের শেষ কয় বৎসরের প্রধান কর্ম হয়ে উঠেছিল।

ইতিহাসের নষ্টকোণীর পুনরুদ্ধারে রাখাল ছিলেন একপত্রী পণ্ডিত। আর সে বিষয়ে তাঁর গুণপনা বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতরাই বুঝবেন, কিন্তু তিনি এর চাইতেও আরও বড় ছিলেন। তিনি যে কেবল তথ্যের মধ্যেই ডুবে ছিলেন তা নয়, তথ্যের অন্তরালে যে রস ছিল মানবিকতাকে অবলম্বন করে তার তত্ত্বও তাঁর কাছে চাপা ছিল না। তাঁর প্রতিভা যে কেবল factual অর্থায় বস্তুনিষ্ঠ আর বস্তু-আশ্রয়ী ছিল তা নয়, উপরন্তু তিনিও ছিলেন রসের ক্ষেত্রে স্রষ্টা আর স্রষ্টা। রসস্থপিকার্যে তিনি নিজের অনন্তসাধারণ বৈশিষ্ট্য আর শ্রেষ্ঠতা দেখিয়ে গিয়েছেন। ঐতিহাসিক উপগ্রাস রাখালদাসের হাতে ভারতবর্ষে এক নতুন মর্যাদা পেয়েছে। ‘ময়ূখ’, ‘ধর্মপাল’, ‘অসীম’, ‘শশাঙ্ক’, ‘করুণা’ প্রভৃতি সার্থক ঐতিহাসিক উপগ্রাস তিনি লিখেছিলেন, এ কথা সকলেই জানে। কিন্তু ঐতিহাসিক পারিপার্শ্বিকের আর তার নতুন পটভূমিকার এত পূর্ণজ্ঞান নিয়ে তাঁর আগে ভারতবর্ষে আর কেউ ঐতিহাসিক উপগ্রাস লিখতে বসেন নি। রামরাম বসুর ‘প্রতাপাদিত্য চরিত্র’কে (১৮০১) বাক্যলাভাব্য প্রথম ঐতিহাসিক উপগ্রাস বলা যায়। আর রামরাম বসুর অর্ধশতাব্দী আগে রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের ‘অন্নদামঙ্গল’ও ছিল তখনকার কালের উপযোগী ছন্দোবদ্ধ ঐতিহাসিক উপগ্রাস। প্রতাপচন্দ্র ঘোষের লেখা ‘বঙ্গবিপ্লব-পরাজয়’-ও (১৮৬২) বাক্যলার এক আদি ও প্রধান ঐতিহাসিক উপগ্রাস, কিন্তু এই বইয়ে লেখক একটু অতিরিক্ত কল্পনারই আশ্রয় নিয়েছেন। রমেশচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপগ্রাস যে বাক্যলার শ্রেষ্ঠ রস-রচনা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, আর এঁদের বই (ঐতিহাসিক আর সামাজিক উপগ্রাস দুই-ই) ভারতবর্ষের প্রায় তাৎপর্য ভাষায় অনূদিত হয়ে সেই সব ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করেছে। এঁদের ঐতিহাসিক উপগ্রাসে প্রাচীনতার যথার্থ প্রতিকলনের চেষ্টা আছে, আর সে চেষ্টাকেও সে

যুগের কথা ধরলে সার্থক বলতেই হয়। এঁদের বইয়ে কিন্তু ইতিহাস ব্যাপারটা গোণ, মুখ্যবস্তু হচ্ছে ঘটনার সমাবেশ আর চরিত্রচিত্রণ। রাখালদাসের গুরু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও তাঁর ‘বেশের মেয়ে’ উপন্যাসে যেভাবে প্রাচীন সামাজিক বাতাবরণকে জিইয়ে তুলেছেন, তা অদ্ভুত—তাঁর পূর্বে আর কেউ এ বিষয়ে এতটা সার্থকতা দেখাতে পারেন নি। রাখালদাস আরও পরবর্তীকালের পূর্ণতর তথ্যসম্ভার নিয়ে ইতিহাস আলোচনার আধারভূমিতে দাঁড়িয়ে যে ক’খানি ঐতিহাসিক উপগ্রাস লিখেছেন তা একাধারে উপগ্রাস আর ঐতিহাসিক চিত্র। তাঁর কতকগুলি ঐতিহাসিক উপগ্রাস হিন্দীতে অনূদিত হয়েছে—আর শুনেছি আরও অগ্র দুই একটি ভারতীয় ভাষাতেও হয়েছে। তাঁর ‘প্রাচীন মুদ্রা’ নামে ঐতিহাসিক গবেষণামূলক বইয়ের মতনই ঐতিহাসিক উপগ্রাসের মাধ্যমেও বাঙ্গালীর তথা ভারতবাসীর sense of history অর্থাৎ ইতিহাস-বোধকেও মার্জিত করে তুলতে সাহায্য করেছেন। রাখালদাসের ঐতিহাসিক উপগ্রাসের প্রসঙ্গে তাঁর লেখা আর দু’খানি বইয়েরও উল্লেখ করতে হয়। একখানি হচ্ছে ‘হেমকণা’ আর একখানি ‘পাষণের কথা’। এ জিনিস হচ্ছে বাঙ্গালা ভাষায় একেবারে সম্পূর্ণ নোতুন। মাহুকের ঐতিহাসিক প্রগতির মুক দর্শক ও জড়ের মুগ দিয়ে নৈর্যাস্তিকভাবে ইতিহাসের ঘটনাবলী চিত্রপটের মত প্রকাশিত করে দেবার এই এক নতুন ভঙ্গী রাখালদাস বাঙ্গালী পাঠকের সামনে এনে দিলেন।

রাখালদাসের সহধর্মিণী কাঞ্চনমালা দেবীও কতকগুলি উপগ্রাস ও ছোট গল্প রচনা করে স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। বাঙ্গালার উপগ্রাস-সাহিত্যের ইতিহাসে কাঞ্চনমালা দেবীর নামও চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে, আর এই লেখক-দম্পতির কৃতিত্বের উল্লেখ এক সঙ্গে সকলকেই স্বীকার করতে হবে।

“মুখেন মারিতং জগৎ”—রাখালদাস অনেক সময়ে কথাবার্তায়, আলাপে-আলোচনায়, হুকচি-কুকচি ও হুনীতি-দুনীতি সম্বন্ধে তাঁর স্পষ্ট মত অকুণ্ঠিত ভাষায় জোর গলায় বিঘোষিত করতেন, আর যারা এই সব বিষয়ে একটু সঙ্কোচ অনুভব করতেন তাঁর ভাষা আর প্রকাশ-ভঙ্গীতে তাঁরা ভয় পেয়ে যেতেন, কারণ তিনি মৌখিক আলোচনায় রুচিবাগীশদের চটাবার অগ্রই বেশি করে unconventional অর্থাৎ গভাভুগতিকভায়ে বিরোধী হয়ে উঠতেন। কিন্তু তিনি তাঁর আভ্যন্তর চিন্তাধারায় সম্পূর্ণরূপেই এর বিপরীতই ছিলেন। সাহিত্যে বিষয়বস্তু আর প্রকাশভঙ্গী নিয়ে তিনি পূর্ণভাবে ছিলেন নীতিনিষ্ঠ আর শালীনতাময়ী। আমাদের যৌবনকালে বাঙ্গালাদেশে একটু আচমকা অতি আধুনিক সাহিত্যের একটা নতুন ধারা এসে পড়ল। একটু উত্তরকালে ‘শনিবারের চিঠি’র দল এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। আমরা মনে হয় রাখালদাসই এ বিষয়ে বাঙ্গালী সাহিত্যিক আর সাহিত্য-রসিকদের সতর্ক ও সচেতন করে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। এই শতকের তৃতীয় দশকে বাঙ্গালা সাহিত্যও যে পথে চলছিল তার একটু খোঁজ নিলেই এ বিষয়ে রাখালদাসের আলোচনার ‘ধারা’ আর তার মূল্য বুঝতে পারা যাবে। সে প্রশ্নের অবতারণা করবার সময় ও শক্তি দুই-ই উপস্থিত

লেখকের নেই। তবে ‘সাহিত্যে পরকীয়াবাদ’-এর বিরুদ্ধে সামাজিক তথা সাহিত্যিক নীতি-পদ্ধতী রাখালের অভিযানের কথা না বললে রাখালদাসের চরিত্রের একটা গভীর দিকের প্রতি আলোকপাত করা হয় না।

আমি নিজে রাখালকে যতটুকু দেখেছি তাঁর দোষত্রুটি সত্ত্বেও মোটের উপর তাঁকে একজন good man অর্থাৎ যাকে বলে খাটি মানুষ বলে মানতে হয়। রাখালের মধ্যে ছিল একটা এমন সরল ও অমায়িক ভাব, এমন একটা গুণগ্রাহিতা, যে গুণগ্রাহিতার মধ্যে অহমিকার লেশমাত্র ছিল না—সেটি সকলকেই মুগ্ধ করত। তিনি তাঁর অহুজকল্পদের দোষত্রুটিও দেখাতেন, আবার সঙ্গে সঙ্গে যেটুকু তাঁর ভাল মনে হত, তার তারিফ করে সেটুকুকে বাড়িয়ে দিয়ে উৎসাহ দিতেন প্রচুর। এটা আমার নিজের অভিজ্ঞতা-প্রসূত। রাখালের তিরোধানের পরে একবার আমি আজমেরে গিয়েছিলুম। সেখানে রাজস্থানের বিখ্যাত পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর হীরচাঁদ ওয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। ইনি তখন প্রায় সপ্ততিবর্ষ বয়স্ক প্রাণী। একে এক কথায় ‘রাজস্থানের হরপ্রসাদ শাস্ত্রী’ বলতে পারা যায়। প্রাচীন আর মধ্যযুগের রাজস্থানের ইতিহাস নিয়ে ইনি সার্থক গবেষণা করেছেন, আর বহু প্রাচীন লেখের সম্পাদনা করে তা থেকে ঐতিহাসিক তথ্য বার করে দিয়ে গিয়েছেন। অনেক বৎসর হয়ে গেল ইনি দেহরক্ষা করেছেন। হিন্দী ভাষায় ভারতীয় লিপিবদ্ধা সম্বন্ধে এর একখানি প্রামাণিক আর বেশ বড় বই আছে। রাজস্থানের বিভিন্ন রাজ্যের অনেক লুপ্তকথা ইনি বার করেছেন, অনেক জটিল তথ্যের সমাধান করে দিয়েছেন। এর পাণ্ডিত্যের কথা আর ব্যক্তিত্বের কথা আমরা জানতুম। আজমেরে যখন তাঁর সঙ্গে প্রথম দেখা হ’ল, তখন আমাদের দলে যতদূর মনে হচ্ছে বন্ধুবর ডক্টর কালিদাস নাগও ছিলেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রত্নলিপি আর ঐতিহাসিক লেখ ইত্যাদির আলোচনার কথা উঠল। ওঝাজী আমাদের কাছে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আর রাখালদাসের অকুণ্ঠ প্রশংসা করলেন। তিনি হিন্দীতেই কথা বলছিলেন। তিনি বললেন, ‘রাখালদাসের সম্বন্ধে একটি ঘটনা আপনাদের বলি, তাইতে আপনারা বুঝবেন লোকটির পাণ্ডিত্য যেমন ছিল অসাধারণ চরিত্রমার্ধ্যও তেমনই ছিল অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী।’ ওঝাজী একবার কলকাতায় গিয়েছিলেন—যথারীতি তিনি চৌরঙ্গীতে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম ভবনে পদার্পণ করে আর এর প্রত্নতত্ত্ববিভাগে প্রাচীন মূর্তি, লেখ ইত্যাদি যেখানে রক্ষিত হয়ে আছে সেই ঘরগুলিতে তর তর করে নিজের অভ্যাস-মত্ত দেখতে থাকেন। শিলালেখগুলি যে ঘরে রক্ষিত আছে সেখানে তিনি আসেন। কতকগুলি শিলালেখ সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল হয়, আর অল্প কতকগুলি তাম্রপট্ট আর অল্প লেখ বা গ্যালারিতে তখন প্রদর্শিত ছিল না, সেগুলির সম্বন্ধেও তাঁর মনে অহুসঙ্কিৎসা জাগে। তিনি দেখলেন যে একটি মোটা বাঙ্গালীবাবু কোট প্যাটালুন আর টাই এঁটে সেই গ্যালারিগুলির পর্ববেক্ষণ করছেন—সঙ্গে আছে উর্দুপরা আরদালী আর কেহানী। অহুহানে বুঝলেন যে ইনি মিউজিয়ামের

কোন ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী হবেন। কোথায় কি আছে তাঁর জানা সম্ভব। ওঝাজী এগিয়ে এসে তাঁকে দুই একটা লেখ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন। তাতে ঐ সাহেবী পোশাকে বাদ্দালীটি বিশেষ সৌজন্ম সহকারে তিনি যা বা দেখতে চান তাঁকে দেখিয়ে দিলেন আর ওঝাজীর সঙ্গে আলাপে তিনি বুঝতে পারলেন যে ওঝাজী এসব বিষয়ে বেশ ভালো করে চর্চা করেছেন। অনেকক্ষণ এইভাবে তাঁদের দু'জনের বিস্তার আলোচনা করবার পর এই বাদ্দালী ভদ্রলোকটি ওঝাজীকে জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনি ভারতবর্ষের প্রভুত্ব দেখছি প্রকাণ্ড পণ্ডিত। বাদ্দালাদেশের শিলালেখ প্রভৃতিরও এত খবর রাখেন, দয়া করে আপনার পরিচয়টি আমাকে দেবেন? কার সঙ্গে এতক্ষণ আলাপ করে আমি যথ্য হলাম?”

ওঝাজী এই সৌজন্যপূর্ণ আর বিনীত ভাবের কথা শুনে নিজের নাম বললেন। নাম শুনেই সঙ্গে সঙ্গে এই বাদ্দালী সাহেবটি খুঁকে প্রশ্নাম করে দু'হাত দিয়ে ওঝাজীর পদধূলি নিলেন আর বললেন, “আপনি আমার গুরু, আমাকে আপনার পদধূলি দিন।” ওঝাজী আশ্চর্য হয়ে হাঁ হাঁ করে তাঁকে বারণ করবার চেষ্টা করলেন। বলা বাহুল্য এই বাদ্দালী সাহেবটি ছিলেন রাখালদাস। তিনি ওঝাজীকে জানিয়ে দিলেন যে তাঁর বই আর লেখা পড়ে তিনি রাজস্থানের অনেক নোতুন তথ্য জেনেছেন আর ওঝাজীর দৃষ্টিভঙ্গী আর আলোচনা-পদ্ধতি দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। আর এই হিসাবে তিনি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। দ্রোণে একলব্যো মিলন হল এবং এতে দ্রোণ একলব্যের অঙ্গুষ্ঠ যাক্রা করলেন না। প্রচুর শ্রদ্ধা আর ভালবাসা নিয়ে তিনি দেশে ফিরলেন। পরে যখন রাখালদাস প্রভুত্ব বিভাগের চাকরি ছেড়ে কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস আর সংস্কৃতি বিষয়ে অধ্যাপক হন তখন গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝাজী নিজের পুত্র রমেশচন্দ্রকে কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে রাখালদাসের শিষ্যত্ব করবার জন্য কাশীতে পাঠিয়ে দেন। আর রাখালদাসও যথাসক্তি গুরুপুত্রকে বিদ্যাদান করে ওঝাজীর প্রতি তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধার পরিচয় দেন।

এই হচ্ছে মাহুষ রাখালদাসের চরিত্রের একটু পরিচয়। এখন তাঁর তিরোধানের প্রায় আটশ বৎসর পরে যখন তাঁর কথা মনে হয় তখন বেশি করে অহুজকল বল আমাকে আকুল করে তাঁর ব্যক্তিত্ব আর স্নেহপ্রণয় হৃদয়, তাঁর একটা সহজ সৌজন্ম। নানান দিক দিয়ে বিচার করলে তিনি একটা পুরো মাহুষ ছিলেন। ব্যক্তিত্ব মাহুষের সঙ্গে সঙ্গেই অবসিত হয়ে যায়। আর সেই ব্যক্তিত্বের গৌরব যারা দেখেছে তাঁর তিরোধানের পরে তার আর কিছুই অবশেষ থাকে না, কিন্তু তাঁর জ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে, তাঁর অভিজ্ঞতা, অহুভূতি ও উৎস থেকে যে তথ্য আর রস দিয়ে গিয়েছেন তা চিরকাল যতদিন মানসিক সমাজে কার্যমিত্রী ও ভাবমিত্রী প্রতিভার আদর থাকবে ততদিন লুপ্ত হবার নয়।

২৯ চৈত্র ১৩৮১ (১২ এপ্রিল ১৯৭৫) পরিবর্তনশীল রাখালদাস বঙ্গোপাখ্যায়ের নবতিতম জন্মবর্ষপূর্তি উপলক্ষে আরোজিত প্রদর্শনীতে আচার্য্য শ্রীমুনীতকুমার চক্রোপাখ্যায় লিখিত প্রবন্ধের এই পুরাতন পাণ্ডুলিপিটি প্রদর্শিত হয়। রাখালদাসের মৃত্যু ১৯৩০ খ্রীঃ, মুনীতকুমারের পাণ্ডুলিপিটির রচনার তারিখ ৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮।

—পরিবর্তন-সম্পাদক

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীদীপেনচন্দ্র সরকার

ডেইশ বৎসর পূর্বে আমি 'ইতিহাস' পত্রিকার 'ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। কয়েককাল পরে ঐ পত্রিকায় আমার স্বর্গীয় সহপাঠী চারুচন্দ্র দাশগুপ্তের 'মুদ্রাতত্ত্ববিদ রাখালদাস' এবং আমার 'রাখালদাসের উড়িষ্যার ইতিহাস' সংজ্ঞক আরও দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আমার প্রথম প্রবন্ধটির উপসংহারে বলা হইয়াছিল, "রাখালদাসের জ্ঞায় কৃতী বাঙালীর জীবন ও অবদান বিষয়ে উপযুক্ত আলোচনা হয় নাই, ইহা আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয়। 'বাঙালার ইতিহাস' প্রথম খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ গ্রন্থকারের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে তাঁহার অগ্রতম স্ত্রী ঐতিহাসিক শ্রীমতী রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। পুস্তকখানির ভূমিকায় শ্রীমতী মজুমদার স্বর্গীয় বন্ধুর সহক্ষেপে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছেন, রাখালদাস সম্পর্কে অহুসঙ্কিৎস্ব ব্যক্তির উদ্ভাটন একমাত্র উল্লেখ্য। উল্লিখিত ভূমিকার শেষদিকে লেখক ভবিষ্যতে রাখালদাসের বিস্তারিত জীবনী আলোচনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া আমাদের আশাশ্রিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই আশা এ পর্যন্ত ফলবতী হয় নাই। রাখালদাসের বন্ধুবর্গের মধ্যে মজুমদার মহাশয় বাঙালী শ্রীমতী রাখালদাস নাগ প্রভৃতি আরও অনেকে জীবিত আছেন। তাঁহারা সকলে রাখালদাসের সহিত তাঁহাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের কাহিনী প্রকাশ করিলে স্বর্গীয় ঐতিহাসিকের বৈচিত্র্যময় জীবনের অনেক ঘটনা অহুসঙ্কিৎস্ব নবীনদিগের জানিবার সুযোগ হয়।" আজ দেখিতেছি নাগমহাশয় এবং সে-যুগের আরও অনেকে আমাদের কাছে ছাড়িয়া গিয়াছেন। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে মজুমদার মহাশয় আজও আমাদের মধ্যে আসিয়া আমাদের আনন্দ ও উৎসাহ বর্ধন করিতেছেন। কিন্তু তিনি এখন বৃদ্ধ। সুতরাং রাখালদাস সম্পর্কে লিখিবার দায়িত্ব আমাদের মধ্য হইতে অপেক্ষাকৃত তরুণবয়স্ক কাহাকেও গ্রহণ করিতে হইবে।

প্রাচীনকালের ভারতীয়গণ তাঁহাদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস লিখিয়া বান নাই। ভারতবর্ষে ইংরেজ অধিকার প্রতিষ্ঠার সময় হইতে পুরাতন শিলালেখ, তাম্রশাসন ও মুদ্রাদির সাহায্যে প্রাচীন ভারতের সেই লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারের বিজ্ঞানসম্মত চেষ্টা সূচিত হয়। এই উদ্দেশ্যে ভারতীয় সাহিত্যের প্রাচীন গ্রন্থসমূহেরও বিশ্লেষণ চলিতে থাকে। ক্রমে যুক্তিকা খনন করিয়া ভারত সংস্কৃতির বিলুপ্ত নিদর্শনসমূহ আবিষ্কার ও সেগুলি সংরক্ষণ করিবার ব্যবস্থা হয়। প্রথমদিকে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ এই কার্যে ব্রতী ছিলেন। ক্রমে ভারতীয় পণ্ডিতেরাও ইহাতে অংশ গ্রহণ করিতে থাকেন। যে সকল ভারত-সন্ধান এই প্রশংসনীয় কার্যে জীবনপাত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গীয় বাঙালী ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব অনন্তসাধারণ।

রাখালদাসের কর্মজীবন বিশ পঁচিশ বৎসরের অধিক নহে। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি নানা বিষয়ে এত অধিক সংখ্যক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন যে, আমরা তাঁহার পাণ্ডিত্য ও অধ্যবসায়ের উদ্দেশ্যে মন্তক অবনত না করিয়া পারি না। ভারতীয় ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বচর্চার ক্ষেত্রে আর কাহাকেও এইরূপ অল্পসময়ে এত অধিক রচনা প্রকাশ করিতে দেখা যায় নাই। রাখালদাস বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। পুরাতন লেখাদির পাঠ ও ব্যাখ্যা, প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় মূদ্রার ঐতিহাসিক গুরুত্ব নির্ণয়, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পনিদর্শনের মূল্য-বিচার, লেখমুদ্রাদির সাহায্যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন যুগের প্রামাণিক ইতিহাস রচনা, খনন দ্বারা প্রাচীনযুগের ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার ও উহার সংরক্ষণ, প্রাচীন ও মধ্যযুগের পটভূমিকায় মনোরম উপক্ৰাস প্রণয়ন—এইরূপ নানা ধরনের বিভিন্ন বিষয়ে তিনি সমান কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। যে মোহেন-জো-দড়োর ধ্বংসাবশেষ মানব সভ্যতার জন্মভূমি হিসাবে ভারতকে আজ মিশর, মেসোপোটামিয়া, চীন প্রভৃতি দেশের সহিত এক পংক্তিতে দাঁড় করাইয়াছে, উহার প্রতি রাখালদাসই সর্বপ্রথম জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। মোহেন-জো-দড়ো আবিস্কারকে পুরাবিদ রাখালদাসের কীর্তিস্তম্ভ বলা যাইতে পারে।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই এপ্রিল (বাংলা ১২৯২ শালের ১লা বৈশাখ) মুর্শিদাবাদ জেলায় বহরমপুর শহরে রাখালদাসের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মুর্শিদাবাদের নিকটবর্তী দাদাপাড়া গ্রামের এক ধনী ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান ছিলেন। কলিকাতায় হিন্দু কলেজে শিক্ষা লাভ করিয়া মতিলাল বহরমপুরে ওকালতি আরম্ভ করেন এবং শীঘ্রই ব্যবসায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। মতিলালের দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী আটটি সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন; ইহাদের মধ্যে মাত্র একটি বাঁচিয়া ছিল। এই শিশুই পরবর্তীকালের স্বনামধন্য রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাখালদাসের প্রথম জীবন অতিরিক্ত ভোগবিলাসের মধ্যে কাটিয়াছিল। ধনী পিতার দ্বিতীয় পক্ষের একমাত্র জীবিত পুত্র বলিয়া বালাকালে তাঁহার আদর যত্নের সীমা ছিল না। পিতামাতার কাছে তাঁহার নানারকমের অসঙ্গত আবদারও প্রত্যাশ পাইত। ইহার ফলে রাখালদাস প্রথম জীবনে সংযম শিক্ষার সুযোগ পান নাই। এই শিক্ষার অভাব পরিণামে তাঁহার অশেষ দুর্গতির কারণ হইয়াছিল।

কিশোর বয়সেই রাখালদাসের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে পনের বৎসর বয়সে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজিয়েট স্কুল হইতে মাসিক পনের টাকা বৃত্তি পাওয়া তিনি এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পরই উত্তরপাড়ার জমিদার নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা কাঞ্চনমালার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কাঞ্চনমালা বিদ্যুৎ ও গুণবতী ছিলেন। উত্তরকালে তাঁহার রচিত ‘শনির দশা’ উপক্ৰাস খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে রাখালদাস কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে প্রথম বিভাগে এক. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। এই সময়ে তাঁহার পিতামাতার মৃত্যু হয়

এবং তিনি নানা বৈষয়িক গোলমাল ও মামলা বোঝদমায় জড়িত হইয়া বিব্রত হন। তাঁহার প্রথম পুত্র অসীমচন্দ্র এই সময়ে জন্ম গ্রহণ করে। ১২০৭ খ্রীষ্টাব্দে রাখালদাস ইতিহাসে অনার্স সহ বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১২১০ খ্রীষ্টাব্দে ইতিহাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. উপাধি লাভ করেন। ইতিমধ্যে ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র অদ্রীশচন্দ্রের জন্ম হইয়াছিল।

কৈশোরেই রাখালদাসের হৃদয়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের প্রতি অম্লয়াগ সঞ্চারিত হইবার সুযোগ ঘটে। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে এক. এ. পড়িবার সময় তিনি সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত রামেন্দ্রচন্দ্রের জিবেদী এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। ইহার ফলে তিনি প্রাচীন ভারত সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পান। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কে রাখালদাস, তাঁহার প্রাচ্য বিজ্ঞানিকার গুরু বলিয়া উল্লেখ করিতেন। এই সময় খিওডোর ব্লক সাহেব ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগের অন্তর্গত কলিকাতার ভারতীয় প্রদর্শনশালায় পুরাতত্ত্ব সঙ্কলিত শাখার সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন। রাখালদাস ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্ত প্রায়ই প্রদর্শনশালায় যাতায়াত করিতেন। এই সুত্রে সুপণ্ডিত ব্লক সাহেবের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ও সৌহৃদ্য জন্মে। ব্লক সাহেব প্রাচীন হিন্দু যুগের এবং পরবর্তী মুসলমান আমলের শিলালেখাদি পাঠে সুনিপুণ ছিলেন। তাঁহার সাহচর্য ও শিক্ষায় রাখালদাস শীঘ্রই প্রাচীন লিপি পাঠে দক্ষতা অর্জন করেন। ব্লক সাহেবকেও তিনি তাঁহার অগ্রতম গুরু বলিয়া স্বীকার করিতেন। The origin of the Bengali Script সংজ্ঞক গ্রন্থটি রাখালদাস তাঁহার প্রত্নলিপিতত্ত্ব-শিক্ষার এই দুই গুরুর নামে উৎসর্গ করিয়াছেন।

বি. এ. পরীক্ষা পাশ করিবার পূর্বেই রাখালদাস প্রাচীন লেখ ও মুদ্রা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি যে সকল প্রবন্ধ রচনা করেন, তন্মধ্যে গয়া জেলার অন্তর্গত গুরপাতে প্রাচীন কুকুটশাপ বিহারের অবস্থান নির্ণয় বিষয়ক রচনাটি ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায়^৪ প্রকাশিত হয়। মালয় উপদ্বীপে অবস্থিত কতকগুলি যুগ্ম ফলক এবং শক-কুমাণদিগের মুদ্রা সম্পর্কে তাঁহার অপর দুইটি প্রবন্ধ ১২০৭ ও ১২০৮ খ্রীষ্টাব্দে ঐ পত্রিকাতে^৫ প্রকাশিত হইয়াছিল। রাখালদাসের এই সময়ের রচনাবলীর মধ্যে ১২০৮ খ্রীষ্টাব্দে Indian Antiquary (Bombay) তে প্রকাশিত^৬ ভারতীয় ইতিহাসের শক-কুমাণ যুগ সঙ্কলিত পঞ্চাশপৃষ্ঠাব্যাপী বিরাট প্রবন্ধটি তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে। প্রাচীন পণ্ডিত Vincent A. Smith তাঁহার Early History of India সংজ্ঞক সুবিখ্যাত গ্রন্থে^৭ শক-কুমাণ ইতিহাস সম্পর্কে যুবক রাখালদাসের মতামত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১২১০ খ্রীষ্টাব্দে এম. এ. পরীক্ষা পাশ করিবার পূর্বেই রাখালদাসের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি এত বৃদ্ধি পায় যে, অনেকেই তাত্ত্বশাসন ও প্রাচীন মুদ্রা পরীক্ষার জন্য তাঁহাকে আহ্বান

করিতেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্মী প্রদর্শনশালায় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া তিনি উহার পুরাতত্ত্ব শাখায় বস্তুসমূহের তালিকা প্রস্তুত করিয়া দেন। এই সময় Stapleton সাহেব তাঁহার আবিষ্কৃত সমাচার দেবের ঘুঘরাহাটী তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধারভার রাখালদাসের হস্তে গৃহ্য করেন। ইতিমধ্যে আফগানিস্থানের আমীর কলিকাতা অবস্থানকালে এসিয়াটিক সোসাইটীর সভাপতিকৈ পরীক্ষায় জগৎ কতকগুলি প্রাচীন অর্কচিহ্ন যুক্ত মুদ্রা দিয়াছিলেন। ঐ গুলির পরীক্ষার ভারও রাখালদাসের উপর অপিত হয়। ঐ সময় রাখালদাস ২২/২৩ বৎসরের যুবক এবং ছুইটি পুত্রের পিতা। এই অবস্থায় এত অল্প বয়সে এতখানি খ্যাতি লাভের সৌভাগ্য ভারতীয় ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব চর্চার ক্ষেত্রে আর কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়াছে বলিয়া শুনি নাই। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় রাখালদাসের অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এগুলির বিষয়বস্তু ছিল—মথুরা হইতে প্রাপ্ত শক-কৃষাণ যুগের লেখাবলী, প্রাচীন সপ্তগ্রাম, আসামের লেখযুক্ত কামান, প্রথম কুমারগুপ্তের লেখস্বয় এবং লক্ষণ সেনের মাধাইনগর তাম্রশাসন।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী রাখালদাস কলিকাতার ভারতীয় প্রদর্শনশালায় পুরাতত্ত্ব শাখায় জর্নেল সহকারী নিযুক্ত হন। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও কর্মদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া পুরাতত্ত্ব বিভাগের তৎকালীন সর্বাধ্যক্ষ সার জন মার্শাল সাহেব রাখালদাসকে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর ঐ বিভাগের সহকারী সুপারিন্টেন্ডেন্টের উচ্চপদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করিলেন। রাখালদাসের জ্ঞানগরিমায় মুগ্ধ হইয়া বিভাগের কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমচক্রের সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদে উন্নীত করেন। পরবর্তী ছয়বৎসরকাল রাখালদাস তাঁহার পুণ্যস্থিত কার্যালয় হইতে ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে প্রাচীন সাংস্কৃতিক নিদর্শন আবিষ্কার ও সংরক্ষণে অদম্য উৎসাহের পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় তৎকালীন বম্বে প্রেসিডেন্সীর কীর্তিচিহ্নগুলি সংরক্ষণের সুব্যবস্থা হয় এবং উহা সরকারী অমুসোদন লাভ করে। এই সময়ের অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ তিনি বাদামি, ত্রিপুরী ও ভূমারার মন্দিরাদি সম্বন্ধে কয়েকখানি পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে শীতকালে রাখালদাস সিদ্ধুদেশের লারকানা জেলার মোহেনজোদরো অর্থাৎ মরার টিপি নামক স্থান পরিদর্শন করেন এবং ঐ স্থানের মৃত্তিকাস্তূপসমূহে খননকার্য আরম্ভ করেন। হুংথের বিষয়, শীঘ্রই গরম পড়িয়া যাওয়ায় এবং ঐ কার্যের জন্ত উপযুক্ত অর্থ নিদিষ্ট না থাকায় খননকার্য বেশীদূর অগ্রগতি হইতে পারে নাই। কিন্তু সামান্য খননের ফলে রাখালদাস সেখানে সুপ্রাচীন সাংস্কৃতিক বস্তু নিদর্শন আবিষ্কার করিয়াছিলেন উহা হইতেই তিনি মোহেনজোদরোর গুরুত্ব এবং প্রাচীনত্ব বুঝিতে পারিলেন এবং ফলে পুরাতত্ত্ব বিভাগের কর্তৃপক্ষ ঐ স্থানে ক্রমাগত খননকার্য চালাইবার ব্যবস্থা করিলেন। মোহেনজোদরোতে চার পাঁচ হাজার বৎসরের পুরাতন সাংস্কৃতিক নিদর্শন আবিষ্কারের ফলে ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনতা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে। এই আবিষ্কারের গৌরব যে

মূলতঃ রাখালদাসের প্রাপ্য মার্শাল সাহেব তাঁহার Mohenjo-daro and the Indus Civilization সংগ্রহ সুবিখ্যাত গ্রন্থে একথা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, The site had long been known.....; but it was not till 1922, when Mr. R. D. Banerji started to dig there, that the prehistoric character of its remains was revalued.....His primary object was to lay bare the Buddhist remains, and it was while engaged on this task that he came by chance on several seals.....Mr. Banerji himself was quick to appreciate the value of his discovery.....With the hot season rapidly approaching, Mr. Banerji's digging was necessarily very restricted, and it is no wonder, therefore, that his achievements have been put in the shade by the much bigger operations that have since been carried out. This does not, however, lessen the credit due to him.....nothing whatever was then known of the Indus civilization.....Nevertheless, Mr. Banerji divined, and rightly divined, that these earlier remains must have antedated the Buddhist structures, which were only a foot or two above them, by some two or three thousand years. That was no small achievement.....Mr. Banerji's work of Mohenjo-daro.....was carried through in the face of very real difficulties, due in part to lack of adequate funds, in part to the hardship inseparable from camp life in such a trying climate.'*

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, প্রাচীন সাংস্কৃতিক নিদর্শন আবিষ্কারের ব্যাপারে রাখালদাস যেন একটি স্বাভাবিক স্মৃদৃষ্টির অধিকারী ছিলেন। যেখানে অপর কোন মূল্যবান ত্রব্যের অস্তিত্ব সন্দেহ করিত না, সেরূপ স্থান হইতেও তিনি অনেক সময় ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নবস্তুসমূহ আবিষ্কার করিতেন। কেবল যে মোহেন-জো-দরো আবিষ্কারেই তাঁহার এই স্মৃদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় তাহা নহে। গয়া, ঢাকা প্রভৃতি কতিপয় স্থানেও তিনি অদ্ভুত ভাবে কতকগুলি মূল্যবান প্রাচীন লেখ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক সত্য নির্ধারণের ব্যাপারেও রাখালদাস কখনও কখনও এই স্মৃদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে অতি ক্রীণ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া তিনি যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, উত্তরকালে আবিষ্কৃত প্রমাণ হইতে তাহার সমর্থন পাওয়া গিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ ২৮৩ সংবৎসরের পটিয়াকেল্লা শাসনের তারিখে গুপ্তাঙ্কের ব্যবহার, ১১৬১ খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দপালের রাজ্যারম্ভ প্রভৃতি সিদ্ধান্তের উল্লেখ করা যায়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহার সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত হইলেও সত্যের নিকটবর্তী দেখা গিয়াছে। যেমন উড়িষ্যার ভৌমকরবংশের ব্যবহৃত সংবৎসরের আরম্ভ তিনি ৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়াছিলেন। ইহা

প্রকৃত তারিখ অর্থাৎ ৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের খুবই নিকটবর্তী। অবশ্য একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে রাখালদাসের কোন কোন সিদ্ধান্ত অসার প্রমাণিত হইয়াছে। যেমন তাঁহার মতে খড়্গবংশীয় দেবখড়্গ ধর্মশালের পরবর্তী সেনবংশীয় লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের ১১১২ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ এবং ১১৭০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে শেষ হইতাদি, ইত্যাদি। কোন কোন ক্ষেত্রে রাখালদাসকে নিজের ভ্রান্ত মত পরিভ্রান্ত করিতেও দেখা গিয়াছে। যেমন ধর্মাদিত্য, গোপচন্দ্র ও সমাচার-দেবের তাম্রশালনসমূহকে তিনি প্রথমে জাল মনে করিতেন; কিন্তু পরে এই মত পরিবর্তন করিয়াছিলেন।

মোহেন-জো-দরোতে অবস্থানকালে রাখালদাসকে যে শারীরিক কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল, উহার ফলে পুনায় ফিরিয়া তিনি গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হন এবং বাধ্য হইয়া এক বৎসরের ছুটি লন। ইহার অল্পকাল পূর্বে জ্যেষ্ঠ পুত্র অশীমের মৃত্যুতে নিদারুণ শোক পাইয়াছিলেন। ১২২৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে রাখালদাস পুরাতত্ত্ব বিভাগের পূর্বচক্রের সুপারিন্টেন্ডেন্টরূপে কলিকাতায় আসেন। অতঃপর তিনি উত্তরবাংলার রাজশাহীজেলার অন্তর্গত পাহাড়পুরে খননকার্য আরম্ভ করেন। এই স্থানে পরবর্তীকালে বাংলাদেশের যে সকল প্রাচীন সাংস্কৃতিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহারও কৃতিত্ব অনেকখানি রাখালদাসের প্রাপ্য।

১২২৬ খ্রীষ্টাব্দে ভ্রমণ-পোষণের জন্য সামান্য কিছু পেনশন দিয়া রাখালদাসকে সরকারী কার্য হইতে অপস্থত করা হয়। জব্বলপুর জেলার অন্তর্গত ভেড়াঘাটের চৌষটি বোগিনীর মন্দির হইতে একটি মূর্তি অপসারণের অভিযোগে প্রথমে তাঁহাকে অস্থায়ীভাবে কর্মচ্যুত করা হয়। এই অভিযোগ প্রমাণিত না হইলেও অন্ত্যস্ত কয়েকটি ব্যাপারে সন্দেহ করিয়া তাঁহাকে কর্মচ্যুত করা হইল। অনগ্রসাধারণ প্রতিভা ও কর্ম-দক্ষতার অধিকারী হইয়াও এইরূপে রাখালদাস অদূরদর্শিতা এবং দুর্দৃষ্টবশতঃ নিগৃহীত হইলেন। তিনি বিপুল পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকার পাইয়াছিলেন। তদুপরি তাঁহার মাতামহীর সম্পত্তিও তিনি উত্তরাধিকার স্বত্ব লাভ করেন। কিন্তু রাখালদাসের অমিতব্যয়িতার জন্য সে সমস্তই নষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার রাজকীয় চালচলনের কথা পুরাতত্ত্ব বিভাগের প্রাচীন কর্মচারীর মুখে শুনিয়াছি। বখন টাকায় আধরণ-একষণ চাউল পাওয়া যাইত সেই সময়ে রাখালদাস বেলষ্টেশনের কুলীকে দশটাকা বখশিস করিতেন। তিনি পুরাতত্ত্ব বিভাগের সর্বাধ্যক্ষ মার্শাল সাহেবের সহিত সমান চালে চলিতেন এবং সাহেবের মুখের উপর ফুক করিয়া সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন না। এদিকে মার্শাল রাখালদাসের পাণ্ডিত্যকে বখেট প্রছা করিতেন। শুনিয়াছি, তিনি বখন জানিলেন যে, চৌষটি বোগিনী মন্দিরের পুরোহিত রাখালদাসের নামে আদালতে নালিশ করিয়াছেন এবং বুলিলেন যে রাখালদাসকে রক্ষা করা তাঁহার হাতের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে, তখন অসহায়ভাবে কেবল বলিয়াছিলেন, Poor Mr. Banerji ! Poor Mr. Banerji !

কর্মচ্যুত হইয়া রাখালদাস অর্থাভাবে দারুণ কষ্ট পাউতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি দুঃসাহসে বাসিতেও ভুগিতেছিলেন। এই দুদিনে রমাপ্রসাদ চন্দ্র মহাশয়ের পরামর্শে উড়িষ্যা ইতিহাস বিষয়ক বিরাট গ্রন্থখানি লিখিয়া তৎক্ষণ অর্থে তাঁহাকে কোনরূপে সংসার চালাইতে হইয়াছিল। ময়ূরভদ্রের পুরাতত্ত্বগ্রন্থাগারী মহারাজ এই গ্রন্থের বায়ভার গ্রহণ করেন এবং ‘প্রবাসী’ সম্পাদক অনামখাতা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উহার প্রকাশনার দায়িত্ব লন। যে অবস্থায় রাখালদাস এই গ্রন্থখানি লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, দুঃসাহসে তাঁহাকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যেই উহা লিখিবার ভার তৎপ্রতি অর্পিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ সে সময়ে এই ইতিহাস লিখিবার যোগ্যতম ব্যক্তি ছিলেন রাখালদাস। কারণ ইতিপূর্বে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় উড়িষ্যা প্রাচীন ইতিহাস ও ভাস্কর্য্যাদি সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধ রচনা করিয়া ঐ অঞ্চলের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। একমাত্র পুরাতত্ত্ব বিভাগের এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা সংজ্ঞক পত্রিকাতেই তিনি উড়িষ্যা আটটি ভাস্কর্য্যসমূহ এবং বহু সংখ্যক গুহালিপি প্রকাশ করেন। এতদ্ব্যতীত উড়িষ্যা সম্পর্কে তিনি অপর যে সকল রচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে বিহার-উড়িষ্যা-গবেষণা-সমিতির পত্রিকা এবং এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকাতে প্রকাশিত কতকগুলি প্রবন্ধ অত্যন্ত মূল্যবান।

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে বারানসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় রাখালদাসকে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী অধ্যাপক নিযুক্ত করায় তাঁহার কিঞ্চিৎ অর্থকষ্টের উপশম হইয়াছিল। কিন্তু বিলাস এবং অপব্যয়ে অভ্যস্ত রাখালদাস এই আয়ে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ হুংশোকে তাঁহার শরীর মন একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে (বাংলা ১৩৩৭ সালের ২২ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার) একমাত্র জীবিত পুত্র অজীশকে নিঃস্বল অবস্থায় ফেলিয়া মাত্র পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে রাখালদাস কলিকাতায় প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তাঁহাকে তাঁহার কলিকাতার বাড়ীখানি বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। রাখালদাসের এই শোচনীয় পরিণাম স্মরণ করিয়া আমাদের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়।

রাখালদাসের অগণিত প্রবন্ধ বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকা, বিহার রিসার্চ সোসাইটির পত্রিকা, Epigraphia Indica, লণ্ডনের রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিবৎ পত্রিকা, Indian Antiquary, Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute, ভারতবর্ষ, প্রবাসী প্রভৃতি ইংরেজী ও বাংলা সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত তাঁহার রচিত বাংলা ও ইংরেজী গ্রন্থের সংখ্যাও অনেক। বাংলা গ্রন্থের মধ্যে ‘বঙ্গালার ইতিহাস’ (প্রথম ভাগ, ১৩২১ সাল; দ্বিতীয় ভাগ, ১৩২৪ সাল) ও ‘প্রাচীন মূর্ত্তা’ (১৩২২ সাল) ব্যতীত ‘পাণ্ডারের কথা’, ‘শশাক’, ‘করুণা’, ‘ধর্ম্মপাল’, ‘অসীম’, ‘ময়ূর’ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। রাখালদাস রচিত ইংরেজী গ্রন্থের মধ্যে The Palas of Bengal (1915), The Origin

of the Bengali Script (1919), The Temples of Siva of Bhumara (MASJ, No. 16, 1924), Bas-reliefs of Badami (MASJ, No. 25, 1928), History of Orissa Vol. I, 1930, vol. II, 1931), The Haihayas of Tripuri and their Monuments (MASJ, No. 23, 1931), The Age of the Imperial Guptas (1933), Eastern Indian School of Medieval Sculpture (1933) এবং Prehistoric, Ancient and Hindu India (1934) বিখ্যাত।

পূর্বেই বলিয়াছি, স্বল্প-পরিমল কর্ম-জীবনে রাখালদাস যে বিভিন্ন বিষয়ে এত অধিক রচনা প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহা তাঁহার অদ্ভুত অধ্যবসায় ও পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। তাঁহার সহিত কোন কোন বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্যের মতৈক্য না হইতে পারে; কিন্তু তিনি যে তদীয় রচনাবলীতে অশেষ অধ্যবসয়ে সংগৃহীত বহু মূল্যবান তথ্যের সমাবেশ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। তবে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে তাঁহার রচনায় কোন কোন ক্ষেত্রে পাণ্ডিত্য ও প্রতিভাকে অভাব-সিদ্ধ বিলাসিতা ও অসংযমের চাপে পীড়িত দেখা যায়। শোনা যায়, অনেক সময় তিনি স্বয়ং লেখনী চালনা না করিয়া মুখে মুখে রচনা করিয়া যাঠেতেন এবং অপর কেহ তাহা শুনিয়া লিখিয়া লইত। ইহা অবশ্য তাঁহার সুগভীর পাণ্ডিত্য এবং বিষয়বস্তুর উপর তাঁহার অসাধারণ অধিকারের সাক্ষ্য দেয়; কিন্তু এইরূপ রচনায় গ্রন্থকারের সাবধানতা, সূক্ষ্ম বিচারশক্তি ও পাণ্ডিত্যের সম্যক পরিচয়ের অভাব থাকা নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে। যেমন ধরুন, একস্থানে তিনি বলিয়াছেন, “৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে রাষ্ট্রকূটরাজ কৃষ্ণরাজ জীবিত ছিলেন; হুতরাং তাঁহার পুত্র ধ্রুবধারাবর্ষ তখনও সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই।”^{১১} অথচ যে ‘জৈন হরি-বংশের’ ভিত্তিতে একথা বলা হইল, তাহাতে আছে যে, ৭০৫ শকাব্দে বা ৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণরাজের পুত্র শ্রীবল্লভ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অবশ্য এই শ্রীবল্লভ কৃষ্ণরাজের প্রথম পুত্র দ্বিতীয় গোবিন্দ অথবা দ্বিতীয় পুত্র ধ্রুব ধারাবর্ষ, তাহা জানা যায় নাই। কিন্তু অসাবধানতাজনিত ভুলটি এখানে অত্যন্ত স্পষ্ট। যাহা হউক, এইরূপ ত্রুটি বিচ্যুতি রাখালদাসের উড়িয়ার ইতিহাসে অধিক দেখা যায়। ইহার প্রধান কারণ এই যে, এ গ্রন্থখানি তিনি ব্যাধি ও দারিদ্র্য-পীড়িত অবস্থায় ডাড়াহুড়া করিয়া লিখিয়াছিলেন এবং হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় গ্রন্থটি তিনি ভালরূপে সংশোধন করিয়া যাঠেতেন পারেন নাই। যাহা হউক, রাখালদাসের গবেষণাত্মক রচনায় কোথাও কোথাও কিঞ্চিৎ অসাবধানতার পরিচয় মিলিলেও, তাঁহার রচনাবলীর নিকট ভারতীয় ইতিহাসের ছাত্রের অপরিস্রব অণুর কথা তুলিলে চলিবে না। অনেক ক্ষেত্রে তিনি আমাদের পথপ্রদর্শকের কার্য করিয়া গিয়াছেন।

ভারতীয় মুদ্রাতত্ত্ব-শিক্ষার্থীদের জন্য রচিত রাখালদাসের ‘প্রাচীন মুদ্রা’ প্রকাশের সময় বাংলা ভাষা দূরের কথা ইংরেজীতেও এইরূপ গ্রন্থের অভাব ছিল না। দুই খণ্ডে

রচিত তাঁহার 'বাঙ্গালার ইতিহাস' সম্পর্কেও এই উক্তি প্রযোজ্য। এই গ্রন্থে বাংলা দেশের হিন্দু ও মুসলমান আমলের ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থগুলি ইংরেজীতে রচিত হইলে গ্রন্থকারের খ্যাতি ও অর্থলাভ অনেক অধিক হইত, সন্দেহ নাই। অসাধারণ মাতৃভাষা-প্ৰীতি রামলাদাসকে গ্রন্থগুলি বাংলা ভাষায় রচনা করিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বাংলা দেশের প্রাচীন ও মধ্য যুগের ইতিহাস রচনা রাখালদাসের আশ্রয় অপর কেহ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। 'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রথম ভাগের সহিত কেবল উহার দুই বৎসর পূর্বে প্রকাশিত রামাশ্রমদাস চন্দ মহাশয়ের 'গৌড়রাজমালা'র তুলনা চলিতে পারে; তৎকাল-প্রচলিত আর কোন গ্রন্থের সহিত উহার তুলনা চল না। এই সময়ের মধ্যে বাংলার যে সকল প্রাচীন ইতিহাস রচিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—রাজস্ব কাণ্ড' (১৩২১ সাল) উল্লেখযোগ্য। কিন্তু উহাতেও ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে তুলপঞ্জীর মূল্য বিচারে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুমত হয় নাই। হুতরাং চন্দ মহাশয় ও রাখালদাস বাংলার ইতিহাস চর্চায় নবযুগের সূচনা করেন, বলিতে হইবে। এই দুই জনের মধ্যে বাংলার ইতিহাসে রাখালদাসের গবেষণার ক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত। তা ছাড়া ধর্মপালের তারিখ প্রভৃতি দুই একটি বিষয়ে রাখালদাসের মতামত চন্দ মহাশয়ের মতামত অপেক্ষা প্রমাণসহ বলিয়া দেখা গিয়াছে। রাখালদাসের ধর্মপালের তারিখ বিষয়ক অভিমত এই সময়ে প্রকাশিত The Palas of Bengal গ্রন্থেও উল্লিখিত হইয়াছিল। এই পুস্তকখানিও বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে লিখিত প্রাচীন বাংলার ইতিহাস গ্রন্থের মধ্যে প্রথম দিকের বলিয়া গণ্য হইবে। প্রাচীন বাংলার সহিত সম্পর্কিত রাখালদাসের অপর দুইখানি পুস্তক—The Origin of the Bengali Script এবং Eastern Indian School of Medieval Sculpture.

উপরে আমরা রাখালদাসের প্রথম যৌবনে রচিত শক-কুষাণ আমলের ইতিহাসের উল্লেখ করিয়াছি। ইহা ব্যতীত তাঁহার গুপ্ত যুগের ইতিহাস, প্রাগৈতিহাসিক ও প্রাচীন ভারতবর্ষ, উড়িষ্যার ইতিহাস, হৈহয়-কলচুরিবংশের ইতিবৃত্ত ও সে যুগের মন্দিরাদি, বাদামির ভাস্কর্য-শিল্প, ভূমারার শিবমন্দিরাদি প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লেখ করা হইয়াছে। রাখালদাসের উড়িষ্যার ইতিহাস কেবল মাত্র প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিবৃত্ত নহে, উহাতে ইংরেজাধিকার কাল পর্যন্ত উড়িষ্যার ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। রাখালদাস ব্যতীত অপর কেহ উড়িষ্যার মত ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ জনপদের প্রাচীন, মধ্যযুগ ও আধুনিক কালের প্রথম দিকের বিস্তৃত ইতিহাস রচনা করিতে সাহসী হইতেন কিনা সন্দেহ। এই বিরাট গ্রন্থে কিছু কিছু ত্রুটি থাকিলেও ইহা উড়িষ্যার ইতিহাস চর্চায় যুগান্তর আনিয়াছে। উপরে উল্লিখিত গ্রন্থাবলী ও বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হিন্দু ও মুসলমান আমলের ইতিহাস, লেখমালা, মুদ্রা, স্থাপত্য-শিল্প, ভাস্কর্য্যাদি সম্পর্কিত তাঁহার অগণিত প্রবন্ধ পাঠ করিলে

রাখালদাসের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী, পাণ্ডিত্যের গভীরতা এবং অমূল্যসমার ব্যাপকতা স্পষ্ট বোঝা যায়। তাই বলিয়া আমরা বলিনা যে, রাখালদাস ভারতীয় সাংস্কৃতিক সর্বক্ষেত্রেই লেখনী চালনা করিয়াছেন। যেমন ধরুন, তাঁহার গুপ্তযুগ সম্পর্কিত গ্রন্থখানিতেও সে যুগের সাহিত্য সম্বন্ধে কোন কথা নাই।

রাখালদাসের বাংলার গ্রন্থাবলীর মধ্যে ‘পাষণের কথা’র নাম সর্বাপেক্ষে উল্লেখযোগ্য। গুপ্তযুগ, শশাঙ্ক ও ধর্মপালের রাজত্বকাল এবং মুঘল আমলের পটভূমিকায় তিনি যে উপন্যাস-গুলি লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অদ্ভুত শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলা ভাষায় রাখালদাসের পূর্বে ও পরে হিন্দু ও মুসলমান আমলের ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে বহু উপন্যাস রচিত হইয়াছে। কিন্তু রাখালদাসের ঐ জাতীয় উপন্যাসের কাছে সেগুলি নিতান্ত নিম্নস্ত। তাহার কারণ এই যে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারত সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা তাঁহাকে উপন্যাসগুলিতে যুগোপযোগী আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে সাহায্য করিয়াছিল। বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাস-রচয়িতাদিগের মধ্যে এই প্রাচীন আবহাওয়া সৃষ্টির ব্যাপারে আর কেহ রাখালদাসের ত্রায় কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই।

ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক প্রতিভা ব্যতীত রাখালদাস অপূর্ব সংগঠনশক্তির অধিকারী ছিলেন। বম্বের Prince of Wales Museum-এর পুরাতত্ত্ব শাখাটি তিনিই গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের দ্বারা বিষ্ণু প্রতিষ্ঠান তাঁহার সহযোগিতায় বিশেষ ভাবে উপকৃত হইয়াছিল। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির শাসনাবলী এবং সাহিত্য পরিষদের লেখমালার তালিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন।^{১২} তাঁহার চেষ্টায় সাহিত্য পরিষদের অনেক সংস্কার সাধিত হয়। এই উপলক্ষ্যে তিনি তাঁহার প্রকার পাত্র রামেন্দুসুন্দর ও হরপ্রসাদের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পশ্চাত্তাপ হন নাই।

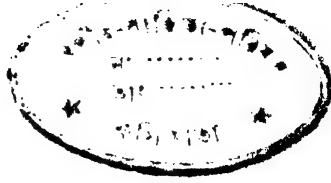
উপরে আমরা সংক্ষেপে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী ও কৃতিত্বের বিষয় আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু মাহুষ হিসাবে তাঁহার চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ না করিলে এটো আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। যে কেহই রাখালদাসের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তিনিই তাঁহার বন্ধুবাৎসল্য ও আতিথেয়তার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। কলিকাতার অবস্থানকালে তাঁহার গৃহে রোজ সন্ধ্যাবেলা অপরিসীম বন্ধুগণের শুভাগমন হইত এবং নানা বিষয়ে আলোচনা চলিত। রাখালদাস ও তাঁহার গ্রন্থগী সাগ্রহে বন্ধুগণকে অভ্যর্থনা করিতেন এবং সানন্দে তাঁহাদিগকে ভূরিভোজনে পরিতৃপ্ত করিয়া গৃহে ফিরাইতেন।

পাদটীকা

১। ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ভাদ্র-কার্ত্তিক, ১৩৫২ সাল, পৃষ্ঠা ১২-২২।

২। ৭ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, ফাল্গুন-বৈশাখ, ১৩৬৩-৬৪ সাল, পৃষ্ঠা ১৪০-৪১।

- ৩। চম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, ভাদ্র-কান্তিক, ১৩৬৪ সাল, পৃষ্ঠা ১-৮।
- ৪। New Series, Vol. II, pp. 77-83.
- ৫। ঐ, vol. III, pp. 459-70, vol. IV., pp. 81 ff.
- ৬। দ্রষ্টব্য February, 1908, pp. 25-75.
- ৬ ক। 4th edition, 1924, p. 271, note 1.
- ৭। JASB, Vol. VI, 1910, pp. 429-36.
- ৮। ঐ, pp. 227-31.
- ৯। ঐ, pp. 237 ff., 245 ff., 271 ff., 457 ff., 465 ff., 467 ff.
- ১০। দ্রষ্টব্য pp. 10-11.
- ১১। বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৩০, পৃষ্ঠা ১৪৯।
- ১২। JASB, NS, Vol. VI, 1910 pp. 485-96., লেখমালাত্বক্রমণী, ১ম ভাগ।



রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

কীৰ্ত্তীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে সব তরুণ বাঙালী সাহিত্যে, দর্শনে, ইতিহাসে, বিজ্ঞানে ও শিল্পে নিজেদের উৎসর্গীকৃত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে এখন একমাত্র আচার্য্য রমেশচন্দ্র মজুমদারই জীবিত, রাখালদাস তাঁহাদের অগ্রতম। পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর দুইপার্শ্বে অবস্থিত শতশত প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কর্ণসুবর্ণের অনতিদূরে অবস্থিত বহরমপুরে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রেরণার উৎস যে কোনখানে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে কষ্ট হয় না। কারণ শৈশব ও প্রথম যৌবনের দিনগুলির সাহচর্য্যে চেতনা উন্মেষ প্রকৃত ঘটনার মূল্যায়নের ইতিহাস। কেবল তাহাই নহে সমকালীন সামাজিক ঘটনাবলীর প্রতিকলিত প্রতিক্রিয়া যে তাঁহার ব্যক্তিত্বের দুইটি ভিন্নমুখী মানবিকতার পরিচয় সে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জ্ঞান মনো-বিজ্ঞানীর সাহায্য লওয়া প্রয়োজন হয় না। এই দুই ভিন্নমুখী মানবিকতার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁহার প্রণীত গ্রন্থাবলীতে। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে রচিত ইতিহাস এবং দ্বিতীয়তঃ ঐতিহাসিক উপল্যাপে এই বিষয় আসে নাই। বিশ্বের প্রথম বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের রচয়িতা থুসিডাইডিসের যথেষ্ট প্রভাব আছে। আমার তাঁহার জীবনের সঙ্গে মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনেও একা আছে। দুইজনেই স্রষ্টা, এবং সৃষ্টির আনন্দেই সমাহিত হইয়া অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন বিষ্মত হইয়াছিলেন। দীর্ঘকালীন দুর্যোগ্য ব্যথির করাল গ্রাসে পতিত হইয়াও ইতিহাসের অতীতবাহ্য হইতে দেন নাই। তাঁহার তথ্যানিষ্ঠ মনের পরিচয় ডাঃ অনন্তপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী তাঁহার মৃত্যুর পর লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বারানসীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের সময় ভগ্নস্বাস্থ্য ঐতিহাসিককে তিনি বলিয়াছিলেন “আর কেন, এখন পরলোকের চিন্তা করুন।” তাহার উত্তরে রাখালদাস বলিয়াছিলেন “পরলোকের যে অস্তিত্ব আছে তাহার প্রমাণ দিতে পার ?”

বাল্য এবং কৈশোরের সামাজিক জীবনের প্রতিকলনের প্রশ্ন আগেই উল্লেখ করিয়াছি। কারণ এই সময় হইতে আমরা তাঁহার জীবনের অনেক প্রমাণ পাই। তিনি বলিডেন, বহরমপুর নবাবের দেশ, ঊনবিংশ শতাব্দীর সেখানকার ধনী সমাজ অত্যন্ত বিলাসী ও অসংযমী ছিলেন। বিশেষতঃ যেখানে অর্থের প্রশ্ন। আমার জ্যেষ্ঠভাতৃ হেমলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে শুনিয়াছি সেখানকার এক অভিজাত বংশের সন্তান ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গহর জানকে রক্তিতা রাখিয়াছিলেন। তিনি একদিন অপরাজে নর্ত্তকীর গৃহে গমন করিয়া দেখিলেন যে তিনি শিরঃপীড়ায় ভুগিতেছেন, কারণ সময়ে চা পান হয় নাই। তখন তাঁহার

পকেটে যে পকাশ হাজার টাকার নোট ছিল তাহা জ্বালাইয়া গহরজানের চা তৈয়ারী হইয়াছিল।

অনেকে মনে করেন যে তিনি কলিকাতায় আসিয়া পুরাতত্ত্বের প্রেরণা পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন যে রামদাস সেন মুর্শিদাবাদের সুসন্তান। সম্পর্কটা ঠিক আমি জানিনা, তবে অস্বাভাবিক হয় তাঁহার সর্বাংশে প্রিয় বন্ধু এবং সহপাঠী ৮ বোম্বাই সেন বোধ-হয় রামদাসের পুত্র। ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায় কিছুদিন বহরমপুরে ডেপুটি কালেক্টার ছিলেন এবং আমার পিতামহ আদালত হইতে ৮ পুরণচাঁদ নানারের নাবালকত্বের সময় তাঁহাদের এস্টেটের রিসিভার নিযুক্ত হইয়া ছিলেন। ৮ রামেন্দ্রসুন্দর জিবেদী, জেলা মুর্শিদাবাদের কান্দী মহকুমায় জম্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদের সকলের প্রভাব বাল্য হইতে রাখালদাসের উপর নিশ্চয়ই পড়িয়াছিল।

পুরাতত্ত্ব-সর্ব্বক্ষেণে দীর্ঘকাল কার্য করিবার সময় তাঁহার জীবনের ঘটনা-সমূহ কিংবদন্তীতে পরিণত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। তাঁহার বহুখ্যাত ব্যক্তিত্বের প্রকাশ এই সাহিত্য-পরিষদে পাওয়া যায়। আর একটা কথা বলিয়া আমার এই আলোচনা সমাপ্ত করিব। তাহা হইতেছে তাঁহার একাধারে নির্ভেজাল ঐতিহাসের সাধনা এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক উপগ্রাস রচনায় সাক্ষ্য লাভ করা। সাহিত্য-সাধনায় কোন সহজ চমৎকৃতিতে তাঁহার প্রকৃতি মুক্তির সন্ধান পায় নাই। এই দুইটি গুণ তাঁহার সমসাময়িক কোন ভারতীয় ঐতিহাসিকের মধ্যে দেখা যায় নাই। তাঁহার উপগ্রাসের অনেক চরিত্র ঐতিহাসিক ব্যক্তি, আবার কয়েকজন কাল্পনিকও আছেন। একাদশ এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে সুপ্রাচীন রোহিতাখ দুর্গ ধবল-বংশীয় জাগিলীয় মহানায়কগণের অধীনে ছিল। জাপ্লা এখন ঠিক রোহিতাখ দুর্গের অপর দিকে শোন নদীর তীরে অবস্থিত। জাপ্লা বাইবার জন্ত একটি বন্ধুর গিরিবন্ধ বন্ধুঘাট পর্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। তবে এই ধবল-বংশের সহিত গুপ্ত সম্রাটগণের কোন সম্পর্কই ছিলনা। তাঁহারা কান্তকূজের গাহডবল রাজ্যের সামন্ত ছিলেন। তাঁহার ঐতিহাসিক উপগ্রাসের আলোচনা আচার্য্য হুমুয়ার সেন করিয়াছেন। তাঁহার এইসব উপগ্রাসের মধ্যে Lytton এবং Sir Walter Scott এর প্রভাব আছে বলিয়া মনে হয়। যেমন দেবধরের আত্মোৎসর্গ Last Days of Pompeii হইতে লওয়া। আজ আমার কথা এইখানেই সমাপ্ত করি। আপনারা যে আজ অগ্রহ করিয়া এখানে আসিয়াছেন তাহার জন্ত আমি ও তাঁহার পৌত্র ও পৌত্রীরা বিশেষ কৃতজ্ঞ। তাঁহার শতাব্দীর বৃত্তি-বার্ষিকী দেখিয়া যাওয়া হয়ত আমার পক্ষে আর সম্ভবপর হইবে না, সেই জন্ত আমি শ্রীমদনমোহন কুমার ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্মীগণের নিকট অশেষ ঋণী।

লালন ফকির

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

লালন ফকিরের সাধনভূমি সেউড়িয়া গ্রাম। তা কুষ্টিয়া সহরের নিকটে কালীগঞ্জার তীরে অবস্থিত। সেকালে ‘হিতকারী’ নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা এখান হতে প্রকাশিত হত। সাধক লালন ফকির বিখ্যাত মানুষ ছিলেন; ঠিক বলতে কি তিনি বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যমণি ছিলেন। তাই তিনি যখন মেহরফা করেন এই পত্রিকায় তাঁর সম্বন্ধে একটি বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। তা হতে জানা যায়, তাঁর মৃত্যুর তারিখ ছিল ১৭ই অক্টোবর, ১৮৯০। তিনি খুব দীর্ঘায়ু ছিলেন এবং বলা হয়ে থাকে তিনি ১১৬ বছর জীবিত ছিলেন। সুতরাং তাঁর জন্ম বৎসর পড়ে ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। এই হিসাবে ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্মের দুইশত বছর পূর্ণ হয়েছে। সাধক লালন ফকির ছিলেন হিন্দু-মুসলমানের মিলন-সেতু; তিনি ছিলেন বাঙালীর গৌরব। বর্তমান প্রবন্ধে তাঁর জীবনী ও সাধনা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করে, তাঁর জন্মলগ্নের দুই শত বৎসর পরে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধাার্ঘ্য নিবেদন করি।

লালন ফকিরের জীবন ভারি বৈচিত্র্যপূর্ণ। এক নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে তিনি সাধনার জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কুষ্টিয়ার নিকটে ভাণ্ডারিয়া গ্রামের এক হিন্দু পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতা পদ্মাবতী ছিলেন ভগ্নদামের কনিষ্ঠা কন্যা। তাঁর নিজের নাম ছিল লালন কর। প্রথম যৌবনে তাঁর বিবাহ হয় এবং বিধবা মাতা ও পত্নীকে নিয়ে তিনি ভাণ্ডারিয়ার সংসার পাতেন।

তারপর গ্রামের মানুষের সঙ্গে তিনি নদীপথে তীর্থভ্রমণে যান। তাঁর জীবনীকার বসন্তকুমার পালের মতে তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে যান। শ্রীশচীন্দ্রনাথ অবিকারীর মতে তিনি শ্রীক্ষেত্রে যান। সম্ভবত দুটিই কিংবদন্তী। তবে মনে হয় শ্রীক্ষেত্রে যাওয়াই বেশী সম্ভব, কারণ বহরমপুরের তীর্থক্ষেত্র হিসাবে খ্যাতি নাই।

তীর্থযাত্রা শেষ করে ফেরবার পথে তিনি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন এবং সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। সহবাত্রীরা তাঁকে মৃত বলে ধরে নিয়ে মুখাণি দিয়ে গঙ্গাতীরে ফেলে দিয়ে চলে যান। পাশেই জোলাঘের এক পরী ছিল। সেখান হতে এক মুসলমান মহিলা নদীতে জল নিতে এসে তাঁকে দেখতে পান; কিন্তু তিনি এবং প্রতিবেশীরা লক্ষ্য করেন তিনি তখনও মারা যাননি। মহিলাটি নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে দীর্ঘকাল ধরে তাঁর সেবা ও গুস্তা করে তাঁকে সুস্থ করে তোলেন। তখন তিনি আবার নিজের গৃহপতিমুখে রওনা হন।

আমরা এই কথা পাই শ্রীবসন্তকুমার পাল রচিত ‘মহাত্মা লালন ফকির’ নামে জীবনী

গ্রন্থ হতে। শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী তাঁর 'শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ' নামক গ্রন্থে একটি স্বতন্ত্র কাহিনী দিয়েছেন (পৃ: ১২৩)। তিনি বলেন সিরাজ সাঁই তাঁকে কুড়িয়ে পান এবং পালন করে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করেন। মনে হয় এ বিষয় বসন্তবাবুর কাহিনী বেশী নির্ভরযোগ্য। যিনি বাউল সম্প্রদায়ভুক্ত তিনি একজনকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করবার জ্ঞান উদগ্রীব হবেন না। আর তাহলে লালন ফকিরের গৃহে প্রত্যাগমনের ঘটনাও ঘটতে পারে না। তিনি যে স্বগ্রামে এসেছিলেন তাঁর প্রমাণ তাঁর সংলগ্ন স্থানেই তিনি আখড়া স্থাপন করেছিলেন। অপর পক্ষে সিরাজ সাঁই বশোহরের লোক ছিলেন।

ওদিকে সহযাত্রীরা ফিরে এসে তাঁর মাকে খবর দেন যে পথে বসন্ত রোগে তিনি মারা যাওয়ার তাঁর মুখাণ্ডি করে তাঁরা চলে এসেছেন। স্বতরাং তা অবধারিত সত্য ধরে নিয়ে বাড়িতে তাঁর শ্রাদ্ধ হয় এবং তাঁর পত্নী বিধবার জীবন যাপন করতে শুরু করেন।

এদিকে লালন কর বাড়ীতে ফিরে এসে দেখেন সকলেই তাঁকে দেখে অবাক হয়ে গেছে। অবশ্য তাঁকে চিনতে বাড়ীর তথা গ্রামের লোকের অস্বীকার হয়নি। তখন এক সমস্যা ওঠে যে তাঁকে সমাজে স্থান দেওয়া হবে কি না। পণ্ডিতেরা বিধান দেন যে যখন তাঁর শ্রাদ্ধকার্য সম্পন্ন হয়ে গেছে তিনি সমাজের চোখে মৃত; স্বতরাং তাঁর মাতা ও পত্নী তাঁকে গ্রহণ করতে পারেন না।

অগত্যা লালন ফকির গৃহত্যাগ করতে বাধ্য হন। ইতিপূর্বে রোগমুক্তির পর যখন তিনি আয়োগ্যের পথে তাঁর মুসলমান আশ্রয়দাতার গৃহে অবস্থান করছিলেন, সেই সময় ঘটনাচক্রে বশোহরের বিখ্যাত বাউল সিরাজ সাঁই সেখানে আসেন এবং তাঁকে বাউল-তত্ত্বের সহিত পরিচিত করান। এখন বিবাগী হয়ে তিনি বাউল সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে যান এবং পরে সেউড়িয়াতে নিজের আখড়া স্থাপন করেন। বাউল হিসাবে তিনি অসাধারণ খ্যাতি লাভ করেন। মনে যখন ভাবের উদয় হত তিনি মুখে মুখে সঙ্গীত রচনা করতেন এবং শিষ্যরা তা লিখে রাখত। মনে যখন ভাবের জোয়ার আসত, তিনি শিষ্যদের বলতেন 'পোনার ঝাঁক এসেছে', আর শিষ্যরা তখন কাগজ-কলম নিয়ে প্রস্তুত হত। তিনি এইভাবে অজস্র বাউল সঙ্গীত রচনা করে গেছেন। তাঁর কিছু উদ্ধার হয়েছে, বেশীর ভাগই নাকি হয় নি।

এই বাউল সম্প্রদায় যে সাধনরীতি গড়ে তুলেছে সে বিষয় কিছু প্রাথমিক কথা বলা দরকার হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ এই তত্ত্বের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়ে পড়েন এবং কিছু বাউল সঙ্গীত সংগ্রহও করেন। তিনি বাউল তত্ত্বের প্রতি কতখানি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন, তা তাঁর 'মিলিজিহান অব ম্যান' গ্রন্থে সর্বিস্তার উল্লেখ করেছেন। এ শ্রদ্ধা তাঁর মনে অকারণে সঞ্চারিত হয় নি। এই সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ভেদ স্বীকার করে না। একই ঈশ্বরের সন্তান হয়ে, একই পৃথিবীর কোলে বাস করে তারা ধর্মের ভিত্তিতে ভেদজ্ঞানের

কোনও তাৎপর্য খুঁজে পায় না। তারা কোনও আনুষ্ঠানিক রীতি অনুসারে উপাসনা করে না; তীর্থ বা হজ্জ করে না। হিন্দুও বাউল হয়, মুসলমানও বাউল হয়। তারা ঈশ্বরকে নিজের মনের মধ্যেই আবিষ্কার করে এবং তাঁকে অরূপ হিসাবে কল্পনা করে। হৃদয়ের মধ্যেই তাঁকে আবিষ্কার করে তাঁর সঙ্গে শ্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করাই তাদের সাধনা। সেই সাধনার বহিঃপ্রকাশ হল বাউল সঙ্গীত। অসীম হয়েও মানুষের স্তরে নেমে এসে মানুষের মনে তিনি স্থান নেন এই ধারণায় তারা ঈশ্বরকে ‘মনের মানুষ’ বলে। একই কারণে রজ্জব বাউল তাঁকে ‘নর-নারায়ণ’ বলতেন।

(২)

একটা কাহিনী আছে যে শিলাইদহে থাকার সময় রবীন্দ্রনাথের লালন ফকিরের সহিত ঘনিষ্ঠতা হয়। এ কাহিনী বসন্তাব্যুহ গ্রন্থে সম্বন্ধিত (মগন্থা লালন ফকির, পৃ: ১৮)। এ বিষয় শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারীর গ্রন্থে একটি বহুত্ব কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য এটা তাঁর শোনা কথা। কারণ, তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে, আর লালন ফকির দেহরক্ষা করেন ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে। কাহিনীটি সংক্ষেপে এই : একদিন রবীন্দ্রনাথ যখন শিলাইদহের কাছারি বাড়ীতে কাজ করছিলেন তখন সেউড়িয়া গ্রামের প্রজারা তাঁর কাছে দরবার করতে এসেছিল। দরবার শেষ হবার পর রবীন্দ্রনাথের নিকটে এল যে একটি বিচিত্র ধরণের সাপমুখো লাঠি নিয়ে তাঁর সম্মাননা হৈ চৈ করছে। খবর নিয়ে তিনি জানলেন এটি লালন ফকিরের লাঠি। তখন তিনি সেটা ফিরিয়ে দেবার আদেশ দিলেন। তারপর নাক তিনি লালন ফকিরকে ডেকে এনে তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতেন (শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ পৃ: ১৬৭-৬৮)।

আমার মনে হয় এই কাহিনী সম্পূর্ণ কিংবদন্তীর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এই প্রতিপাত্তের সপক্ষে কতকগুলি যুক্তি দেখানো যেতে পারে। এটা নিশ্চিত সত্য যে লালন ফকিরের মৃত্যু হয় ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে। কারণ, এ তথ্য তদানীন্তন স্থানীয় পত্রিকা ‘হিত-কারী’ হতে পাই। রবীন্দ্রনাথের ওপর ঠাকুরবাড়ীর জমিদারীর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব এসে পড়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে। ঠিক কখন হতে তিনি সে দায়িত্ব গ্রহণ করেন তা নিশ্চিত ভাবে বলা শক্ত। তবে নির্দিষ্ট একটা তারিখ পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের ইন্দিরা দেবীকে লিখিত আত্মজীবনী ১৮২০ তারিখের একটি চিঠি হতে (ছিন্নপ্রজাবলী, ৬)। তাতে তিনি নিজেকে ‘জমিদারবারু’ বলে বর্ণনা করেছেন। একেত্রে রবীন্দ্রনাথের সহিত লালন ফকিরের শিলাইদহে বাসবার সাক্ষাৎ হবার সম্ভাবনা অভ্যন্তরীণ ক্ষণ হয়ে আসে।

বিতীর্ণত, আমাদের মনে রাখতে হবে ঐ সময় লালন ফকিরের বয়স ১১৬ বৎসর হয়েছিল। বাইবেলের হিসাব অনুসারে মানুষের আয়ু ৭০ বছর। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে বলা হয়ে থাকে শত বৎসর মানুষের আয়ু হয়ে থাকে। কিন্তু এই সম্ভাব্য আয়ুর

হুই নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করেও লালন ফকির অনেক বৎসর জীবিত ছিলেন। তা সম্ভব হলেও এটা অসম্ভব করা অসঙ্গত হবে না যে তাঁর দেহ নিশ্চয় জরা ঘায়া আক্রান্ত হয়ে ছিল। এই প্রাচীন বয়সে জরাজীর্ণ দেহ নিয়ে তাঁর শিলাইদহে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সহিত দেখা করা সম্ভব ছিল বলে মনে হয় না।

তৃতীয়ত, লালন ফকিরের দরবার করতে এসে শিলাইদহে লাঠি ফেলে বাবার কাহিনীটি একেবারেই কল্লিত মনে হয়। বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের সন্তানরা তাঁর ফেলে বাওয়া লাঠি প্রথম আবিষ্কার করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবনী লেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন তিনি ১৩০৫ সালে প্রথম সপরিবারে শিলাইদহে বাস করতে আরম্ভ করেন। তার সাত আট বছর আগেই লালন ফকির দেহত্যাগ করেছেন। সুতরাং এই সময়ে তাঁর শিলাইদহের কাছারি বাড়ীতে দরবার করতে আসা সম্ভব নয়। কাজেই এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে পড়ে যে এ কাহিনী একান্তভাবে কিংবদন্তীর উপল্লভি ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

এই গ্রন্থে অল্পত্রিশটি রবীন্দ্রনাথ অধিকারী সে কথা স্বীকার করেছেন। তাঁর প্রাসঙ্গিক উক্তিটি এখানে উদ্ধৃত করে দিলেই যথেষ্ট হবে।

“রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এর পরিচয় ছিল কিনা তার বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রাচীনরা বলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এর আলাপ হয়েছিল, কিন্তু সে কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়।” (পৃ: ১২৩)

তবে একথা ঠিক যে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে থাকাকালে লালন ফকিরের রচিত বাউল সঙ্গীতের সহিত পরিচিত হয়েছিলেন। একথাও ঠিক যে বাউলদের তত্ত্ব ও তাঁর মনকে বিশেষ রকম আকৃষ্ট করেছিল। এ বিষয় তিনি তাঁর ‘রিলিজিয়ন অব ম্যান’ গ্রন্থে সন্নিহিত আলোচনা করেছেন। তাই দেখি তিনি লালন ফকিরের সঙ্গীত সংগ্রহ করেছিলেন। অতিরিক্তভাবে আরও বলা যেতে পারে যে তাঁর সাধন-জীবনে লব্ধ নিজস্ব জীবন-দেবতা তত্ত্বের সহিত বাউল তত্ত্বের সাদৃশ্য আছে। তিনি নিজেই বলেছেন, বাউল বাক্যে ‘মনের মাহুয’ বলে তিনি তাঁকেই ‘জীবন-দেবতা’ রূপে উপলব্ধি করেছেন।

(৩)

আমরা ইতিপূর্বে বাউল-সাধক-সম্প্রদায়ের কিছু বিবরণ এই প্রবন্ধের প্রথম অংশে দিয়েছি। লালন ফকির বাউল সম্প্রদায়ের শিরোমণি ছিলেন। তাঁর অগণিত শিষ্য হিন্দু, মুসলমান, উভয় সমাজেরই মাহুয ছিলেন। তাঁর সঙ্গীত গ্রামে গ্রামে মুখে মুখে ঘুরত। এখনও ঘোরে। শ্রীরামজিতকুমার সেন তাঁর যে জীবনী লিখেছেন তার নাম দিয়েছেন ‘বাউল রাজা’। সার্থক নামকরণ হয়েছে; কারণ, তিনি সত্যই বাউলদের রাজা ছিলেন।

এখন লালন ফকিরের সঙ্গীত হতে চয়ন করে তাঁর সাধনার যে উপলব্ধি হয়েছিল তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে এই প্রবন্ধ শেষ করার প্রস্তাব করি।

লালন ফকির স্বভাবতই ঈশ্বর-সচেতন মানুষ ছিলেন। জ্ঞানের পথে না গিয়ে হৃদয়ের পথে মনে নিষ্ঠা নিয়ে ঈশ্বরকে তিনি উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন ; কারণ, তাঁর ধারণায় যত পড়বে মনে তত ধাঁধা লাগবে :

আত্মরূপে কর্তা হরি, মনে নিষ্ঠা হলে
মিলবে তারি ঠিকানা।

বেদ-বেদান্ত পড়বি যত

বেড়বি তত লপ্তা (সন্দেহ)।

তিনি ‘মনের মানুষের’ সন্ধান করেছেন বাইরে, কিন্তু সেখানে তাঁকে পান নি। তাঁর ধারণা হয়েছে তাঁকে বাইরে পাওয়া যায় না, নিজের মধ্যেই পাওয়া যায় :

ক্যাপা তুই না জেনে তোর আপন পবর

যাবি কোথায় ?

আপন ঘর না বুঝে বাইরে খুঁজে

পড়বি ধাঁধায়।

তার পরের অবস্থায় লালন ফকিরের উপলব্ধি হয়েছে যে তাঁকে বাইরে খোঁজা বিফল, সেই মনের মানুষকে মনের মধ্যেই খুঁজতে হবে। অতিরিক্ত ভাবে তাঁর ধারণা হয়েছে, তাঁকে ধরা যায় না, অর্থাৎ তাঁর শরীরী প্রকাশ নেই। তাঁর উপস্থিতি অহুভব করা যায়, কিন্তু তাঁকে ধরা যায় না। তাই তিনি ঈশ্বরকে ‘অধর মানুষ’ বলে বর্ণনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে নীচে উদ্ধৃত সঙ্গীতের অংশটি দেখা যেতে পারে :

এই মানুষে দেখ চেয়ে সেই মানুষ আছে

কত যোগী ঋষি চারি যুগ ধরে বেড়াচ্ছে খুঁজে।

জলে যেমন চাঁদ দেখা যায়,

ও চাঁদ ধরতে গেলে হাতে কে পায়,

অধর মানুষ তেমনি সদাই

আছে আলেকে (অলক্ষ্যে) বসে।

তিনি যে ধরা দেন না, কারণ তিনি অরূপ, সে কথা লালন ফকির অন্তর্য এই ভাবে প্রকাশ করেছেন। তাঁর ধারণায় তিনি নিজে এবং তাঁর ‘মনের মানুষ’ একই জায়গায় অবস্থান করেন, অথচ তাঁকে ধরা যায় না :

আমি আর সে অচিন এক জন,

এ জগতে থাকি দুজন,

ফাঁক দেখি লক্ষ যোজন

গেলে ধরিতে।

তাঁকে প্রেমের স্নেহেই পেতে হয়, অন্তর্য তে তিনি ধরা দেন না। বহির্জগতে নয়,

অন্তরের মধ্যে তাঁর উপস্থিতি অনুভব করে, তাঁর সঙ্গে প্রেমের সম্বন্ধ গড়ে তুলতে হয়। সেই স্বত্বকে পেলে বাহিরে ধোঁজার প্রয়োজন হয় না :

প্রেম পাতি জাল পাতলে

তাতে অধর ধরা যায়।

রক্ত যে পায় আপন ঘরে

সে কি বাইরে খুঁজে মরে ?

না বুঝিয়া লালন ভেড়ে

দেশ-বিদেশে যায়।

এই সাধনরীতি আধ্যাত্মিক দিক হতে কঠিন হলেও অগ্র দিকে অতি সরল ; কারণ, আত্মটানিক রীতি বিবজিত। অন্তরের মধ্যে হৃদয়বৃত্তি দিয়ে তাঁকে পেতে হয়। সুতরাং এ সাধনায় উপাসনা নিস্প্রয়োজন ; তীর্থ-পর্যটনও অর্থহীন, কারণ যাকে চাই তাঁকে ত মনের মধ্যেই পাওয়া যায়। তাই লালন সঁাঠ বলছেন :

উপাসনা নাই গো তার ;

দেহের দলপ (সঙ্কান) তার

কোথা কি মিলে ?

তীর্থ-ব্রত যার জগ

এ দেহে তার সকল মিলে।

এ হেন সাধকের কাছে জ্ঞাতচেদ অর্থহীন। সাধনার বলে তিনি জ্ঞাতিভেদকে অতিক্রম করে গেছেন ; কারণ, তিনি যে ‘মনের মাহুকে’ আবিষ্কার করেছেন তিনি কোনও বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের দেবতা মন, তিনি বিশ্বমানবের। তাই তিনি বলছেন :

সবে বলে লালন ফকির

হিন্দু কি যবান ;

লালন বলে, আমার আমি

না জানি সঙ্কান।

এক ঘাটেতে আসা-যাওয়া

একই পাটনৌ দিচ্ছে থেয়া ,

তবে কেউ খায় না কারও ছোঁয়া।

ভিন্ন জল কোথায় পাস ?

লালন-চরিতের উপাদান : তথ্য ও সত্য

মুহম্মদ আবু তালিব

সহকারী অধ্যাপক,

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

তাঁর নাম লালন সাঁই বা শাহ। পিতা দরীয়ালাহ দেওয়ান, মাতা আমিনা খাতুন। জন্মস্থান যশোর জিলার বিনাইদহ মহকুমার অন্তর্গত হরিশপুর গ্রাম। গ্রামটি বর্তমানে হরিণাকুণ্ড খানা ও ডাকঘর সাধুগঞ্জের এলাকাধীন। তাঁর গুরু বা পীরের নাম সিরাজ সাঁই, প্রকাশ্য নাম শিরাজ শাহ্। ইনিও হরিশপুর গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। বাংলা ১১৭২ সালের ১লা কার্তিক, মৃতাবিক ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তাঁর জন্ম হয়, এবং শুকাত বা মৃত্যুর তারিখ ১২২৭ সালের ১লা কার্তিক, শুক্রবার, মৃতাবিক ১৭ই অক্টোবর, ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ। এই সমস্ত খবরই মিলেছে তাঁর প্রিয়তম শিষ্য এবং স্বগ্রামনিবাসী দ্বন্দ্ব মল্লিক গুরগে দুদ্দু শাহ লিখিত একটি ক্ষুদ্র কলমী পুঁথিতে (রচনা ১৩০৩ সাল, ১৮২৬ খ্রীঃ)।^১ বলা বাহুল্য, এতদিন ধরে লালনের ব্যক্তিজীবন, ধর্ম ও সময়কাল নিয়ে যে সব বাক-বিতণ্ডা চলছিল দুদ্দু শাহের পুঁথিখানি প্রাপ্তিতে তার প্রায় সকল সমস্যারই সমাধান হয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রচলিত জীবন-কাহিনীর অট উন্মোচনের সহায়ক প্রাসংগিক বিবিধ দলীল-দস্তবীজও সম্প্রতি উদ্ধৃত হয়েছে, বর্তমান নিবন্ধে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি পেশ করা যাচ্ছে।

॥ দুদ্দু শাহের বিবৃতি (লালন শাহের আত্মচরিত) ॥

একটি ক্ষুদ্র কলমী পুঁথি। সাইজ ৯৪" × ৫৪" ইঞ্চি, পয়ার ছন্দ, চরণ সংখ্যা ১৪৮।

একটি চরণ বন্দনামূলক এবং তা প্রথমেই সন্নিবিষ্ট এবং অতিরিক্ত। চরণটি নিম্নরূপ—

“মাহুব গুরু লালন সাঁই দরবেশের চরণ সহায়।”^২

এই বিবৃতি থেকে জানা যায়, লালন ১১৭২ সালের ১লা কার্তিক (= ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ) যশোর জিলার বিনাইদহ মহকুমার হরিশপুর বা হরিশপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, এবং তাঁর ইন্তিকাল হয় ১২২৭ সালের ১লা কার্তিক, শুক্রবার (= ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর)। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, তাঁর মৃত্যুর সময়ে কুঠিয়া (সমকালীন নদীয়া) থেকে ‘হিতকরী’ নামে একখানি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হ’ত তার একটি খণ্ডিত সম্পাদকীয় বিবৃতি থেকে জানা যায় যে, সে বৎসর ১৭ই অক্টোবর, শুক্রবারে তিনি ইন্তিকাল করেন। ‘হিতকরী’তে উল্লিখিত সাল সম্পর্কিত অংশটুকু খণ্ডিত থাকায় এ নিয়ে আমাদের পরবর্তী তথ্য মহলে

অনেক বাক-বিভণ্ডা চলে, পরে পত্রিকা দৃষ্টে স্থিতিস্থাপক হয় যে, উল্লিখিত তারিখ ছিল ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের শুক্রবার, মূল্যবিক বাংলা সনের ১লা কার্তিক, ১২২৭ সাল।* হুদু শাহের বিবৃতিটিতেও সুস্পষ্টভাবে—“পহেলা কার্তিক শুক্রবারের” উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। তাই “হিতকরী” উল্লিখিত দিন ও তারিখ যে বার্থ এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। বলা বাহুল্য, পূর্বোক্ত কলমী পুঁথিখানিতে ‘বারশ পঁচানব্বই বাংলা সনের’ উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু অগ্রান্ত সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ওটি পুঁথির ভ্রান্ত পাঠ। মূল পাঠ হবে ‘বার স সাতানব্বই’। কেন না, ১২২৫ সালের ১লা কার্তিক শুক্রবার নয়—বুধবার; এবং ১২২৮ সালেরও ১লা কার্তিক (১৭ই অক্টোবর) শুক্রবার নয়—শনিবার।

অতএব সাতানব্বই সালের ১লা কার্তিক এই গ্রহণযোগ্য পাঠ। এবার মূল পাঠটি করা যাক—

“এগার শো উনআশি কার্তিকের পহেলা
হরিশপুরে গ্রামে সাঁইর আগমন হৈলা।
যশোহর জেলাধীন ঝিনাইদহ কম
উক্ত মহকুমায় হরিশপুর হয়।
গোলাম কাদের হন দাদাজি তাহার
বংশ পরম্পরা বাস হরিশপুর মাঝার।
দয়ীবুয়া দেওয়ান তার আক্বাজির নাম
আমিনা খাতুন মাতা এবে প্রকাশিলাম।

বারশত ‘সাতানব্বই’ বাংলা সনেতে
পহেলা কার্তিক শুক্রবার দিবা অন্তে।
সবারে কাদারে মোর প্রাণের দয়াল
ওফাং পাইল মোদের করিয়া পাগল।”

হরিশপুর শুধুমাত্র জয়ভূমিই নয়—এখানে তাঁদের বংশ-পরম্পরায় বাস। সেখানে অতীবধিই তাঁর ও তাঁর গুরু শিরাজ শাহের অধস্তন বংশধরগণ অতি দরিদ্র অবস্থায় বসবাস করছেন। তাঁর জন্ম তারিখ সম্পর্কেও হুদু শাহের বিবৃতি থেকে নিশ্চিত হওয়া যায়। বলা বাহুল্য, হাতের একটি প্রমাণ বাইরের দশটি অস্থানানের চেয়ে নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ।

হুদু শাহ যে শুধু বারশত তাঁর জয়ভূমির ও জন্ম-মৃত্যুর সঠিক বিবৃতি দিয়েছেন তাই নয়; তিনি স্বয়ং লালনের কাছ থেকেই এ বৃত্তান্ত সংগ্রহ করেছেন। অগ্র কথায় এটি স্বয়ং লালনেরই আত্মজীবনবৃত্ত। হুদুর সমসাময়িক আবদুল ওয়ালী সাহেবও তাঁর বিবৃতির সমর্থন জানিয়েছেন। যেমন “He (Lalan) was a disciple of Shiraj Shah and

both were born at the village Harishpur, sub-division Jhenedah, District Jessore)".* লক্ষ্য করবার বিষয়, আবহুল ওয়ালী লালন-সিরাজের শুধুমাত্র বাসস্থান হিগাবে হরিশপুরের উল্লেখ করেননি, বলেছেন,—‘জয়ভূমি’। এতদ্ব্যতীত লালনের মামারও দয়গাহ যে কুষ্টিয়া শহরের অন্তরে ছেঁউড়ে নামক মৌজায় অবস্থিত, আবহুল ওয়ালী সাহেব সে কথাও উল্লেখ করেছেন। হুদু শাহের পূর্বোক্ত বিবৃতি থেকে আরও জানা যায়, হুদু নিজেকে এর লেখক হ’লেও আসলে এটি লালনেরই আত্মকথা, এবং এ কাহিনী তাঁর নিজের কানেই শোনা—তাই একে লালন শাহের আত্মচরিত্রের স্রষ্টালিপি বলা যায়, যেমন—

“আলম ডাকা গ্রামে শুকুরশাহ আশ্রমে
আরজি করিহু আমি আভব নির্জনে।
দয়াল দয়দী সাই করুণা করিয়া
কহ কিছু আত্মকথা এ দাসে দুআইয়া।
এত শুনি দয়াল সাই মোর পানে চায়
মুহু হাসি এই দাসে বাহা কিছু কয়।
বহুদিন সেই কথা রাখিহু ঢাকিয়া
সাঁইজির ছিল মানা নাহি প্রকাশিয়া।
নাহি জানি কবে আমি যাইব চাঁলিয়া
তাঁর আত্মকথা যাইবে গোপন হইয়া।
এ কারণে শেষ কালে লজি তাঁর বাণী
একান্ত বিনয়ে লিখি তাঁর জীবনী।”*

হুদু-কথিত শুকুর শাহও লালনের অগ্রতম শ্রদ্ধা শিষ্য এবং উত্তরাধিকারী। উক্ত গ্রামে তাঁদের আধ্যাত্মিক বংশধরগণ অতাপি বিত্তমান আছেন। মনে হয়, সমকালে লালন শাহের বিরুদ্ধবাদী দল তাঁর সম্পর্কে নানা সত্যমিথ্যা অপবাদ রটাইছিল, বিশেষ করে বাহু শরীয়ত পন্থী মুসলিম সম্প্রদায়ের একাংশ তাঁর অধ্যাত্মবাদী চিন্তাধারা সম্পর্কে নিতান্তই অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলো। হুদু শাহের রচনাতে, প্রকাশে না হোক, পরোক্ষভাবে তাঁর উল্লেখ আছে মনে করি। বিবেচ্যভাবে তাঁর জীবনকালে অল্পশ্রুত ধর্মীয় বাহাস-বিতর্ক সম্পর্কিত বিষয়গণের মধ্যে তাঁর আভাস বেলে। যেমন,—

“নানা দেশ হতে শেষে আসে নানা জন
তর্ক করিতে কেহ করে আগমন।
চক্কর ফকর আর মানিক মলম
কোয়বান মনিয়দ্দিন আসে কতজন।
কতজন ছিল যোর প্রকুর গোলাব
কি কব তাদের পথে হাজার সালাম।”*

বয়ঃ হুদু শাহই এ ভাবে বাহাস করতে এসে তাঁর কাছে ‘বরাত’ হন বা দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁরই ভাষায় :

“বাহাহ্ করিতে গিয়া বরাত হইল

আমি অতি অভাজন লালন সাই বিহু।”

এই ‘বরাত’ হওয়া মানে ধর্মাস্ত্রমিত হওয়া নয়, দীক্ষা গ্রহণ করা। সম্প্রতি হুদু শাহ উল্লিখিত শুক্ল শাহের উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে “ছহি আকেল নামা” শীর্ষক একখানি প্রাচীন কলমী পুঁথি উদ্ধৃত হয়েছে। পুঁথিখানিতে এই শ্রেণীর চারটি বিশেষ ‘বাহাস’ বা বিতর্ক সম্ভার বিবরণ প্রত্যক্ষকারীর অবানীতে বর্ণিত হয়েছে। অন্ততঃ এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।^৮ এখানে তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাচ্ছে।

॥ ২ ॥

॥ “অথম কাংগাল বিরচিত—

ছহি আকেল নামা ॥”

কলমী পুঁথি। প্রাচীন হস্তাক্ষর। সাইজ জবল ডিমাই, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯০। লেখকের পরিচয় নেই, শুধুমাত্র “অধীন কাংগাল” ও “অথম কাংগাল” ভণিতা আছে। এই অথম কাংগাল যিনিই হোন না কেন, তিনি তাঁর একজন অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন, তাতে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই। কাংগাল তাঁর গ্রন্থে লালনের পরিচয় স্বরূপ লিখেছেন :

“ছেউড়ে নামেতে গ্রাম কালি গঙ্গার টাটে

মহকুমা কুটিয়া সেই গ্রামের নিকটে।

ভালুকা খানার সেই শরহদ্দ জাহির

সেই গ্রামে আছে একজন দরবেশ ফকির।

ছেরাজ সাই দরবেশের ডালেক লালন শা তাঁর নাম

মূলকে বার ছন্দ গান রচনা ডামান ॥”^৯

এর পরেই বাহাসের বর্ণনা। প্রথম বাহাসটি হয় স্থানীয় হিজলী বটগ্রামের মুনশী ভোফাজ্জেল হোসেন ও তাঁর অহুসারীদের সংগে। নিতান্তই ধর্মীয় বাহাস। বাহাস হয় শরীয়ত-মারফতে নিয়ে। বাহাসে মুনশী সাহেবের পরাজয় হয়। কোড়হলের ব্যাপার এই যে, মুনশী সাহেব লালনকে যে-শরা ফকির বলে প্রমাণ করতে সচেষ্ট হন, কিন্তু লালন তাঁর প্রশ্নের এমন সব শাপিত উত্তর দেন এবং পাল্টা প্রশ্ন করেন যে, মুনশী সাহেব নিতান্তই নাজেহাল হন। উল্লেখ্য যে, লালন কুটিয়া শহরের নিকটবর্তী ছেঁউড়ে গ্রামে আস্তানা স্থাপন করে শেষ জীবন সেখানেই অতিবাহিত করেন। এ-ব্যাপারে তাঁর গুরু সিরাজ শাহের নির্দেশ ছিল বলে কথিত হয়। হুদু শাহের পূর্বোক্ত বিবৃতি থেকে জানা যায়, যৌবনকালে রাজশাহী জিলায় ‘খেতুরী’ নামক গ্রামের বিখ্যাত বৈকুণ্ঠ দেলা^{১০}

দর্শনাস্ত্রে নৌকাযোগে দেশে ফেরার পথে কঠিন বসন্তরোগে আক্রান্ত হন এবং সংগিগণ কর্তৃক ছেঁউড়ে গ্রামের প্রান্তদেশে নদীতীরে পরিত্যক্ত হন। এবং উক্ত গ্রামের মলম সর্দার ও তাঁর স্ত্রী কর্তৃক তিনি উদ্ধৃত হন।

॥ ৩ ॥

॥ প্রচলিত বিশ্বাস মতে লালন-জীবনী ও তার প্রবক্তাগণ ॥

প্রচলিত বিশ্বাস মতে, লালন জন্মগতভাবে কায়স্থ-সন্তান ছিলেন। তাঁর মায়ের নাম পদ্মাবতী ও মাতামহের নাম ভগ্ননাম এবং জন্মস্থান কুষ্টিয়া (পূর্বতন নদীয়া) জিলায় ভাঁড়ারা গ্রাম। লালন-জীবনীকার শ্রীবাস্তবকুমার পাল মনে করেন, ভাঁড়ারা গ্রামের লালনের আসল নাম ছিল লালনচন্দ্র দাস, ভাঁড়ারার ভৌমিকদের ইনি জাতি ছিলেন।^{১১} যৌবনের প্রাক্কালে ইনি কাশী বা পুরী তীর্থস্থান থেকে ফেরার পথে বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়ে পূর্বোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী ছেঁউড়ে গ্রামে পরিত্যক্ত হওয়ার পর ইনি ফুলবাড়ী গ্রাম-নিবাসী জৈনক মুসলমান ফকিরের নিকট ইসলাম ধর্মে, মতান্তরে বাউল বা ফকীরী ধর্মে, দীক্ষিত হন।

কিন্তু হুদু শাহ বলেন, হরিশপুরের দরীবুল্লাহ-নন্দন লালন উক্ত গ্রামেরই শিরাজ শাহের নিকট বয়্যাত হন এবং এই হরিশপুর গ্রামই পার্শ্ববর্তী কুলবেড়ে গ্রামের সংগে যুক্ত হয়ে কুলবেড়ে বা কুলবাড়ী-হরিশপুর নামে (ফুলবাড়ী নয়) পরিচিত হয়। অতএব ফুলবাড়ী নামটি কুলবাড়ীরই ভ্রান্ত পাঠ। তা হলে দেখা যাচ্ছে, হুদু শাহ ও বসন্ত বাবু উভয়েই লালনকে শিরাজ শাহের শিষ্য বলেছেন, তবে বসন্তবাবুর মতে, লালন কায়স্থ-সন্তান! কিন্তু তিনি কি সত্যি সত্যিই কায়স্থ-সন্তান? এ-সম্পর্কে একটি কৌতূহলজনক ঘটনার বিবৃতি দিয়েছেন হুদু শাহ। ঘটনাটি নিম্নরূপ:

লালন নবদ্বীপে ভ্রমণকালীন জৈনক বিধবা কায়স্থ-রমণীর বাড়ীতে আশ্রয় লাভ করেন। তাঁর নাম পদ্মাবতী। খুব সম্ভবত রমণীকে লালন মাতৃ-সম্বোধন করতেন। তাঁর আশ্রয়ে বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন। হুদুর ভাষায়:

পদ্মাবতী নামে এক বিধবা রমণী।

নিজাবাসে নিয়ে গেল দেই ক্ষত্রধনী ॥

মনে হয়, কিংবদন্তী আকারে এই কাহিনী বিস্তৃত হয়, ফলে লালন ও পদ্মাবতীর সন্তান রূপে পরিচিত করে তা হ'লে কি বসন্তবাবুর বিবৃতি ভুল? না তাও ঠিক নয়। বসন্তবাবুর তথ্য কিংবদন্তীভিত্তিক। নানা জনশ্রুতি, ব্যক্তিগত বিবৃতি ও স্মৃতি-কথা মিলিয়ে তিনি তাঁর কাহিনী নির্মাণ করেছেন।

তাঁর পদ্মাবতী-লালন কাহিনীরও একটি সমাধান মিলছে আলোচ্য হুদু শাহের বিবৃতি মারফত। আগেই বলা হয়েছে, ভাঁড়ারার নয়—নবদ্বীপে উদ্দেশ্যহীন ভাবে

ভ্রমণকালীন লালন এক কারুস্থ-বিধবা রমণীর নিকট আশ্রয় লাভ করেন। এই রমণীর নামও ছিল ‘পদ্মাবতী’। দুদ্দু পদ্মাবতীর বিস্তারিত পরিচয় দেন নি। তবে তিনি স্পষ্টই বলেছেন, বেশ কিছুদিন পদ্মাবতীর গৃহে তিনি অবস্থান করেন। তখন লালন সবে মাত্র ঐশোর কাল অতিক্রম করেছিলেন। কিয়দশী মতে, লালন পদ্মাবতীকে ধর্মযাতার আশ্রয় দিয়েছিলেন। জীবনের শেষাবধি এই মহিলাব সংগে তাঁর ধর্মসম্পর্ক বজায় ছিল। খুব সত্য পরবর্তীকালে লোকমুখে প্রচলিত হওয়ার কাহিনীটি রূপান্তর লাভ করে বসন্ত বাবু হস্তগত হয় এবং সুধীমহলে লালনের আসল কাহিনীরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বিখ্যাত গবেষক ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এবং কেতাহুসন্ধানে গিয়ে বসন্তবাবু প্রমুখের বর্ণিত কাহিনীর কোন প্রামাণ্য বিবরণী সংগ্রহ করতে পারেন নি। তিনি তাই স্পষ্টই বলেছেন—“লালনের জীবন বৃত্তান্ত সম্বন্ধে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা যায় না। আমি কয়েক বছর চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে যে সমস্ত বিভিন্ন কথা শোনা যায় তাহা প্রায়ই জনশ্রুতি। তাহাদের সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য হিসেবে নিঃসংশয়ে কিছু বলা যায় না।”^{১৭} দুঃখের বিষয়, ভাঁড়ারার মত হরিশপুরে গিয়ে লালন সম্পর্কে তথ্যাহুসন্ধানের সুযোগ তাঁর হয় নি, ফলে হরিশপুর সম্পর্কিত কথা-কিংবদন্তীর মধ্য থেকে প্রাপ্ত লালন-জীবনীর সভ্যাসত্য নির্ণয়ের সুযোগ থেকে তিনি বঞ্চিত হ’য়েছেন। অল্পরূপভাবে বঞ্চিত হ’য়েছেন বসন্তকুমার পালও। বর্তমান নিবন্ধকারের নিকট লিখিত একটি পত্রে বসন্তকুমার বাবু একটা স্বীকারও করেছেন যে, পূর্বোক্ত দুদ্দু শাহ বা আবদুল ওয়ালীর পূর্ব লিখিত ও প্রকাশিত বিবৃতির কথা তিনি ইতিপূর্বে জানতে পারেন নি, বা কোথায়ও দেখেনও নি। তবে তিনি লালনের সফল শিষ্য তোলাই শাহ ও ভাংরী ফকিরগণের নিকট অনেক কাহিনী শুনেছেন এবং তাঁদের কাছ থেকে যা জেনেছেন তাকে প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করেছেন এবং ‘মহাত্মা লালন ফকির’ গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন (১৯৫৪)। এ মত অবস্থায় তাঁদের বর্ণিত কাহিনীকে কি ভাবে প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করা যায়?

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে, সম্প্রতি কুষ্টিয়া কাছারীর মহাকাজ পানাত থেকে একটি প্রাচীন পর্টার জনৈক আনন্দ শাহের পুত্র লালন শাহের নামও পরিচয় উদ্ধৃত হ’য়েছে। ইনিও ভাঁড়ারা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। অধিকর্তাগণ তাই মনে করেছেন, খুব সম্ভব, ইনিই বসন্তবাবু-বর্ণিত আসল লালন শাহ। কিন্তু মুশকিল হ’য়েছে এই যে, ইনি ‘মুসলিম সন্তান’^{১৮} আর বসন্ত বাবুর মতে লালন ‘কারুস্থ-সন্তান’। তা হ’লে আনন্দ-নন্দন লালন শাহ আবার কে? বলা বাহুল্য, পূর্ব-বর্ণিত লালন-জীবন-কাহিনী, বা প্রামাণ্য দলীল পত্রের মারফত উদ্ধৃত হ’য়েছে তাঁর প্রেক্ষিতে ভাঁড়ারার এক অজ্ঞাত-কুলশীল ব্যক্তিক আসল লালনের স্থানে কিছুতেই বসানো যেতে পারে না। এবং বলা বাহুল্য, কালের দিক দিবেও ইনি লালনের অনেক পরবর্তী। তাই সাধক-কবি লালন একজনই, তাঁর জন্মস্থান হরিশপুরে এবং কর্মস্থান ছেঁ উড়ে, এ-বিষয়ে দ্বিধতের অবকাশ নেই।

। ৪ ।

॥ আক্কেল নামার কাহিনী ॥

এবার “ছহী আক্কেল নামা” অবলম্বনে লালনের জীবন কাহিনীর একটি বিশেষ অধ্যায়ের সন্ধান দেওয়ার চেষ্টা করা যাচ্ছে। বলা হয়েছে লালনের নাম তখন এত বেশী পরিচিত ছিল যে, সিরাজ শাহের শিষ্য এবং ছেঁউড়ের লালন শাহ বললে সকলেই এক ডাকে চিনতে পারত। ‘আক্কেল নামা’ লেখকও তাই এক কথায় পরিচয় দিয়েছেন—“সিরাজ শাহ দরবেশের তালেব লালন শাহ তার নাম।” সুফী পরিভাষায় ‘তালেব’ অর্থ শিষ্য, মুরীদ। আর প্রত্যক্ষদর্শীর বিবৃতি হওয়ায় লালন-জীবনীর প্রামাণ্য উপাদান হিসেবে হুদ্দ শাহের বিবরণীর পরেই অধম কাংগালের এই বিবৃতির স্থান দেওয়া যেতে পারে। কাহিনীটি হুদ্দ শাহ বর্ণিত কাহিনীরও সমর্থন করেছে। যেমন, চড়েইকোন গ্রামে লালন সঞ্জে তোফাজ্জেল হোসেন মুন্সী ও তাঁর অহুচরদের সঙ্গে এক বাহাছ অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলে কাংগাল উল্লেখ করেছেন। এই বাহাছটির উল্লেখ কবি জসিমউদ্দীনের একটি প্রবন্ধেও আছে। হুদ্দ শাহও বলেছেন, তিনি নিজেরও এবং মনিরউদ্দীন শাহ সহ অনেকেই তাঁর সঙ্গে তর্ক করে পরাজিত হয়ে তাঁর মতে দীক্ষিত হন ইত্যাদি। “আক্কেলনামা”^৩ কার তাঁর গ্রন্থে চারটি বিশেষ বাহাছের কাহিনী প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বাহাসের স্থান, বাহাছকারিদের নাম, ঠিকানা এবং বিশেষ বিবরণীও প্রদান করেছেন। অহুসঙ্কিস্থ ব্যক্তিগণ তাঁদের উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে এ সম্পর্কে বিশেষ বিবরণী উদ্ধার করতে পারেন, ও তাঁর সত্য মিথ্যা যাচাই করেও দেখতে পারেন। বর্তমান নিবন্ধকারও ব্যক্তিগতভাবে এসব বিষয়ে যাচাই করার চেষ্টা করেছেন, এবং সপক্ষে সত্য সাক্ষ্যও লাভ করেছেন। এখানে স্থগী-সমাজের অবগতির জ্ঞান উক্ত গ্রন্থ থেকে অংশ বিশেষ তুলে দেওয়া যাচ্ছে—

লালন শাহ ককির কহে মুন্সী বরাবর
ছোস্তালের জোয়াব তুমি দেহতো আমার।
পহেলা শরিয়ত সিড়ি বলিয়াছ তুমি
একে একে তাহা সব দ্বিজ্ঞান সব আমি।
শরিয়ত ঘরের সিড়ি ঘর মারুফত
সখ নাহি আমার তাতে কহলাম নেহাত।
চড়িয়া সিড়ির পরে বাড়ি যদি থাকি
না হৈটে কেমনে ঘরে বাই বল দেখি।
শরিয়ত হইলে হাচেন মারুফতে যাবো
হইল কি না হইল প্রমাণ কিসে পাবো।
শাহের কল কাঁচা পাকা রকমে দায় চেনা

কাঁচার বেয়ং থাকে পাকিলে থাকে না।
 কাজে কাজে এই মতো আছায় লক্ষণ
 বেরূপ সাধকের বেলা সিদ্ধির নয় তেমন।
 কি নিশান দেখিলে বুঝি সরিয়ত হাছেল
 খোলাছা করিয়া তাহা কহতো ফাজেল।
 আন্দাজী না কহিও বাত কহ হাদিছ মতে
 কবে হবে সরা হাছেন যাবে মারুফতে।^{১৪}

লক্ষ্যযোগ্য বিষয় এই যে, বাহাসে লালন নির্ভেকে সম্প্রতিভাবে বা-শরা বা শরীয়ত পন্থী মুসলিম ফকির বলে দাবী করেছেন এবং প্রতিক্ষন্দী মুনশী সাহেবকেও ‘আন্দাজী’ কথানা বলে ‘কুরআন হাদিস’ অল্পস্বায়ে যুক্তিতর্ক প্রয়োগ করতে অস্বীকার করেছেন। পক্ষান্তরে, বাহাসকারী মুনশী তোফাজ্জল হোসেন সাহেব তাঁকে বে-শরা ফকীর বলে প্রমাণ করবার চেষ্টা করে বার্থ হয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, “আক্কেল নামা” লেখক লালন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আরও একটি বিশেষ মূল্যবান তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন তা এই যে, সমকালীন লালন-বিষেয়িগণ লালন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অপরিকল্পিতভাবে নানা অপবাদ রটাতো। শুধু তাই নয়—এ সম্পর্কে কতিপয় পুঁথিপত্রও প্রকাশিত হয়েছিল। এই পুঁথি পত্রের মধ্যে “জালালাতোল ফোকরা” নামক একখানি ছাপা পুঁথির উল্লেখ করে লেখক মন্তব্য করেছেন—

হাদিচের কণ্ডল বাহা লিপিলাম তাই।
 ছাদেক নছরদির মতো না বুঝিও ভাই।
 কিবা বুজ বুঝিল ভাই ছাদেক নছরদি।
 না মেলে তুলনা তার বারো ভাটির মদি।
 আল্লা করে এমন বুজ কার নাহি হয়।
 এমন বুদ্ধির লোক আখের ঠেকিবে সে দায়।
 ফকির বেশে কোন বোঘেটে কোথা হইতে আইল।
 ছাদেক নছরদির ভাগ্যে দর্শন পাইল।
 তাহাদের বাটীর কিবা অস্ত্র বাটীর মাঝে।
 মন বুঝিতে জায়ে কিবা কি করিল পাছে।
 ঐ জানে আর সেই জানে আর জানে সেই মাগি।
 আর জানে সেই উপর হাকিম সর্ব ঠাই আর আঁখি।
 ছাছা কিবা মিছা তাহা আর কেহ না জানি।
 পুঁথি লিখে জাহের ঐ করিল তাহাই মুনি।
 পাগলা পাগলির খেলা কেইছা ডারে দেখাইল।

দেখিয়া সে ভাল বাহুব বেজার হইল ।
 বেতখ ঘটনা সে জে দেখিল এমন ।
 গোপ্তে কেন তারে নাহি করিল শাসন ।
 উদখ্যাদার মত শোশে খেয়ে বুদ্ধির মাথা ।
 তামাম ফকির দুশে বাদিল কবিতা ।
 রিজিষ্টারি যোহর ছাপা করিল তার পরে ।
 জানাইতে মনে হুদু সহর নগরে ।
 পরমার্থে হাত দিয়াছে খুট যদি কেউ জানে ।
 মহর ছাপাইল তার বিশেষ কারণে ।
 অন অধিকার প্রবেশ করি খাইয়াছে সে মধু ।
 ভাল ভেজেছে ফুল ছিঁড়েছে এই করে কি সাধু ।
 ইহাই ভাবিয়া শেষে বেজায় খাপিল ।
 কাষড়াইল কার তার দিশে না করিল ॥

এর উপর মন্তব্য নিম্নয়োজন ।

॥ “জালালতুল ফোকা” ও অস্ফাফ প্রসঙ্গ ॥

“জালালতুল ফোকা” মূলী ছাদেক আলি ও মূলী নছরদী কর্তৃক রচিত । পুঁথিখানি
 দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয় নি । উক্ত পুঁথিতে লালনশাহী ফকির সম্প্রদায়ের আচার
 আচরণের যে সব বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে “সহী আক্কেল নাবা”র তার প্রতিবাদ করা
 হয়েছে । লেখকের ভাষার ‘বেতখ’ বা ‘বেতখা’ ঘটনা অর্থাৎ অবস্থিতি ও নিভাস্তই অজ্ঞতা-
 প্রসূত । পরবর্তীকালে লিখিত ‘বাউল ধংস ফতওয়া’ নামক পুস্তিকাতেও এরূপ কিছু
 কিছু জুগুপ্সিত চিত্র উল্লেখটনের চেষ্টা করা হয়েছে । আবদুল ওয়ালী সাহেবের পূর্বোক্ত
 প্রবন্ধেও জনৈক কারামতুল্লাহ শাহ লিখিত “মনোরঞ্জন উচিত কথা” শীর্ষক এই ধরনের আরও
 একখানি গ্রন্থের উল্লেখ করা হয়েছে । দুঃখের বিষয়, শেষোক্ত গ্রন্থখানিও আমাদের দেখবার
 সৌভাগ্য হয় নি । তবে “বাউল ধংস ফতওয়া” ও সেই গ্রন্থে উল্লিখিত হিন্দুস্তান-নিবাসী
 আর্ব শাহী দয়ানন্দ সরস্বতীজীর “সত্যার্থ প্রকাশ” গ্রন্থ দু-খানি দেখবার সৌভাগ্য আমাদের
 হয়েছে । ফলে, সত্যের অহুরোধে বলতে হ’লে যে, উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতাগণও নিভাস্তই
 অন্ধ বিশ্বাস এবং একটি পূর্বনির্ধারিত ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হ’য়ে এ-সব উক্তি করেছেন ।
 অবশ্য শাহী দয়ানন্দের গ্রন্থে বর্ণিত অনাচারী তাত্ত্বিক সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে বাউলার
 তথাকথিত বাউল সম্প্রদায় তথা লালন শাহী ফকির সম্প্রদায় পড়ে কিনা, তা বীর স্থির চিত্তে

বিচার করে দেখতে হবে। কেননা, তিনি তাঁর গ্রন্থে বাউলা দেশের সম্প্রদায় সমূহের নাম ত্যাগ করেনই নি, উপরন্তু তাঁর গ্রন্থ মুসলিম ফকির সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে লেখাও নয়।^{১০}

বস্তুত: লালন শাহ ও তাঁর সম্প্রদায়কে বুঝতে গেলে “হুদা আক্কেল নামায়” বর্ণিত গ্রন্থ কিতাবগুলি বিশেষভাবে পড়া দরকার, কেননা এ যাবৎ লালন ফকীরকে সাধারণভাবে তথাকথিত বাউল ফকীরদের সঙ্গে একত্র করে বুঝবার চেষ্টা করা হয়েছে। অথচ লালনের মৃত্যুকালীন ‘হিতকরী’ পত্রিকায় যে মন্তব্য করা হয়, তাতে স্পষ্টভাবেই লালন সম্প্রদায়কে তথাকথিত বাউল সম্প্রদায় থেকে আলাদা করে দেখা হয়েছে, যথা—“সম্প্রতি সাধু সেবা বলিয়া এই মতের নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি হইয়াছে। সাধু সেবা হইতে লালনের শিষ্যগণের না হউক নিজের মত অনেকাংশে ভিন্ন ছিল। সাধুসেবার ও বাউলের দলের যে কলক দেখিতে পাই, লালনের সম্প্রদায়ে সে প্রকার কিছু নাই, আমরা বিশ্বস্তহুজে জানিয়াছি সাধু সেবার অনেক দুই লোক যোগ দিয়া কেবল জীলোকদিগের সহিত কুৎসিত কার্যে লিপ্ত হয় এবং তাহাই তাহাদের উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। মতে মূলে তাহার সহিত ঐক্য থাকিলেও এ সম্প্রদায়ের তাদৃশ ব্যাভিচার নাই। পরদার ইহাদের পক্ষে মহাপাপ।”^{১১} এখানে বাউল, সাধুসেবা এবং লালন সম্প্রদায়কে আলাদাভাবে বিচার করা হইয়াছে। আরও কৌতূহলের ব্যাপার এই যে, হিতকরীর এই বিবৃতির অপব্যাখ্যা করেছেন বিখ্যাত-বাউল তত্ত্ববিদ ডক্টর শ্রীউপেন্দ্র নাথ গুপ্তাচার্য। হিতকরীর বিবৃতিটিকে ভিত্তি করে তিনি লিখেছেন—“হিতকরী পত্রিকায় লালনের যে মৃত্যু সংবাদ এবং তাঁহার সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে আছে যে, সাধু সেবা নামে লালনের শিষ্য ও তাঁহার সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাভিচার চলে এবং অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ইন্দ্రిয় সেবার রত থাকে বলিয়া তাহাদের সন্তানাদি হয় না।”^{১২} এই উক্তি সত্যের অপলাপ মাত্র। লালন বিবাহিত ছিলেন। তবে তাঁর কোন সন্তানাদি হয় নি। ছেঁউড়ের দরগাহ চত্বরে লালনের কবরের পাশেই লালনের জী মতিবিবির কবর আছে। আবহুল ওয়ালী সাহেবও লালনকে বিবাহিত বলে উল্লেখ করেছিলেন। কবি জসীমউদ্দীন সাহেবের মতে, লালনের জীর নাম ‘বিশোকা’, তিনি জমীর খোনকারের কন্যা ছিলেন।^{১৩} মতান্তরে, মতিবিবি তাঁর দ্বিতীয় জীর নাম। উভয়েই নিঃসন্তান। অবস্থায় ইতিকাল করেন।

॥ ৬ ॥

॥ পাট্টা ও কবুলিয়ত দলীল প্রসঙ্গ ॥

সম্প্রতি লালন কর্তৃক সম্পাদিত অমিহমা সংক্রান্ত দু’টি পাট্টা ও দু’টি কবুলিয়ত দলীল বখাক্কে লালনের উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে ও যশোর রেজিষ্ট্রী অফিস লাইব্রেরী থেকে নিবন্ধকার কর্তৃক উদ্ধৃত হয়েছে।^{১৪} সেগুলি সমকালীন শৈলকূপা সাব রেজিষ্ট্রারী অফিস থেকে রেজিস্ট্রীকৃত হয় বখাক্কে ১২৮৭ ও ১২৮৮ সালে (১৮৮১ সালের ১২ জাহারারী ও

১৮৮২ সালের ২৮শে জ'ম্মুয়াবী) সম্পাদিত হয়। তখন শৈলকুপার সাবরেজিষ্টার ছিলেন জনাব হামিদ উদ্দীন মুহম্মদ। দলীলগুলি থেকে জানা যায়, স্থানীয় ভক্ত কতকগুলির নিকটস্থ রামচন্দ্রপুরের অন্তর্গত মোক্ষে পরমানন্দপুরে একটি আখড়া বা আস্তানা প্রতিষ্ঠাকালে এই জমী খরিদকৃত হয়। লালন উভয় জমীরই অধিকৃত কবুলিয়ত লিখে দেন। দলীলে লালন নিজেকে 'মৃত সেরাজ সাই'-এর পুত্র এবং 'জাতীয় মুসলমান' বলে উল্লেখ করেছেন। পাট্টা দলীলে জমীর মালিক প্রাণনাথ সাহা, প্যাঁ হরচন্দ্র সাহা ও বৈজনাথ সাহা প্যাঁ উমাচরণ সাহা, সাকীন ফুলহরির উল্লেখসহ মালিকের দস্তখত আছে। কবুলিয়তেও লালন সাই-এর পরিচয়, সাকীন ছেঁউড়ে, জাতি মুসলমান ইত্যাদির উল্লেখ আছে। তদুপরি লালনের নিজের হাতের দস্তখত আছে। এতদ্ব্যতীত তাঁর কয়েকটি হিন্দী ও উর্দু গানও সম্প্রতি উদ্ধৃত হয়েছে। তাই এতদিন যে তাঁকে নিরক্ষর লোককবি মনে করা হ'ত, বর্তমান সাক্ষ্য প্রমাণে তা অসত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে। কবুলিয়ত দুটিতে লালন অস্তুতঃ দশটি দস্তখত করেছেন। লক্ষ্য করবার বিষয়, এই যে, লালন নিজেকে মৃত সেরাজ সাই-এর পুত্র বলে উল্লেখ করেছেন। বলা হ'য়েছে, সিরাজ ছিলেন লালনের আধ্যাত্মিক পিতা বা গুরু, অবশ্য তিনি তাঁর পালক পিতাও বটে। আগেই বলা হয়েছে, শিগ্ধ্য হুদু শাহের কাছে তিনি যে পরিচয় বিবৃত করেন, তাতে পিতা ও মাতার নাম ছিল যথাক্রমে দরৌল্লাহ দেওয়ান ও আমিনা খাতুন। দাদার নাম গোলাম কাদির। হরিশপুর গ্রামে তাঁদের নামে ভিটা ও স্মৃতি-চিহ্নাদি বিদ্যমান রয়েছে। প্রসঙ্গগত উল্লেখ্য যে, আধ্যাত্মবাদী ফকীরদের কাছে, গুরু পীরের পরিচয়ই প্রধান, ব্যক্তি-পরিচয় তাঁদের কাছে নিতান্তই তুচ্ছ। লালনের গানে সিরাজ শাহের নাম পীর বা গুরু হিসেবেই উল্লেখ করা হয়েছে। উভয় দলীলেই সাব-রেজিষ্টার হামিদ উদ্দীন মুহম্মদের দস্তখত আছে। আরও উল্লেখ্য যে, দলীল-দাতা দলীলে লালনকে বিশেষ "মাষ্টান ও সম্মান্য মহাশয় বিদ্যার অতি কোন নিরীক পাটা" লিখে দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করেছেন। তাই বলতে দোষ নেই, সমকালে লালন নিতান্তই সম্মানী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। স্ব-সমাজেও তিনি সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে যে পরিচিত ছিলেন তার প্রমাণও মিলেছে পূর্বোক্ত 'সহী আক্কল নামা' গ্রন্থে বর্ণিত 'বাহান' বা বিতর্ক সভা সংক্রান্ত বিবরণীতে। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য দলীলে সিরাজ শাহকে পিতা বলে উল্লেখ করার কেউ কেউ এমনও মন্তব্য করেছেন যে, লালন যদি দরৌল্লাহ দেওয়ানের পুত্রই হবেন, তা হলে তিনি নিজেকে সিরাজ শাহের পুত্র বলে পরিচয় দেবেন কেন? কেন দিয়েছেন, তা বলা মুশকিল, তবে ইনি যে সিরাজ শাহের শিগ্ধ্য এবং পালিত পুত্র, এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই; এবং হুদু শাহ নিজের মুখে বলা কাহিনী শুনেই তাঁর জীবনকাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন।

। ৭ ।

॥ ‘বাউল ধ্বংস ফতওয়া’ ও ‘সত্যার্থ প্রকাশ’ ॥

লালনের ইতিকালের বহু পরে লালন সম্প্রদায় তথা বাউল সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে রংপুর জিলার অধর্গত সৈয়দপুরের মওলানা রিয়াজ উদ্দৌনের নেতৃত্বে ‘বাউল ধ্বংস ফতওয়া’ জারী করা হয়। এই ফতওয়া পুস্তিকায় মুসলিম সম্প্রদায়-ভুক্ত তথাকথিত বাউল ফকীরদের নানা জুগুপ্সিত আচার-আচরণের অভিযোগ উত্থাপিত হয় ও তদনুসারে তাঁদেরকে ইসলাম ধর্মচ্যুত (কাকের) বলে অভিযুক্ত প্রকাশ করা হয়।^{১*} প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই ফতওয়ায় সম্প্রষ্টভাবে লালন শাহ ও তাঁর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগও আনীত হয় এবং সেই অভিযোগের দলীল হিসেবে আর্থাবর্তের (ভারত রাষ্ট্রের) বিখ্যাত আর্থ—স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর বিখ্যাত ‘সত্যার্থ প্রকাশ’ গ্রন্থের বরাতে দিয়ে ‘বাম মার্গী’, ‘বীজ মার্গী’, ‘চুনি মার্গী’, ‘আপাশহী’, ‘অবোদী’, ইত্যাদি লোকায়ত সাধক সম্প্রদায়ের নানা অনাচারের দৃষ্টান্ত পেশ করে বাউলার বাউলদেরকেও সেই শ্রেণীভুক্ত করা হয়। কিন্তু কৌতূহলের বিষয় এই যে, স্বামীজীর উক্ত গ্রন্থের কুজাপি লালন ফকীর বা বাউলার তথাকথিত বাউল সম্প্রদায়ের উল্লেখ না থাকায় ফতওয়াকানের উক্ত অভিযোগসমূহের ভিত্তিতে বাংলাদেশের লালন সম্প্রদায় তো দূরের কথা, বাউল সম্প্রদায়ের কোন শাখারই বিচারের প্রশ্নই ওঠে না। অবশ্য সাধারণ অর্থে ‘বাউলকে (বাতুল ?) উদাসীন, অশাস্ত্রীয় ও ব্রাত্যশ্রেণীভুক্ত করা হলেও এঁরা প্রকৃতপক্ষে অনাচারী উদাসীন মাজনন, এঁরা কোন না কোন ধর্মপথের অনুসারী। অবশ্য এর ব্যতিক্রম যে নেই, তা নয়। হালে এরা নানা শ্রেণীভুক্ত—যাদের মধ্যে নিষ্ঠাবান মুসলমান যেমন আছেন, তেমনি নিষ্ঠাবান হিন্দু, বৈষ্ণব মতের সাধকও আছেন। এতদ্ব্যতীত অনাচারী নাড়ার ফকীর বা কদাচারী বাউল ফকীরও কিছু কিছু আছে। সাধারণ্যে তারা ‘নাড়ার ফকির’, ‘বে-শরা ফকির’ নামে পরিচিত। বাউল ধ্বংস ফতওয়ায় সেই অনাচারী ফকীরদের প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে বলে মনে হয়। বলা বাহুল্য, ফতওয়া রচনার বহু আগেই লালনের ইতিকাল হয়েছিল, এমন কি লালন-শিষ্য ছদ্ম-গানজুও জীবিত ছিলেন না।

। ৮ ।

॥ ‘ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়’ ও অক্ষয়কুমার দত্ত প্রসঙ্গে ॥

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাউল সম্প্রদায় সম্পর্কে আমাদের সুধীমহলে সাধারণভাবে একটি বিরাগ মনোভাব বহুদিন ধরে চলে আসছে। যার মূলে অক্ষয়কুমার দত্তের “ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়” আছে বলে অনেকে মনে করেন। দত্ত মহাশয় তাঁর গ্রন্থের বিবরণ কিতাবে এবং কোথা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন, জানা নেই, তবে মনে হয়, পূর্ব-উল্লিখিত “বাউল ধ্বংস ফতওয়া” কার-মওলানা রিয়াজউদ্দিন সাহেবের মত তিনিও কিছু

কিছু বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। এখানে কর্তাভজা সম্প্রদায় সম্পর্কে অক্ষয় দত্তের প্রাক্তিমূলক ধারণা সম্পর্কে উনিশ শতকের প্রত্যক্ষদর্শীর একটি বিবৃতি উল্লেখ করা যাচ্ছে। ঘটনাটি বিবৃতি করেছেন প্রসিদ্ধ কবিনবীনচন্দ্র সেন তাঁর আত্মজীবনীতে। যথা, “মেলা ভাঙ্গার পর আমি কি কারণে কলিকাতা যাইতেছি, কাঁচড়াপাড়ায় গাড়ীতে উঠিয়া দেখি—গাড়ীর কক্ষ উজ্জল করিয়া শশিষ্য রবিঠাকুর। উভয়ে উভয়কে একরূপ আচরণে দেখিয়া উভয়ে বিস্মিত। তিনি বলিলেন, “আপনি কোথা হইতে?” আমি বলিলাম, “আপনি কোথা হইতে?” তিনি বলিলেন, তিনি তাঁহার জমিদারি হইতে। আমি বলিলাম, আমি আমার জমিদারি হইতে।

তিনি। জমিদারিটি আবার কি?

আমি। ঘোষপাড়ার কর্তা ভজাদের মেলার অধাক্ষগিরি।

তিনি। কর্তাভজাদের মেলা। শুনিয়াছি উহা বড় জঘন্য বাপার।

আমি। অক্ষয়কুমার দত্তের উপাসক সম্প্রদায় পড়িয়া আমারও সেই বিশ্বাস হইয়াছিল। কিন্তু তিনদিন মেলার অধাক্ষগিরি করিলাম, কই জ-ঘ-জ্ঞ, তিন অক্ষরের একটিও দেখিলাম না। ব্রাহ্ম অক্ষয়কুমার দত্ত হিন্দু ধর্মের প্রতি মিশনারির অধিক বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়াছেন।

তিনি তখন বড় আগ্রহের সহিত মেলার বৃত্তান্ত শুনিতে চাহিলেন। আমিও বাহা দেখিয়াছিলাম ও শুনিয়াছিলাম, তাহা পুংখাহুপুংখরূপে বর্ণনা করিলাম। এই বর্ণনার তাঁহারও যেন চক্ষু খুলিয়া গেল। তিনি বলিলেন—“আমার একটি প্রার্থনা। আপনি আমাকে বাহা বলিলেন, যদি তাহা এতটুকু ক্রেশ স্বীকার করিয়া ‘সাধনা’র জগু লিখিয়া দেন, তবে আমার মত অনেকেরই একটা বিষয় ভ্রম ঘুচিবে।”^{১১} উল্লেখ্য যে, এই কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সঙ্গে লালনের যোগাযোগ ছিল বা তিনি তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন, সম্প্রতি এরূপ প্রমাণ আবিষ্কৃত হ’য়েছে।^{১২}

। ২ ।

॥ সমকালীন সূফী সমাজে লালনের প্রভাব ॥

কালের দিক দিয়ে লালন ছিলেন উনিশ শতকের যুগ-প্রবর্তক মনীষী মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়েব সনসাময়িক (১৭৭২-১৮২০ খ্রি:)। উল্লেখ্য যে, এঁরা উভয়েই একই বৎসরে মাত্র ৫৬ বাসের ব্যবধানে জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে রামমোহন ছিলেন লালনের অগ্রজ। সমকালীন বাঙলাদেশে ও বাঙালী সমাজে যে নবযুগের সূচনা ঘটে, তাঁর অগ্রপথিক তুর্নবাদিক হিসেবে পরিচিত ছিলেন রাজা রামমোহন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তিনি ‘ভারত-পথিক’। অর্থাৎ শুধু বাংলাদেশের বা বাঙালী সমাজের নয়—তিনি ছিলেন সমগ্র

ভারতবর্ষেরই যুগ-প্রবর্তক মনীষী। বর্তমান ভারতীয় ওখা হিন্দু সভ্যতারও যুগনায়ক তিনিই। বলতে কি, রামমোহনই সনাতন আচার-সর্বস্ব বহু-দেববাদী পৌত্তলিক ভারত-বর্ষকে একেশ্বরবাদী মানবধর্মের বাঁধনে বাঁধতে সচেষ্ট হন। এই নব ধর্মমত প্রচারের নিমিত্ত তিনি আরবী ও ফারসী ভাষাতে “তুহ্‌ফাত-উল-মুয়াহ্‌দীন” বা একেশ্বর-বিশ্বাসীদের প্রতি উপহার নামে যে যুগান্তকারী পুস্তিকাখানি রচনাও প্রকাশিত করেন (১৮০৩) তদ্বারা তাঁর মনোবিকাশের ধারা সম্পর্কে স্থলর পরিচয় লাভ করা যায়।^{১৩} কিন্তু কৌতূহলের বিষয় ‘তুহ্‌ফাত’ গ্রন্থে প্রচারিত ভাবধারার সঙ্গে লালনশাহী সূফী চিন্তাধারার আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। শুধু তাই নয়, রামমোহনের গ্রন্থখানির পাশে লালন-গীতি ও লালনের জীবন-দর্শনের পরিচিতিমূলক গ্রন্থ রেখে বিচার করলে একজন সাধারণ পাঠকও আশ্চর্য হয়ে ভাববেন, দুই বিপরীত ধর্মাত্মসারী এবং আপাতবিরোধী যুগপথিকের চিন্তাধারার কি আশ্চর্য সাদৃশ্য, কি গভীর মিল। বলা বাহুল্য, রামমোহনের ‘তুহ্‌ফাত’ গ্রন্থের বিষয়বস্তু নয় শুধু, তাঁর চিন্তাধারা, এমন কি বর্ণনা-ভঙ্গীরও আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে লালনের চিন্তা-ধারার সঙ্গে। মাঝে মাঝে তাঁর বর্ণনা এত কাছাকাছি যে, একটিকে অপরটির তরজমা বা অঙ্গীকার বলেও ভুল হওয়া অসম্ভাবিক নয়।

অবশ্য রামমোহন পাশ্চাত্যশিক্ষা-সভ্যতার অন্তরাগী হ’লেও প্রাচ্য সূফী-সাহিত্যের, বিশেষ করে হাফিজ সাদীর কাব্য-কাননেরও একজন উন্নত মধুপ ছিলেন। হাফিজ ও সাদী রুমী প্রভৃতি সূফী সাধকের রচনা লালনের অতি প্রিয় ছিল। এই দিক দিয়ে লালন শাহীর সঙ্গীত ও লালন-দর্শনের সঙ্গে তাঁর চিন্তাধারার ঐক্য থাকা নিতান্তই স্বাভাবিক। তাই ‘তুহ্‌ফাত-উল মুয়াহ্‌দীন’ গ্রন্থের সঙ্গে লালন গীতির সাদৃশ্য নিতান্তই আকস্মিক ঘটনা বলে মেনে নেওয়া যায় না। সত্যি কথা বলতে কি, উভয়ের রচনা পাশাপাশি রেখে পাঠ করলে এরূপ গভীর প্রভীতি জন্মে যে খুব সস্তা উভয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষভাবে গভীর আধ্যাত্মিক সংযোগ ঘটেছিল। এট যোগাযোগ সমকালীন বাংলা সাহিত্যের মাধ্যমে ঘটা সম্ভব ছিল না, কেননা, তখন আধুনিক বাংলা সাহিত্য বলতেই কিছু ছিল না, তবে সঙ্গীতের প্রচার ছিল। তাই তথাকথিত লোক-গীতির মারফত এই যোগাযোগ সংঘটিত হওয়া সম্ভব। অবশ্য পরবর্তী কবি সাহিত্যিকদের অনেকেই তাঁর গীত-সাহিত্যের দ্বারা অহু-প্রাণিত হয়েছিলেন, অনেকে তাঁর সক্ষম অমুকারীও ছিলেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্র কবি-গুরু ও বাংলা সাহিত্যের অন্তরঙ্গ গীতিকাব্যধারার আদি প্রবর্তক বিহারীলাল চক্রবর্তী। উনিশ শতকের বাউল-গীতির অন্ততম প্রধান প্রচারক ও সাধক কাকাল হরিনাথ মজুমদার (কুমারখালি, কুষ্টিয়া), সাহিত্য সাধক মীর মোশারফ হোসেন (১৮৪৮-১৯১২)। ঐতিহাসিক গবেষক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, সুসাহিত্যিক রায় জলধর সেন, এমন কি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও এই অসাধারণ বরমী কবি-সাধকের বাগী-সমুদ্রে অবগাহন করে যত্ন হয়েছিলেন। বার কলকরিত্তি হিসাবে বাজলা দেশের স্বধীনস্বাধ লাভ করেছিল বিহারীলালের “বাউল-

বিংশতি", "সারদামঙ্গল" "সাধের আসন" ইত্যাদি কাব্য, ও কবিগুরু "বাউল" (১৯০৫), "আত্মশক্তি", "Religion of Man" (1931), "মাহুশের ধর্ম (১৯৩৩) ইত্যাদি সাহিত্য কলম ও ধর্মীয় চিন্তার বিবর্তনমূলক গ্রন্থরাজি। শুধু তাই নয়, কথিত আছে, খ্রীষ্টীয়ামক্কর পরমহংস-দেবের (জন্ম ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৩৬) সঙ্গীত-আসরে লালন শাহী সঙ্গীতেরও বিশেষ কদর ছিল। এমনকি, নিছক মানবতাবাদী (Humanist) দয়ার সাগর বিভাসাগরকেও লালন-গীতির আসরের একজন অন্তরঙ্গ ভক্ত হিসেবেও দেখা গিয়েছে। শুধু কি তাই? রাজা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্ম-সমাজেও যে লালন-গীতির অল্পপ্রবেশ ঘটেছিল, এরূপ একটি কৌতূহলজনক দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করে বিষয়টি বোঝাবার চেষ্টা করা যাচ্ছে। রামমোহনের 'ব্রাহ্ম-সঙ্গীত' (১৮৩৩) গ্রন্থের প্রথম সঙ্গীতটি হ'ল নিম্নরূপ :

কে ভুলালো হায়
কলনারে সত্য করি জানো একি দায়।
আপনি গড়হ বাক্যে
যে তোমার বশে তাকে
কেমনে ঈশ্বর ডাকে কর অভিপ্রায় ?
কখনও ভ্রমণ দেও, কখনো আহার
কণেকে স্থাপহ কণেকে করহ সংহার
প্রভু বলি মানো যারে
সম্মুখে নাচাও তারে
হেন ভুল এ সংসারে দেখেছো কোথায় ?

তুং—প্রতিমা গড়ার ভাস্করে
ম'লে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে
আবার গুরু বলে তারে
এমন পাগল কে দেখেছে ?

ষাটির পুতুল গড়ে নাচার
একবার মায়ে একবার বাঁচার
সাঁই যেন স্বয়ং হতে চায়

লালন কয় তার সকল মিছে।

রামমোহনের তুহফাত-এর একটি বাণী নিম্নরূপ—“একমাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাসই প্রত্যেক ধর্মের মূল হ'ল। জাতি ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল মাহুশের স্বদয় পরস্পরের প্রতি প্রীতি ভালোবাসা দিয়ে জয় করাই প্রকৃতির সৃষ্টিকর্তা একমাত্র ঈশ্বরের নিকট গ্রহণীয় বিত্ত্ব পূজা।”^{২৪}

—তুং লালনের—

“ভক্তের দ্বারে বাধা আছেন সাঁই

ববন কি কাফের তার

জাভের বিচার নাই।”

আরও একটি প্রশ্ন—“এখন প্রশ্ন এই যে, যিনি স্রষ্টা সর্বজ্ঞ, দয়ালু বদান্ত এবং অনাসক্ত সেই ভগবানের পক্ষে বিরুদ্ধত্বের উপদেশ ও আদেশ দেওয়া কি সম্ভব? অথবা এই সবই কি ধর্ম্মানুভবীদের মন-গড়া জিনিস? আমার তো মনে হয় যে, যে কোন হুঁহ মনের লোক কেউই শেষেরটি মানতে ইত্তস্ততঃ করবেনা।”

বলা বাহুল্য, লালনের মনেও ছিল ওই একই প্রশ্ন :

কি কালাম পাঠাইলেন আমার সাঁই দয়াময়।

এক এক দেশে এক এক বাণী কোন খোদায় পাঠায় ॥

এক যুগে বা পাঠায় কালাম।

আর যুগে তা হয় কেন হারাম

দেশে দেশে এমনি তাহান

ভিন্ন দেখা যায়।

যদি একই খোদায় হয় বর্ণনা

তাতে তো ভিন্ন থাকে না

মাহুযেরই সব রচনা

তাইতে ভিন্ন হয়।

এক এক দেশে এক এক বাণী

পাঠান কি সাঁই, গুণমণি

মাহুযের রচনা আনি

লালন ফকির কর ॥ ১৫

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, এটিও রামমোহনের মত লালনের প্রশ্ন বটে, তবে জবাব রামমোহনের মত নয়। সাম্প্রদায়িক রীতি অনুসারে লালন-গীতিতে (বা ‘ভাব সংগীত’ বা ‘ভাব গান’ নামে পরিচিত) একটি গানে ভক্ত-মনের প্রশ্ন উত্থাপিত হয় অন্যটিতে দেওয়া হয় তার জবাব। একে বলা হয়—‘দৈন্ত’ ও ‘প্রবত্ত’। দৈন্তে শিষ্ট বা ‘বালকা’ রূপে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, এবং প্রবত্তে গুরুরূপে (পীর বা মুহম্মদ) তার জবাব দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য ধর্ম্মশাস্ত্র সম্পর্কে রামমোহনের মনে যে প্রশ্ন জেগেছিল, মুসলমান সমাজের কাছে—আসলে এ কোন নতুন প্রশ্ন নয়—ইসলামের ইতিহাসের প্রাথমিক যুগে একদল যুক্তিবাদী দার্শনিক (মুতাজিলা) কুরআন শরীফ ঐশী বাণী নয়—হজরত মুহম্মদ (সঃ) এর রচনা, এই মর্মে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করেছিলেন। এ নিয়ে বহু বাক-বিতণ্ডাও

অল্পশ্রিত হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত এ সম্পর্কে যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্তে কুরআনকে অপরিবর্তনীয় ঐশী বাণীরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। উনিশ শতকের বাঙলাদেশে প্রথমটি নতুন করে উঠলেও তাতে মুসলমান সমাজের মাথা-ব্যাথা কোন কারণ ছিল না, কেননা এ প্রশ্ন ছিল সমকালীন হিন্দু-সমাজে সংস্কারের ব্যাপারে রামমোহন ও তাঁর অহুসারীদের। কুরআন শরীফ ঐশী বাণী হোক বা না হোক, তাতে হিন্দু-সমাজের মাথা-ব্যাথা ছিল না, কিন্তু কুরআনের বাণীর অহুসরণে হিন্দু-সমাজের সংস্কার করতে গেলে তার একটি যুক্তিসংগত এবং যুগোপযোগী ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল বৈ কি ? রামমোহন সেই ব্যাখ্যাই লিপিবদ্ধ করেছিলেন ‘তুহফাত’ পুস্তিকায়। স্বর্ষী-সমাজের অবগতির জগৎ এ-সম্পর্কে রবীন্দ্র-জীবনীয় প্রখ্যাত লেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক প্রকাশিত “রামমোহন ও তৎকালীন সাহিত্য ও সমাজ” গ্রন্থ থেকে প্রাসংগিক উদ্ধৃত দিয়ে বিষয়টি বোঝাবার চেষ্টা করা যাচ্ছে।

যথা,—“তুহফাত-উল-মুঘাহহিদ্দীন ঐসলামিক বিশ্বধর্মের আদর্শে রচিত, অথচ “গোড়া মুসলমানী মতের প্রতিরোধক। আসলে ইসলামের মধ্যে যে উদারপন্থী সম্প্রদায় দেখা দিয়েছিল তাঁদের আদর্শে (মুতজল) এটি রচিত।” ইত্যাদি^{১০} প্রভাতবাবু মুর্তাজিলা দর্শনের বরাতে দিতে গিয়ে এখানে একটু ভ্রান্তিতে পতিত হয়েছেন, কেননা, তিনি বলতে চেয়েছেন, মুর্তাজিলাবাদীদের মত যুক্তিতর্কের মাধ্যমে ইসলামী একেশ্বরবাদী চিন্তাধারাকে আত্মস্থ করে তিনি তাঁর নবীন ধর্মমত (ব্রাহ্ম ধর্ম) প্রচার করেছিলেন, যাতে কোন ধর্মীয় গোড়ামীর স্থান ছিল না। কিন্তু কথটি যে ঠিক নয় তার কারণ, তিনি তাঁর ধর্মমতে কোন অহিন্দুকে আশ্রয় দিতে পারেন নি। এমন কি তাঁর ব্রাহ্মধর্ম শেষ পর্যন্ত হিন্দু ধর্মেই রূপান্তরিত হয়েছে। এবং হিন্দু ধর্ম হওয়ায়, রামমোহনের বিশ্বজনীন ধর্ম মতও খণ্ডিত হয়েছে। ফলে ব্রাহ্মধর্ম হয়েছে অব্রাহ্ম বা অহিন্দু-সমাজের প্রতিবাদী ও একেশ্বরবাদী এক বিশেষধর্ম। লালন তাঁর গানে স্পষ্টই বলেছেন, অধুমাত্র একেশ্বরবাদী (মোজাহেদ) হ’লেই হবে না, তাতে কোন ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষ বা পয়গম্বরের অহুসারী হ’তে হবে, কেননা ধর্মমত সাধারণ মানববুদ্ধির অতীত, এবং ধর্মমতের প্রবর্তক স্বয়ং খুদাতায়ালা ব্যতীত আর কেউ হতে পারেন না। তাই কি পরবর্তী ব্রাহ্মগণ নিজেদেরকে সনাতন হিন্দু ধর্মেরই অহুসারী বলে পরিচয় দিচ্ছেন ? রামমোহনের মত লালনও যুক্তিবাদী ছিলেন বটে, তবে ছিলেন আসলে ইসলামী ভক্তিবাদে দীক্ষিত (সুফী), তাই রামমোহনের আল্লাহ প্রেরিত রহুল ও তাঁর বাণীর প্রতি অবিশ্বাসকে প্রকাজেই আক্রমণ করে বলেছেন—

“নবান্না মানে যার।

মোজাহেদ কাফের তার।

সেই কাফের দায়মাল হবে

বে-হিসাব দোজখে যাবে

আবার তারে খালাস দিবে

লালন কয় যোর কি হয় জানি ॥^{১১}

এখানে 'মোয়াজ্জিদ' শব্দটির ব্যবহার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। শুধু এখানেই নয়, লালনের একাধিক গানে 'মোয়াজ্জিদ'দের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। লালন স্পষ্টই বলেছেন, ইহ ও পরকালের মুক্তি বা মোক্ষ লাভের জন্ত পীর-মুরশিদ বা আধ্যাত্মিক গুরুর চরণ-শরণের প্রয়োজন। আজ্জাহ প্রেরিত নবী বা অবতারগণ সেই গুরু, তাঁরা কোন বিশেষ ব্যক্তি নন—আজ্জাহের বিশেষ দূত ও বাণী বাহক। তাই মোয়াজ্জিদ-গণ লালনের মতে ভ্রান্তি। তবে কি লালন রামমোহনের 'তুহফাত' গ্রন্থ পাঠ করেছিলেন। মনে হয়, পড়েছিলেন, তা না হ'লে লালনের গানে 'মোয়াজ্জিদ' শব্দটি উৎপত্তি হ'ত না। কেন না, যে সমস্ত সংগ্রাহক বৎসর পূর্বেই মুসলিম দার্শনিকদের মনে আলোড়ন জাগিয়েছিল, এবং বহু বাক-বিতণ্ডার পরে তার একটা মীমাংসাও হয়ে গিয়েছিল, উনিশ শতকের মুসলিম-সমাজে সে প্রশ্ন নতুন করে উত্থাপিত হওয়ার কোন কারণও দেখা দিয়ে ছিল না। আরও একটি কথা। প্রভাতবাবু মনে করেন, রামমোহনের সাংগীতিক প্রেরণা উত্তর ভারতের কবীর দাদু-নানক-সুফী-কবীর কাছ থেকেই এসেছিল। ঘটনাটি অস্বাভাবিক একটা কিছু এমনও নয়—কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি সমকালীন বাঙলা দেশের মরমী গীতিধারার কথা একবার উল্লেখ করতেও ভুলে গেছেন। মনে হয়, এই সব সাধারণ মাত্রের জীবনেও যে কোন অসাধারণ চিন্তার বিকাশ ঘটতে পারে মুখোপাধ্যায় মশায় তা কল্পনাও করতে পারেন নি, তাই রামমোহনের ধর্ম-সাধনার সঙ্গে এ-দেশের পানি-মাটির কোন সংযোগ ঘটতে পারে এরূপ কথা ভাবতেও ভুলে গেছেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে এই ধরনের ভুল অহরহ ঘটে চলেছে। অবশ্য রামমোহনের ব্রাহ্ম-সংগীত রচনার মৌল প্রেরণা যেখান থেকেই আসুক না কেন, সুফী-সংগীত সাধনার দ্বারা সঙ্গে তার যে বিশেষ যোগ ছিল, এ-কথা অনস্বীকার্য। নানক-কবীর-দাদু-সংগীত সাধনাও সুফী সংগীতেরই ('সামা') রকমের এ-কথা নতুন করে বলবার অপেক্ষা রাখে না। লালন দুদ্দু-পানুজু-সম্রাটের সংগীত-সাধনাও তারই অনিবার্ণ দ্বারা প্রবাহ মাত্র। সমকালীন ফরায়েখী-ওয়ারাহী সমাজ-সংস্কারকগণ সংগীতের প্রতি বিশেষ বিরূপ ছিলেন বটে, তবে বিশ্বসংগীত আসরে মুসলমানরাই যে এককালে একচ্ছত্র ছিল এবং এখনও সুফী-সংগীত বিভিন্ন দেশে সংগীত-সাধনার দ্বারাকে বিশেষ ভাবে সজীব রেখেছে, এ-কথা বলাই বাহুল্য। পাক-ভারত-বাঙলাদেশেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। তাই দেখতে পাই রামমোহনের উত্তরাধিকারী বিহারীলাল-রবীন্দ্র-নাথো লালনশাহী মরমী-গীতির প্রভাব অপরিণীম। ব্যক্তিগতভাবে রবীন্দ্রনাথ লালন শাহের কতটা সান্নিধ্য লাভ করতে সক্ষম হ'য়েছিলেন, তা নিয়ে আমাদের সুদীর্ঘ-মহলে বিদ্বাদ্বন্দের অবকাশ থাকলেও তাঁর শিলাইদহে (কুষ্টিয়া) প্রवासকালে তার মনোরম গ্রাম পরিবেশে লালন শাহী কবীর-সমাজের একতারা তাঁকে কিভাবে পাগল করে তুলেছিল এবং তিনি একের পর এক করে অপরূপ কাব্যকলমে বাংলা সাহিত্যের অলম্বন করে

তুলেছিলেন, এবং কি ভাবে তাঁর মানস-লোকে পলি জমে ধীরে ধীরে জীবন-দেবতার চর ভেগে উঠছিল, রবীন্দ্র কাব্য-সমালোচকদের কাছে তা বিশেষ আকর্ষণীয় বিষয় বলে বিবেচিত হবে নিঃসন্দেহে। কবিগুরু সাহিত্য-জীবনে এ কালের অভিজ্ঞতা, বিশেষ ক'রে লালন শাহী সংগীতের প্রভাব পরবর্তীকালে কিভাবে জীবন দেবতাতত্ত্বের উদ্ভব ঘটিয়ে ছিল, তাঁর লগুনে প্রদত্ত হিবার্ট বক্তৃতামালা (Religion of Man, 1930) ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত কমলা বক্তৃতামালায় (মাহুয়ের ধর্ম, ১৯৩৩) তার হুম্পট আঁকর আছে। তাই আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এবং সেই সঙ্গে বাঙ্গালী সমাজ-জীবনের বিবর্তনের ইতিহাসে লালন শাহ ও তাঁর অহুসারী ধর্ম ও সংগীত সম্প্রদায়ের এক বিশিষ্ট ভূমিকা আছে—সত্যের অহুরোধে এ-কথা আমাদের স্বীকার করতে হবে। তবে গভীর পরিভাষার বিষয়, অত্যাধি এ-দিকে আমাদের সাহিত্য ও সমাজতত্ত্ববিদদের বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নি। বারাস্তরে এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাতের আশা রইল।

পাদটীকা

- ১। লালন-শিষ্য হুদু শাহ বিরচিত ও লালন কথিত আত্ম জীবন চরিত্রের কলমী পুঁথি। বশোর জিলার হাট জগদল নিবাসী আবদুল লতীফ আফি আনুহ (বর্তমানে ময়হুম) সংগৃহীত (১৯৬০)। নবম্বীরের নিকটবর্তী চরব্রজ নিবাসী জনৈক রামবাবুর নিকট থেকে এটি সংগৃহীত হয়। রচনা কাল ১৩০৩ সাল, ১৮২৬ খ্রিঃ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা (সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষা, ১৩৭৪, ১৯৬৭) প্রকাশিত। বিস্তারিত বিবরণী বর্তমান নিবন্ধকারের “লালন শাহ ও লালন গীতিকার” ১ম ও ২য় খণ্ড (বাঙলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৮) দ্রষ্টব্য। উল্লেখ্য যে গ্রন্থখানি ১৯৬৩ সালের এপ্রিল মাসে সমাপ্তি হয় ও বাঙলা একাডেমীতে প্রকাশের অন্তর্দাখিল করা হয়।
- ২। পূর্বোক্ত (সাহিত্য পত্রিকা)। পৃঃ ৭৭।
- ৩। শ্রীবসন্তকুমার পাল। মহাত্মা লালন ফকির (শান্তিপুত্র, নদীয়া, ১৯৫৪) পৃঃ ১। ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। বাংলার বাউল ও বাউল গান (কলিকাতা, ১৩৭৮ সাল, ২য় সং) পৃঃ ৫৩২।
- ৪। মুহম্মদ আবু তালিব। লালন পরিচিতি (ঢাকা, ১৯৬৮) পৃঃ ৪।
- ৫। Abdul Wali. On some curious Tenents and Practices of certain class of Faqirs in Bengal. Journal of the Anthropological Society of Bombay, 1900, Vol. No. 4, p. 217.

লেখক খুলনা জিলার সাতক্ষীরা মহকুমার বাসিন্দা ও লালনের জন্মস্থানের নিকটবর্তী শৈলকূপা (যশোর) সাব-রেজিষ্টারী অফিসের সাব-রেজিষ্টার ছিলেন (১৮৫৬-১৯২৬)। সমকালীন বাঙলার প্রভুত্ববিষয়ক ইনি একজন বিখ্যাত গবেষক ও লেখক ছিলেন। যশোর জিলার খড়কৌ গ্রাম নিবাসী আমার স্নেহান্বিত অধ্যাপক শরীফ হোসেনের সৌজন্যে প্রাপ্ত। উল্লেখ্য যে, অধ্যাপক মনসুর উদ্দীন তাঁর 'হারামনি' ৭ম খণ্ডের ভূমিকায় (বাঙলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৩) ভুলক্রমে এই রচনাটি Natural Society of Bombay থেকে প্রকাশিত বলে উল্লেখ করেছেন। রচনাটির তিনি শুধু নাম শুনেছেন, দেখেন নি, ফলে এই ভ্রান্তি।

- ৬। এক নম্বর ঢাকার উল্লিখিত হুদু শাহের লালনের আত্মচরিত সংক্রান্ত বিবৃতি দ্রষ্টব্য।
- ৭। ১ নম্বর ঢাকা দ্রষ্টব্য।
- ৮। ডালিব। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৮-৩২।
- ৯। অধম কাকাল। ছহী আক্কেলনামা, কলমী পুথি। নিবন্ধকার সংগৃহীত।
- ১০। রাজশাহী জিলার গড়ের হাট পরগণার বিখ্যাত প্রেমভলী-খেতুরী প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ধর্মস্থান। খ্রীষ্টীয় সত্তেরো শতকের বিখ্যাত পদকর্তা নরোত্তম দাস এখানে যে মহোৎসব করেন, বৈষ্ণব ধর্মালম্বনেন্নই ইতিহাসে তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।
- ১১। পাল। ৩ নম্বর ঢাকা দ্রষ্টব্য। পৃ: ১।
- ১২। ভট্টাচার্য (৩ নম্বর ঢাকা)। পৃ: ৫৪১।
- ১৩। The Bangladesh Observer (July, 2, 1973) p. 2.

নিজস্ব সংবাদ দাতার নিবন্ধ।

- ১৪। ডালিব। ৮ নম্বর ঢাকা দ্রষ্টব্য।
- ১৫। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী। সত্যার্থ প্রকাশ; হিন্দী গ্রন্থের বাংলা তরজমা।
- ১৬। পাল। পূর্বোক্ত। পৃ: ২৬-৩১।
- ১৭। ভট্টাচার্য। পৃ: ৫৪৫।
- ১৮। জসীম উদ্দীন। লালন শাহ ফকির প্রবন্ধ। বঙ্গবাণী, জাবণ, ১৩৩২ সাল, ১৯২৫।
- ১৯। খুব সম্ভব বিশোকা লালনের প্রথম জীবন নাম। নিবন্ধকার সংগৃহীত ১২৮৭ ও ১২৮৮ সালে রেজিষ্টারীকৃত লালনের পরমানন্দপুর আত্মানার জমীকর সংক্রান্ত দুটি কবুলিয়ত ও দুটি পাট্টা দলীল। পাট্টা দুটি শুকুর সাহেবের উত্তরাধিকারী জনাব আমীর হোসেন শাহ ও আমজাদ হোসেন শাহ সাহেবদ্বয়ের সৌজন্যে ও কবুলিয়ত দুটি যশোর জিলা রেজিষ্টারী অফিস থেকে গত ১০ই মে, ১৯৭৩

তারিখে রেজিষ্টার জনাব ডোজামেল হক সাহেব ও তাঁর সহকর্মীদের আত্মকল্যাণ প্রাপ্ত। উল্লেখ্য যে, রেজিষ্টার সাহেব লালনের ছেঁউড়ে আন্তানার নিকটবর্তী অধুনা লুপ্ত ‘ভালুকা’ থানার বাসিন্দা। হুদ শাহেব পুরোক্ত বিবৃতি এবং দলীলে ভালুকা থানার নাম আছে। অধম কালকণ্ড ছেঁউড়ে গ্রামকে ভালুকা থানার অন্তর্গত বলেছেন।

- ২০। মাওলানা রিয়াজ-উদ্দীন আহমদ। বাউল ধ্বংস ফতওয়া, ১ম ও ২য় খণ্ড (সৈয়দপুর, রংপুর, ১৩৩৩ সাল=১৯২৬)। দ্রষ্টব্য তালিব। লালন শাহ ও লালন-গীতিকা, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৫-১২৮।
- ২১। নবীনচন্দ্র সেন। আমার জীবন।
- ২২। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক (পশ্চিম বঙ্গ) ডক্টর তুষার চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি ঘোষণা দিয়ে এ-বিষয়ে ক্ষেত্রান্তরকারী গিয়ে এই তথ্য সংগ্রহ করেছেন। প্রমাণস্বরূপ তিনি উক্ত সম্প্রদায়ের গুরুমার বন্দনামূলক লালনের নিম্নলিখিত গানটি উদ্ধার করেছেন।

কি আনন্দ ঘোষ পাড়াতে
পাপী ভাপী উদ্ধারিতে
হুলাল চাঁদকে লয়ে সাথে
রয়েছেন মা ডালিমতলাতে ॥
কে বোঝে মা তোমার মেলা (খেলা ?)
এখানে এই দোলের মেলা
অন্ধ আতুর বোবা কালা
মুক্তি হয় মা তোমার কৃপাতে ॥
কেন গো সতী-স্বরূপিণী
সামনে আছে স্বরধুনী
অনেক দূরে ছিল শুনি
এগিয়ে এল তোমার কাছেতে ॥
লালন কর তোমার মনকে খাঁটি
ডালিমতলার নিয়ে মাটি
হারাস যদি হাতের লাঠি
পড়বি থানা আর ডোবাতে ॥

গানটি রুস্তমী বালা দাসীর আখড়া থেকে রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের (কলিকাতা) ছাত্র ত্রিকিষণ বিশ্বাস সংগ্রহ করেন (১২.৩.৭৩ তারিখ ১টা)। এ-থেকে বোঝা যায়, ঘোষ পাড়ার সঙ্গে লালনের যোগাযোগ ছিল।

- ୨୩। ରାମମୋହନ ଶ୍ରୀବାସୀ (କଲିକାତା, ୧୯୧୦) ।
- ୨୪। ପୂର୍ବୋକ୍ତ । ତୁହଫାତ୍-ଉଲ-ମୁସାହ୍-ଦ୍ଦୀନ । ପୃ: ୧୧୫-୧୨୨ ।
- ୨୫। ଡାଲିବ । ଲାଲନ ଶାହ ଓ ଲାଲନ ଗୌଡ଼ିକା,
ଗାନ ନଂ ୨୦୫ (୨ୟ ଖଣ୍ଡ) ।
- ୨୬। ଶ୍ରୀଧାତକୂମାର ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ । ରାମମୋହନ ଓ ତତ୍କାଳୀନ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସମାଜ
(କଲିକାତା, ୧୯୧୨) ପୃ: ୨୧ ।
- ୨୭। ଡାଲିବ । ପୂର୍ବୋକ୍ତ ୧ୟ ଖଣ୍ଡ । ଗାନ ନଂ ୧ ।

হরিমোহন মুখোপাধ্যায়

প্রীহারাদন দত্ত

হরিমোহন মুখোপাধ্যায় বর্তমান যুগে প্রায় বিস্মৃত নাম। অথচ বিগত যুগে সাময়িক পত্রের সম্পাদক ও সাহিত্যসেবীরূপে বঙ্গসাহিত্য-সংসারে তিনি প্রকারে আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। হরিমোহন গল্প-উপন্যাস-কাব্য-নাটক-রসরচনা-সঙ্গীত-নিবন্ধাদি রচনা করিয়া সেকালের সাহিত্যরসিক সমাজে জনপ্রিয় হইয়াছিলেন, কালের প্রচণ্ড আঘাতে তাঁহার এই সমস্ত রচনা টিকে নাই। পুরাতনের প্রতি ছিল তাঁহার অসীম প্রীতি। ইংরাজ আধিপত্য যুগে স্বদেশী সাহিত্য সংস্কৃতির প্রায় সব কিছুই অপাণ্ডিত্যের ও পরিত্যক্ত হইয়াছিল। বাঙ্গলা সাহিত্য সংস্কৃতির এই যুগ-সংকটে হরিমোহন প্রায়-বিলীয়মান প্রাচীন কবিতা সঙ্গীত পাঁচালী বাজাপালা প্রভৃতি সকল ও সম্পাদন করিয়া দেশীয় সাহিত্যকে অবলুপ্তির হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন, অধিকন্তু প্রাচীনকাল হইতে তাঁহার সমকালীন যুগ পর্যন্ত বঙ্গভাষার লেখক-সম্প্রদায়ের জীবন ও সাহিত্য-সাধনার পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া ঐতিহাসিক দৃষ্টি ও স্বগভীর সাহিত্যপ্রেমের বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ‘বঙ্গভাষার লেখক’ খ্যাত হরিমোহন একালের বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষকগণের কাছে প্রয়োজন বোধে কখন কখন অপরিসীম বিবেচিত হন। দুঃখের বিষয় হরিমোহনের জীবন ও সাহিত্য সাধনার পরিচয় জ্ঞাপক কোন নিবন্ধ বা আলোচনা এতাবৎ কেহ প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া জানা নাই। তিনি অভিশয় অনাদৃত অবস্থায় হুগলী জেলার বিজন জয়পল্লীতে লোকান্তরিত হন। কোন সাময়িক পত্র-পত্রিকায় তাঁহার মৃত্যু সংবাদটুকুও প্রকাশিত হয় নাই। আমাদের অলক্ষ্যে ও অগোচরে তাঁহার জন্মশতবার্ষিকীর তিথিও অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে, আমরা তাঁহাকে স্মরণ করিতেও ভুলিয়া গিয়াছি। তথাপি কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ তাঁহার জীবন ও কীর্তির বস্তুটুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি বর্তমান নিবন্ধে তাহাই উপস্থিত করিতেছি।

জন্ম : বংশ পরিচয়

হুগলী জেলার দাদপুর থানা (পূর্বে পোলবা) অন্তর্গত সানিহাট (সিনেট) গ্রামে হরিমোহনের জন্ম হয়। তাঁহার জন্ম তারিখ ১৫ই আষাঢ়, বুধবার ১২৭২ বঙ্গাব্দ (ইং ১৮৬৫ খ্রিঃ)। হরিমোহনের জন্ম তারিখ সন্ধ্যা ভিন্ন একটি মতেরও সন্ধান পাইয়াছি। হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের জীবনী বিষয়ক উপকরণ ও তথ্যাদি অসুসন্ধান কালে তাঁহার বাসভবন হইতে ‘বঙ্গীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান ও কার্যালয়ের’ (১১, ইন্ডেন হসপিটাল রোড)

একখানি পত্র হস্তগত হয়। পত্রখানির তারিখ, ২ মাঘ, ১৩৩১ (১৪ জানুয়ারী ১৯২৫)।
 ঐ পত্রে হরিশোহনের জন্মতারিখ, ১৬ই আষাঢ়, ১২৭৭ (২২ জুন ১৮৭০ খ্রীঃ), বুধবার
 শুক্লা প্রতিপদ, আত্রানক্ষত্র, লিখিত আছে। হরিশোহনের কোন জন্মকোষ্ঠি খুঁজিয়া পাই
 নাই। হরিশোহন নিজ প্রয়োজনে এই জ্যোতির্বিজ্ঞানালের সহিত যোগাযোগ করিয়াছিলেন
 অস্বস্তিত হয়। বোধহয় পরিণত বয়সে চাকুরীর প্রয়োজনে বয়স কমাইবার জন্ত তিনি
 জ্যোতির্বিজ্ঞানালের একখানি বয়স নির্ধারণ পত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন। হরিশোহনের এই
 পরবর্তী জন্মতারিখ গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁহার জীবনী বিষয়ক অন্ত্যন্ত বেসব উপাদান
 পাইয়াছি তাহাও হরিশোহনের জন্মতারিখ ১২৭৭ বঙ্গাব্দ সমর্থন করে না। বঙ্গবাসী
 কার্যালয়ে, হরিশোহনের সহকর্মী ও বঙ্গবাসী পত্রিকার সহ-সম্পাদক দুর্গাদাস লাহিড়ী
 ১৩১২ বঙ্গাব্দে তাঁহার যে সংক্ষিপ্ত জীবনী সঙ্কলন করিয়াছিলেন সেখানে তিনি জন্ম সাল
 উল্লেখ করেন নাই। তথাপি হরিশোহনের বয়স সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছিলেন—“ইহার
 বয়স একনে অসুমান চল্লিশ বৎসর।” অসুমান করা বাইতে পারে দুর্গাদাস হরিশোহনের
 সঙ্গে আলাপ আলোচনা করিয়া এই জীবনী সঙ্কলন করিয়াছিলেন। ১৩১২ বঙ্গাব্দে হরি-
 শোহনের বয়স চল্লিশ হইলে জন্মসাল ১২৭২ ধরিতে হয়। হরিশোহনের বয়স সম্বন্ধে
 দুর্গাদাসের এবং বিধ অসুমান নেহাৎ অসুমান মাত্র নহে। হুগলী জেলায় তাঁহার সানিহাট
 বাসভবনে, ‘শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ ব্রতকথা’ নামক ৬০ পৃষ্ঠার একখানি সম্পূর্ণ অপ্রকাশিত পাণ্ডু-
 লিপি পাইয়াছিলাম। ১৩২২ বঙ্গাব্দে হরিশোহন স্বল্পপুষ্টিগের রেবা খণ্ড অবলম্বনে সত্য-
 নারায়ণ ব্রতকথা অনুবাদ করেন। পরে ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে ২৫ চৈত্র বৃহস্পতিবার, তারিখে
 রচিত ‘আত্মনিবেদন’ অংশ ইহার সহিত যুক্ত করেন। এই ‘আত্মনিবেদনে’ তিনি লিখিয়াছেন

সুপ্রসিদ্ধ ‘বঙ্গবাসী’ পত্রের সেবায়,

থাকিয়া আসিহু আমি যাটের কোটায়।

কর্মত্যাগ পরে আজ এগার বৎসর,

বন্ধ হয়ে আছি ঘোর সংসার ভিতর।

এই পটভাঙ্গ হইতেও হরিশোহনের জন্মসালের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বঙ্গবাসীর
 কর্মত্যাগের বয়স কমপক্ষে ষাট বৎসর এবং অবসর জীবন ১১ বৎসর ধরিলে ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে
 তাঁহার বয়স ৭১ বৎসর। এই হিসাব অনুযায়ী তাঁহার জন্মসাল ১২৭২ হয়। সুতরাং ১২৭২
 বঙ্গাব্দকে তাঁহার জন্মসাল হিসাবে গ্রহণ করিব।

হরিশোহন সানিহাটের প্রসিদ্ধ মুখোচী বংশের সন্তান। বড়িয়ার সাবর্ণ রায়চৌধুরী-
 দের পরিবারে মুখোচী বংশের কোন কন্তার বিবাহ হওয়ায় ইহাদের কৌলিন্য লুপ্ত হয়। হরি-
 শোহনের পিতার নাম বহুনাথ মুখোপাধ্যায়। মাতা ভুবনমোহিনী। ছয়মাস বয়সে হরি-
 শোহন পিতৃমাতৃহীন হন। জ্যেষ্ঠভাতাপুত্র জৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এবং পত্নীর
 চট্টোপাধ্যায় বংশীয়া জননীকন্যা ব্রজমোহিনী তাঁহার ভরণ পোষণ শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবতীয়

দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অপ্রকাশিত আত্মনিবেদনে হরিমোহনের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে।^১ সানিহাটের এই মুখোপাধ্যায় পরিবারে নিত্য শাপগ্রামশিলা পূজিত হইত। এই শাপগ্রামশিলার নিত্যপূজাও ভোগের জগৎ বর্দ্ধমানের মহারাজ প্রতাপচাঁদ মহতাব ১২৩৪ বঙ্গাব্দে বাস্তুভিটাসহ ২৫ বিঘা নিকর দেবোত্তর ভূমিদান করেন (তায়দাদ নং ৩৪৮৫৪)। মুখোপাধ্যায় পরিবারের বংশধরেরা আজিও তাহা উপভোগ করিয়া আসিতেছেন।

হরিমোহনের জন্মপঞ্জী সানিহাট একটি গওগ্রাম। এখানকার বিশালাক্ষী দেবী জোড়বাংলা মন্দির বাংলার মন্দির-স্থাপত্যের একটি সুন্দর নিদর্শন। সানিহাটের জোড় বাংলা মন্দিরের গায়ে মন্দির প্রতিষ্ঠার তারিখ ১২২২ সাল উৎকীর্ণ আছে। কিন্তু বিশালাক্ষী দেবীর প্রতিষ্ঠা ইহার বহুপূর্বে। মন্দিরটি ইংরাজ যুগে প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইউরোপীয় স্থাপত্য রীতির কোন প্রভাব ইহার গঠনে কোথাও গহ্বপ্রবেশ করে নাই। বাংলার নিজস্ব মন্দির নির্মাণশৈলী বিশালাক্ষী মন্দিরে পূর্ণমাত্রায় বজায় আছে। স্থানীয় প্রাচীন হালদারবংশীয়গণ কর্তৃক এই দেবীর প্রতিষ্ঠা হয়। পরবর্তীকালে বর্দ্ধমানের মহারাজা মন্দিরটি নির্মাণ করিয়া দেন। উত্তরপাড়ার মুখোপাধ্যায় জমিদারগণ দেবীর সেবার ব্যবস্থা করেন। বিশালাক্ষী জাগ্রতা দেবী বলিয়া এই অঞ্চল বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। এই দেবীর প্রতিষ্ঠা বিষয়ক নানা কাহিনী ও কিংবদন্তী এখানকার জনসমাজে প্রচলিত আছে।^২ সানিহাট প্রাচীনকাল হইতে পিণ্ডল কাঁসার শিল্পকেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধ।^৩ হরিমোহন একটি প্রশস্তি কবিতায় জাগ্রতা বিশালাক্ষী দেবীর স্তুত করিয়াছেন।^৪ প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তির দিন বিশালাক্ষী দেবীর প্রতিষ্ঠা দিবসে মায়ের বিশেষ পূজা অনুষ্ঠান হয়। আশ্বিন মাসের দুর্গাপূজার নবমীতে এবং চৈত্র সংক্রান্তির দিনে বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির প্রাক্কনে মেলা উৎসব পালিত হয়। হরিমোহন তাঁহার জন্মপঞ্জী সানিহাটকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসিতেন। জন্মপঞ্জী সানিহাটের

১। দুর্গাদাস লাহিড়ী। বাংলার গান (বঙ্গবাসী, ১৩১২)

২। হুগলী জেলায় গ্রাম সানিহাট নাম।

যথা বিশালাক্ষী মায় আছে পুত্রধাম।

৩। শ্রীহৃদীরকুমার মিত্র। হুগলী জেলার দেব-দেউল (১২৭১)

৪। শ্রীহৃদীর কুমার মিত্র। হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গমাজ, ২য় খণ্ড,
(১৯৬৫, ২য় সংখ্যা, তৃতীয় মুদ্রণ)

৫। ধ্যানকরি বিশালাক্ষী বিশাল বাঁহার অক্ষি,

তপ্ত স্বর্ণ জিনি বাঁর অঙ্গের বরণ।

হুটি ভুজ দেখি বাঁর

অধিকা প্রচণ্ড আর

খড়গ খেটক বিনি করেন ধারণ।

কল্যাণ-বিধায়ক সর্ববিধ উন্নয়ন কৰ্মের সঙ্গে তিনি নিজেকে আমৃত্যু যুক্ত রাখিয়াছিলেন। অমৃত্যুই সানিহাট সন্নিহিত জনপদ সমূহের সঙ্গে তাঁহার নিবিড় যোগাযোগ ছিল। গোবিন্দী মালিপাড়ার মদনমোহন জীউ'র উৎসব উপলক্ষে লিখিত একটি কবিতার তাঁহার পল্লী-প্রীতির নিদর্শন বিদ্যমান।^৩

তথায় মুখোটা-বংশে জনম লভিয়া।
 অম্বকাল গোয়াইলু যায় মজিয়া ॥
 পিতা যখনাথ মাতা ভুবনমোহিনী।
 দু'হর মহিমা আমি কিছু নাহি জানি ॥
 শিশুকালে পিতামাতা দৌহে হারাইয়া।
 কোনরূপে বেঁচে আছি অকুঞ্জে ভাসিয়া ॥
 জোষ্ঠভাতপুত্র দাদা সদা সদাশয়।
 ত্রৈলোক্যনাথের কৃপা ভুলিবার নয় ॥
 তিনি আর ভিকামাতা শ্রীব্রজমোহিনী।
 আমায়ে মাছুষ কৈলা দিবস বামিনী ॥
 এদের বাৎসল্য স্নেহ মনে দৃঢ় গাঁথা।
 সদা মনে জাগে মোর ইঁহাদের কথা ॥
 জীবন কৰ্ত্তব্য সারি ইঁহারা এগন।
 উভয়েই গিয়াছেন স্বরগভবন ॥
 ইঁহাদের গুণ আমি স্মরিয়া স্মরিয়া।
 সংসার সাগর তীরে রয়েছি পড়িয়া ॥

অপ্রকাশিত “শ্রীশ্রীসত্যনারায়নের ব্রত কথা” পাণ্ডুলিপি হইতে।

৩। হরিশোহন মুখোপাধ্যায়। ভক্তভবনে ভগবান (কবিতা)। মৃত্যুকাল,

শিক্ষা

জ্যেষ্ঠভাতপুত্র জৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এবং জননীকল্পা ব্রজমোহিনীদেবীর তত্ত্বাবধানে সানিহাট পল্লীতে হরিমোহনের শিক্ষারম্ভ হয়। সানিহাটে জৈলোক্যনাথের একটি পাঠশালা ছিল। হরিমোহন এই পাঠশালার ছাত্র ছিলেন। পিতা যখন তৎকালীন প্রচলিত দেশীয় শিক্ষালাভ করিয়া যজ্ঞ-যাজ্ঞন করিতেন। হিন্দুশাস্ত্রে তাঁহার অধিকার ছিল। সে যুগে এই নিভৃত পল্লীঅঞ্চলে ইংরেজী শিক্ষার আলোক প্রবেশ করে নাই। সেজন্ত পিতৃমাতৃহীন হরিমোহন ইংরেজী শিক্ষা লাভ করিতে বেশ বেগ পাইয়াছিলেন। এই বংশের পূর্ব-পুরুষগণের অনেকেই বঙ্গসাহিত্য ও সঙ্গীতে পারদ্রব্য ছিলেন। ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় হরিমোহনের পিতামহ। হরিমোহন প্রসঙ্গক্রমে লিখিয়াছেন, “বদন অধিকারীর সমস্ত গান আমার পিতামহের মুগ্ধ ছিল।” তৎকালীন অধিকাংশ পল্লীগ্রামের মত সানিহাটেও কবিগান, বাজা, পাঁচালী, কীর্তন প্রভৃতির ব্যাপক প্রচলন ছিল। হরিমোহনের তরুণ চিত্তে এই সব সাহিত্য সঙ্গীতের প্রভাব মুদ্রিত হইয়া যায়। প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের প্রতি তাঁহার অসুরাগের সূচনা এখানেই। পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত করিয়া হরিমোহন ক্রমান্বয়ে ভক্তেশ্বর, তেলিনীপাড়া, পাহাড় প্রভৃতি স্থলের বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। পরে জৈলোক্যনাথের নিকট আত্মীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ৮ এবং তৎপত্নি বিনোদিনী—

নানাবিধ অলঙ্কারে কিবা শোভা কলেবরে।

রক্তবাসপরা যিনি মঙ্গলা রূপিনী

নিয়ত যুবতী বেন ষোড়শ-বর্ষীয়া হেন,

প্রসন্নবদনা সদা যিনি জিলোচনী ॥

মুণ্ডমালাবলীধরা পীনোন্নত পদোধরা,

শবোপরি দেবী জটামুকুটমণ্ডিতা।

শত্রুকল্পকরী যিনি সাধকাভীষ্টদায়িনী

সৌভাগ্যজননী সর্বসম্পদপ্রদাতা ॥

সানিহাটে অধিষ্ঠান পাতকী করিতে ত্রাণ

ভক্তের লইতে পূজা মন্দিরে বিরাজ।

করবোড়ে কহে হরি বেন বমত্তয়ে তরি

চরণে পরণ মাগো! লইলাম আজ ॥

অপ্রকাশিত, ‘শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ ব্রজকথা’ পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত ‘শ্রীশ্রীবিশালাক্ষী
তবের কিয়দংশ।’

৭। হরিমোহন মুখোপাধ্যায়। গোপাল উড্ডের টঙ্কা (১৩১৭) ভূমিকা।

৮। ইনি সাহিত্যিক ও সাময়িকপত্রলেখক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কিনা জানিতে
পারি নাই।

দেবীর আত্মকুলাভ্যাস করিয়া ভাগলপুরের একটি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন—পরে মুক্তফরপুরের মুবার্কিন্ সেমিনারি স্কুল হইতে হরিমোহন ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁহার ছাত্রব্রতের পরিসমাপ্তি এইখানেই।

বিবাহ

হরিমোহন হুগলী জেলার মাকালপুর সন্নিকটস্থ শিকটা গ্রামনিবাসী কৃষ্ণলাল দেবশর্মা চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা ক্ষেত্রদাসীকে বিবাহ করেন। কৃষ্ণলালের এই পরিবার পরবর্তীকালে বর্ধমান জেলার যেমারীতে বসতি স্থাপন করেন। ক্ষেত্রদাসী ১৩২৪ বঙ্গাব্দে লোকাভ্যস্ত হন। হরিমোহনের কনিষ্ঠা কন্যা দুর্গাবালা দেবী বিহুয়া মহিলা। অধুনা তিনি কাশীবাসিনী। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত “শশিকলার স্বয়ম্বর” নামে তাঁহার একখানি অপ্রকাশিত কাব্য-নাটকের পাণ্ডুলিপি হরিমোহনের বাসভবনে রক্ষিত আছে। হরিমোহনের ছয় কন্যা ও চারি পুত্র। কনিষ্ঠ কালীনারায়ণ ও দুর্গাবালা ব্যতীত সকলেই গত হইয়াছেন।

সাহিত্যানুরাগ

পঠদশা হইতেই মাতৃভাষার প্রতি হরিমোহনের প্রবল অনুরাগ সূচিত হয়। বিভিন্ন প্রসঙ্গ লইয়া গল্প-পद्य ও গান রচনা করিয়া সাহিত্যানুরাগী মহলে খ্যাতি অর্জন করেন। ক্রমে তিনি হুগলী জেলার ভেড়ামারা নিবাসী অধিকাচরণ গুপ্ত, চুঁচুড়ার সাহিত্যাচার্য অক্ষয় চন্দ্র সরকার এবং বঙ্গবাসী কার্যালয়ের অন্যতম সুলেখক বিহারীলাল সরকার মহাশয়ের সহিত পরিচিত হন। তাঁহাদের সুপ্রাণিশ্রমে তিনি ‘বঙ্গবাসী’ কর্ণধার বোগেশচন্দ্র বসুর সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহার আত্মকুলাভ্যাস করেন। তাঁহার সাহিত্য-সেবার আকাজক্ষা চরিতার্থ হইয়া উঠে।

সাময়িকপত্র সেবা

হরিমোহন মুখোপাধ্যায় মাতৃভাষার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ বশতঃ সাময়িকপত্র সেবার বৃত্তি গ্রহণ করেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে হরিমোহন ১০ টাকা বেতনে প্রসিদ্ধ ‘বঙ্গবাসী’ সাপ্তাহিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। সে সময় ‘বঙ্গবাসী’ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ‘বঙ্গবাসী’ পত্রিকার সর্বাপেক্ষা দীর্ঘকালীন সম্পাদক। ভায়তবর্ষের দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রসমূহের মধ্যে ‘বঙ্গবাসী’ই সর্বপ্রথম রাজকোষের অভিযোগে অভিযুক্ত হয় (১৮৯১)। কৃষ্ণচন্দ্রের সম্পাদনা কালে এই ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে। কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য সাধনা সম্পর্কে আমি সর্বপ্রথম আলোচনার সূত্রপাত করি ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে ‘মাসিক বঙ্গবাসী’

পত্রিকার কতিপয় সংখ্যায়। পরে রচনাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।^২ হরিমোহন জীবনে অনেকেই চাকুরি গ্রহণ করেন না। একাদিক্রমে প্রায় ৩২ বৎসর কাল 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সেবা করিয়া ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'বঙ্গবাসীর' সম্পাদনা কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের সময় তাঁর বেতন ছিল ১২০ টাকা। চুঁচুড়ার অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় থাকিলেও সাধারণী (১৮৭৩) পত্রিকার সঙ্গে হরিমোহনের কোন সংস্ব ছিল না। এই ক্ষেত্রে একটি উক্তির কথাঞ্চিৎ উদ্ধৃতিযোগ্য মনে করি "Jogendranath Bose, afterwards the founder and editor of Bangabasi, learned the art of editing under him in the columns of the Sadharani. Khatramohan Sengupta, Harimohan Mukherjee and many other writers wrote for the journal as well. Harimohan began to write for it in 1875. Thence after wards almost every week, a poem or article of his used to appear in the paper of Sadharani."^{১০} স্বম্ভবতঃ মনে হইতে পারে শামাদেব আলোচ্য হরিমোহন মুখোপাধ্যায় 'সাধারণী'র লেখকসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এই উক্তি বিভ্রান্তিকর। বর্তমান হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার অনেক আগে আরও দুইজন হরিমোহন মুখোপাধ্যায় বঙ্গসাহিত্য-সংসারে খ্যাতি অর্জন করেন। দু'জনেই এই হরিমোহন অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ। একজন গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর নিবাসী কবি-চরিত (১৮৬৯) প্যাত হরিমোহন মুখোপাধ্যায়। তাঁহার অন্যান্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থের মধ্যে রসমাগর (১২৮৩), কাদম্বিনী নাটক (১৮৬১), মণিমালিনী (১৮৭৪) এবং জয়বতীর উপাখ্যান (১৮৬৩) উল্লেখযোগ্য। অপর হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ছিলেন নৈহাটী সরিহিত রায়চাঁদ গ্রাম নিবাসী রস সাহিত্যিক জৈলকানাথ মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি সাধারণী সোমপ্রকাশ, বাঙ্গাব, নবজীবন প্রভৃতি পত্রিকায় লিখতেন। তিনি মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতি রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। কিছুকাল 'সোমপ্রকাশ'র সম্পাদনা করেন। মুহূর্ত উদ্ধার (১৮৬১), অদৃষ্ট-বিজয় (১৮৬১), জীবন সঙ্গীত (১৮৮০), প্রণয় প্রতিমা (১৮৮২), বোগিনী (১৮৭২), কমলাদেবী (১৮৮৫), জীবনভারা (১৮৮২) প্রভৃতি তাঁহার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এই শেষোক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় অক্ষয়চন্দ্রের 'সাধারণী'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

'বঙ্গবাসী'র সম্পাদনা বিভাগে হরিমোহন প্রায় ২২ বৎসর সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৩২২ বঙ্গাব্দে বঙ্গবাসী সম্পাদক রায়সাহেব বিহারীলাল সরকার

২। শ্রীহরাদন দত্ত। বঙ্গবাসী : কৃষ্ণচন্দ্র : দেশ ও কাল (১৯৬৫)

১০। P. N. Bose & H. W. B. Moreno. A Hundred years of the Bengali Press etc. (1920)

পরলোকগমন করিলে হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের উপর বঙ্গবাসী সম্পাদনের দায়িত্ব হস্ত হয়। কিন্তু হরিমোহন দীর্ঘকাল ‘বঙ্গবাসী’ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করিতে পারেন নাই। ১৩৩২ বঙ্গাব্দের আষাঢ় ঞ্চাষণ মাসে হরিমোহন লিখিত কয়েকটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে ইংরাজ সরকারের বিষদৃষ্টিতে পড়িত হয়। ফলে ‘বঙ্গবাসী’ পুনরায় রাজকোষের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। আদালতের রায়ে সম্পাদক হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ও মুদ্রাকর নটবর চক্রবর্তী দোষী সাব্যস্ত হন। জরিমানা হিসাবে অর্থদণ্ড অনাদায়ে তাঁহাদের হাজতবাসের আদেশ হয়। কিন্তু পত্রিকার তদানীন্তন পরিচালক ও মালিক মহেন্দ্রকুমার বহু পরে জরিমানার অর্থ আদালতে জমা দিয়া দেন। এই উপলক্ষে ইংরাজ সরকার ‘বঙ্গবাসী’ পত্রিকার উপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করেন। তাঁহাকে ঐ মাসের বেতন হইতে বঞ্চিত করা হয়। এই ঘটনায় হরিমোহন মর্মান্তিক ক্ষুব্ধ হন এবং বঙ্গবাসী সম্পাদনার কর্তব্য হইতে পদত্যাগ করেন। এই বৎসরের ভাদ্র মাসে জন্মটিমৌ উপলক্ষে হরিমোহনের প্রসিদ্ধ কবিতা ‘কারাগার’ বঙ্গবাসীতে প্রব্রূহ হয়। কবিতাটির প্রথম লাইনে ছিল, “জন্ম তোবার কারাগারে, তাই কারাগার বাস ভাল।” শেষের লাইনে ছিল “কারার নামে কি যে ভয়, ভেনেছি তা দহাময়।” বঙ্গবাসীর কর্ম জীবনে হরিমোহন সাহিত্য গবেষক, গ্রন্থ সম্পাদক এবং খ্যাতি মান লেখক রূপে নিজেই প্রতিষ্ঠিত করিবার স্বযোগ লাভ করেন। এই সৌভাগ্যের জন্য তিনি ‘বঙ্গবাসী’র প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রচন্দ্র বহু ও তৎপুত্র বরদাপ্রসাদ বহুর উদ্দেশে একাধিক ক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। একস্থলে তিনি লিখিয়াছেন—বঙ্গবাসীর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বহু মহাশয়ের রূপায় আমার যে সাহিত্য শিক্ষা আরম্ভ, আজ সেই শিক্ষারই ক্ষুদ্র ফলে তৎপুত্র শ্রীমান বরদাপ্রসাদকে যে আমি কিছু পরিমাণেও তৃপ্ত করিতে পারিয়াছি, ইহা অপেক্ষা আমার পক্ষে আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে?”^{১১} অগ্রজ বঙ্গবাসীর অগ্রভ্রম সম্পাদক রায় সাহেব বিহারীলাল সরকারকে তিনি তাঁহার সাহিত্য গুরুরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।^{১২} হরিমোহন বঙ্গবাসীর পৃষ্ঠায় কবিতা, গান, প্রবন্ধ, রসরচনা, সংবাদ অল্পবদ্ধ প্রভৃতি আমৃত্যু ভূরি ভূরি লিখিয়াছেন। এ যুগে তাঁহার পরিমাণ সম্ভব নহে। মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্বে ও তিনি ‘বঙ্গবাসী’র গ্রন্থ সংবাদ ও গান পাঠাইয়াছিলেন। তৎকালীন সম্পাদক শ্রীহরিনাথ ভট্টাচার্য বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে একখানি পত্রে লিখিতেছেন—“আপনার পত্র পাইয়াছি এবং গান ও সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।”^{১৩} বস্তুতঃ বঙ্গবাসীর সেবার নিম্নুক্ত থাকিয়া, বঙ্গবাসীর আদর্শে উজ্জীবিত হইয়া, বঙ্গবাসীর সম্পাদক পদে উন্নীত

১১। হরিমোহন মুখোপাধ্যায়। ভ্রমহরি সন্দর্ভ (১৩১৪), নিবেদন।

১২। আমার সাহিত্য গুরু,—প্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার, বঙ্গভাষার লেখক (১৩১১), ভূমিকা।

১৩। হরিমোহনের বাসভবনে রক্ষিত বঙ্গবাসী সম্পাদক শ্রীহরিনাথ ভট্টাচার্যের ৯ চৈত্র; ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের পত্র।

হইয়া হরিমোহন বাঙলা সাহিত্য সমাজে সুপরিচিত হইয়াছিলেন। সে অল্পই ‘বঙ্গবাসী’ পত্র সম্পাদন হরিমোহনের সাহিত্য সেবক জীবনে এক ত্র্যাপর্ষময় অধ্যায়। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী দরবারের সময় বঙ্গবাসীর সভাপ্রকারী পরলোকগত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের সহযোগিতাপ্রাপ্তে হরিমোহন দিল্লী গিয়াছিলেন।

মৃত্যু

প্রৌঢ়াবস্থায় হরিমোহন বিপত্তীক হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবিতাবস্থাতেই দুই পুত্র—চারি কন্যা গত হইয়াছিল। দুই জামাতা ও পরলোক গমন করেন। রোগ-শোক দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ সকলই হরিমোহন নীরবে সহ্য করিয়াছিলেন; কোন কিছুই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ৩ মাঘ, শনিবার (১৭ই জাহ্নঘারী, ১৯৪২) তারিখে ৭৬ বৎসর বয়সে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন।

গ্রন্থাবলী

হরিমোহন রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থাদির মধ্যে যেগুলির সন্ধান পাইয়াছি নিম্নে তাহার কালানুক্রমিক তালিকা প্রদত্ত হইল।

- ১। সঙ্গীতসার সংগ্রহ। প্রথম খণ্ড। সম্পা. (বঙ্গবাসী, ১৩০৬)
[বিদ্যাপতি হইতে প্রেমদাস মোট ১২ জন কবির সঙ্গীত সংকলিত হইয়াছে]
- ২। সঙ্গীত সার-সংগ্রহ। দ্বিতীয় খণ্ড। সম্পা. (বঙ্গবাসী ১৩০৬)
[জয়দেব হইতে পরবর্তী একশতাধিক কবির সঙ্গীত সংকলিত হইয়াছে]
- ৩। সঙ্গীত-তরঙ্গ। ঙ্রাধামোহন দাস। সম্পা. (বঙ্গবাসী ১৩১০)
[অবতরণিকায় গ্রন্থের পরিচয়, গ্রন্থের কবিত্ব। সম্পাদন প্রণালী, গ্রন্থকারের গুণ পরিচয়, প্রভৃতি ১২ পৃষ্ঠার আলোচনা]
- ৪। বঙ্গভাষার লেখক। সম্পা. ১ম ভাগ (বঙ্গবাসী ১৩১১) [৪ পৃষ্ঠার ভূমিকা]
- ৫। ভক্তধরি সর্দার (আখ্যান, বঙ্গবাসী ১৩১৪)
- ৬। নকুড়বাবু (নক্সা-১৩১৬) পত্রপতি প্রেস
- ৭। গোপাল উড্ডের টপ্পা অর্থাৎ বিজ্ঞানন্দর যাত্রার গান (বঙ্গবাসী ১৩১৭)
[ভূমিকা ৩ পৃষ্ঠা]
- ৮। দাশরথিয়ারের পাঁচালী। ৪র্থ সং, সম্পা. (বঙ্গবাসী ১৩৩১)
[প্রস্তাবনা ১০ পৃষ্ঠা, অভিযন্ত সংগ্রহ ১০ পৃষ্ঠা, সমালোচনা ২৮ পৃষ্ঠা, দাশরথি য়ার জীবনী ১২ পৃষ্ঠা]
- ৯। শিবাজীর ভবানী পূজা, কাব্য-নাটক (?)
- ১০। বদৈশী সামগ্রী, গুপ্তপ্রের (?)
- ১১। সঙ্গীত লহরী (অপ্রকাশিত)
- ১২। খ্রীষ্টীয়তানারায়ণ ব্রতকথা (অপ্রকাশিত)
- ১৩। ন'কড়ির মা (বড় গল্প) অপ্রকাশিত

[ক্রমশঃ]

হাড়মাসড়া গ্রামে প্রাপ্ত প্রাচীন মূর্তি

শ্রীমদনমোহন কুমার

বাঁকুড়া শহর থেকে প্রায় ২০০ মাইল (৩১ কিলোমিটারের কিছু বেশি) দূরে হাড়মাসড়া গ্রাম। তালডাংরা থানার পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত এই গ্রামটি সুপ্রাচীন। গ্রামটিতে জৈন ধর্মের কয়েকটি পুরাকীর্তি ইতিপূর্বে আবিষ্কৃত হয়েছে। মাকুড়া পাথরে তৈরি উড়িষ্যা শৈলীর পঞ্চরথ ও শিখরদেউল এবং প্রস্তরনির্মিত পার্শ্বনাথ মূর্তি বহুদিন পূর্বেই আবিষ্কৃত হয়ে পুরাতত্ত্ববিদদের দৃষ্টি-এই গ্রামটি আকর্ষণ করেছে। পার্শ্বনাথ মূর্তিটি ঐ গ্রামের একটি পুকুর থেকে একদা পাওয়া গিয়েছিল। বাঁকুড়া ডিসট্রিক্ট গেজেটিয়ারে ও শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঁকুড়ার মন্দির' গ্রন্থে এই গ্রামটির কয়েকটি পুরাকীর্তি উল্লিখিত হয়েছে। পুরুলিয়া জেলা থেকে শিলাবতী নদী-বাহিত পথে জৈন সংস্কৃতি শিলাবতীর উত্তরে হাড়মাসড়া গ্রামে প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল এবং হাড়মাসড়া একদা জৈন ধর্ম-কেন্দ্ররূপে প্রাচীন বঙ্গভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। পরবর্তীকালে জৈন-ধর্মের প্রভাব ক্ষীয়মাণ হলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শাক্ত ও ঐশ্বর্য মূর্তির পূজা ও মন্দির অন্যান্য অঞ্চলের মত এখানেও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। হাড়মাসড়া গ্রামে বিভিন্ন সম্পন্ন অভিজাত গৃহস্থ পরিবারে পোড়ামাটির কাজ করা (Terracotta) ইঁটের অনেকগুলি মন্দির নির্মিত হয়। খ্রীশ্রীসম্মীজনাদিনের একাধিক মন্দির, নবরত্ন রাসমঞ্চ ও পঞ্চরত্ন মন্দিরে বৈষ্ণব বিগ্রহ পরবর্তীকালে গ্রামটিতে বৈষ্ণব প্রভাব সূচিত করে।

১৩৮১ বঙ্গাব্দের চৈত্রমাসে (১৯৭৫, মার্চ) বাঁকুড়া জেলায় থরায় জন্য সরকারী টেস্ট রিলিফের কাজের সময় হাড়মাসড়া গ্রামে পুরাতন মজা পুকুরিণী সংস্কারের কাজ শুরু হয়। সেই সময় 'খোঁড়া' নামক একটি পুকুরিণী খনন কালে কয়েকটি প্রস্তরমূর্তি পাওয়া যায়। পুকুরিণীটির এক পাশে সেচের খাল (canal) ও অপর দুই পাশে চাষের জমি, আর এক পাশে কাঁকুরে মাটির জমি, এই জমি অন্য তিন দিকের জমি থেকে বেশ একটু উঁচু। ঐ গ্রামে ইতিপূর্বে আরও দুই তিনটি বৃহদাকার প্রাচীন মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল, সেগুলির মধ্যে একটি জৈনমূর্তি স্থানীয় গ্রামবাসীরা বহুকাল ধরে 'খাঁদেখরী' নামে পূজা করে আসছে।

"খোঁড়া" পুকুরিণী সংস্কারের জন্য খননকালে ১৩৮১ বঙ্গাব্দের চৈত্রমাসে একটি চতুর্ভুজা সিংহবাহিনী শক্তিমূর্তি, একটি ক্ষত্রকায় প্রস্তরনির্মিত পদ্মলক্ষ্মীমূর্তি, একটি ধাতুমূর্তা ও

সীলমোহর পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে চতুর্ভুজা সিংহবাহিনী মূর্তিটি হাড়মাসড়া গ্রামের প্রাচীন রায়-পরিবারের শ্রীপ্রভুলকুমার রায়, শ্রীসোমনাথ রায়, শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায় ২ টি চৈত্র ১৩৮১ (১৩ ই মার্চ, ১৯৭৫) তারিখে আমার হাতে অর্পণ করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আনীত এই নবাবিষ্কৃত মূর্তিটির সংবাদ আকাশবাণীর সংবাদে ও বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

২৯শে চৈত্র, ১৩৮১ (১২ ই এপ্রিল, ১৯৭৫) সাহিত্য পরিষৎ মিউজিয়ামের সংগঠক প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবতিতম জন্মবর্ষপূর্তি উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে অঙ্কুষ্ঠিত একটি সভায় ও প্রদর্শনীতে হাড়মাসড়া থেকে আনীত চতুর্ভুজা সিংহবাহিনী মূর্তিটি প্রদর্শিত হয় ও রাখালদাসের জন্মদিনে পরিষদের মিউজিয়ামে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। আচার্য্য শ্রীহীনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, আচার্য্য শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার প্রমুখ পণ্ডিত প্রদর্শনীতে মূর্তিটিকে পর্যবেক্ষণ করে ঐ সভায় মূর্তিটি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করেন। মূর্তিটি খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের ১৪২৫-এর কাছাকাছি সময়ের—বলে তাঁরা মনে করেন।

কষ্টিপাথরে নির্মিত এই চতুর্ভুজা সিংহবাহিনী মূর্তিটির ওজন সাড়ে পাঁচ কিলোগ্রাম উচ্চতা ২৮ সেন্টিমিটার (১০ ৩/৪" ইঞ্চি), প্রস্থ ১২ সেন্টিমিটার (৭ ১/৪" ইঞ্চি), বেধ ৫ সেন্টিমিটার (২ ১/৪" ইঞ্চি)। দেবীর বাহন সিংহটির মুণ্ড খানিকটা ঘোড়ার মূখের মত। বাঁকুড়ার পোড়ামাটির শিল্পে অতুল্যরূপ ঘোড়ামুখো সিংহ দেখা যায়। মূর্তিটি স্থানীয় শিল্পীর কৃতি সন্দেহ নেই।

পরিষৎ মন্দিরে এই মূর্তিটি আনীত হওয়ার কয়েকদিন পরে ১৮ ই চৈত্র, ১৩৮১ (১লা এপ্রিল, ১৯৭৫) হাড়মাসড়া গ্রামের শ্রীসোমনাথ রায়ের কাছে সংবাদ পাই যে, ঐ একই পুঙ্খনিপাতী খননকালে গজলক্ষ্মী মূর্তি, মূদ্রা, সীলমোহর ইত্যাদি পাওয়া গেছে এবং টেস্টরিলিফের খননকারীরা সেগুলি অনাজ্ঞ সরিয়ে ফেলছে। সংবাদ পেয়ে আমি ১লা এপ্রিল, ১৯৭৫ সন্ধ্যায়, সরকারী প্রচেষ্টায় ঐগুলি উদ্ধারের জন্য, পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপালের সচিবের গোচরে বিষয়টি আনি। ১লা এপ্রিল, ১৯৭৫ রাজিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সরাষ্ট্র বিভাগের বিশেষ সচিব (Special Secretary, Home Department), শ্রীবিধ্বজ মুখোপাধ্যায়, আই. এ. এস. মহাশয়ের বাড়ীতে তাঁর সঙ্গ-যোগাযোগ করি এবং তিনি সেট রাজিতে রেডিওগ্রাফ-যোগে বাঁকুড়ার জেলাশাসককে সরকারী নির্দেশ প্রেরণ করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদকরূপে আমি এ সম্বন্ধে সমস্ত বিবরণ জানিয়ে বাঁকুড়ার জেলাশাসক মহাশয়কে ১লা এপ্রিল, ১৯৭৫ রাজিতে একখানি চিঠি লিখি।

বাঁকুড়ার জেলাশাসক শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, আই. এ. এস তাঁর ৭ই এপ্রিল ১৯৭৫ তারিখের ডি. ও. নং ২৩৬২/জি. পত্রে জানান যে, আমার ১৪.৭৫ তারিখের পত্রে সমস্ত বিবরণ পেয়ে ৫ই এপ্রিল ১৯৭৫ তারিখে তিনি স্বয়ং হাড়মাসড়া গ্রামে

গিয়েছিলেন এবং সেখানকার সরকারী কর্মচারীদের ও স্থানীয় দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পেরেছেন যে, দুই জন খননকারী এই প্রত্নবস্তুগুলি নিয়ে গেছে ও তারা কার্যব্যপদেশে স্থানান্তরে চলে গেছে, তিনি এ বিষয়ে পুলিশকে অহুসন্ধানের আদেশ দিয়েছেন যাতে Indian Treasure Trove Act, 1878 আইন অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সুখের বিষয় জেলাশাসক মহাশয়ের আদেশ, তৎপরতা ও চেষ্টার ফলে এই স্থানে খননকালে প্রাপ্ত ও অপসারিত একটি গজলক্ষ্মী মূর্তি এবং শিববেদী উদ্ধার করে বাঁকুড়া ট্রেজারীতে আনীত হয় এবং জেলাশাসক মহাশয় তাঁর ১০ই জুন, ১৯৭৫ তারিখের মেমো নং ২০০৫(২)/১(৩) রেভঃ পত্রে আমাকে অহুস্ক্রহপূর্বক এ বিষয়ে সংবাদ দেন।

মুক্তা ও সীলমোহর উদ্ধার করা যায়নি, সম্ভবত সেগুলি গালিয়ে ধাতুমূলে্য বিক্রীত হয়েছে।

২০শে জুন, ১৯৭৫ তারিখে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে আমি বাঁকুড়ার জেলাশাসককে অহুরোধ করি, যেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বিষ্ণুপুর শাখার পঁচিশ বৎসর পুঁতি উপলক্ষে নবান্বিত ষ্টিতল গৃহে “আচার্য্য যোগেশচন্দ্র রায় পুরাকৃতি ভবনে” এই প্রত্ন-বস্তুগুলি দান করা হয়। সাহিত্য পরিষদের বিষ্ণুপুর শাখা গত পঁচিশ বৎসর ধরে প্রশংসনীয় কাজ করছে, রাতভূম ও মল্লভূমের, বিশেষ করে বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন পুরাকৃতি, প্রত্নবস্তু, প্রাচীন শিল্পসামগ্রী সেখানে সংগৃহীত হয়েছে। এ বিষয়ে পাশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমিরাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী শ্রীগুরুপদ থাকে ও পশ্চিমবঙ্গের পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধিকর্তাকে বাঁকুড়া ট্রেজারীতে আনীত ও রক্ষিত গজলক্ষ্মী ও শিববেদীটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিষ্ণুপুর শাখার মিউজিয়ামে দেওয়ার জন্ত অহুরোধ করি। পরিষদের বিষ্ণুপুর শাখার উৎসাহী সম্পাদক শ্রীমানিকলাল সিংহকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ও সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে “আচার্য্য যোগেশচন্দ্র রায় পুরাকৃতি ভবনে” এই প্রত্নবস্তু দুটি স্থানীয় ও সেখানে সংরক্ষণ করার জন্ত অহুরোধ করেছি। :-

বঙ্গের প্রত্যেক জেলার পুরাকীর্তি ও প্রত্নবস্তুগুলি নিজ নিজ জেলার স্থানীয় মিউজিয়ামে ও সংগ্রহশালায় রক্ষিত হলে স্থানীয় অধিবাসীদের আঞ্চলিক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সজ্জে অবহিত করা ও কৌতুহলী করা সম্ভব হবে বলে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মনে করেন এবং এই জন্তই বঙ্গের ও বঙ্গের বাহিরে শাখা-পরিষৎ স্থাপনের পরিকল্পনা পরিষদের পূর্বসূরীরা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের সেই স্বপ্ন ও কল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হোক, বঙ্গভূমির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রক্ষার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ অগ্রণী হোক।

হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায়

বৌদ্ধগান ও দোহা

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক আবিষ্কৃত ও সম্পাদিত

বাঙ্গালা ভাষায় প্রাচীনতম নিদর্শন, খ্রীষ্টীয় দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর ২৪ জন প্রাচীনতম বাঙ্গালী কবির বঙ্গভাষায় রচিত প্রাচীনতম কবিতা-সংগ্রহ, শৌরসেনী অপভ্রংশে রচিত সরোজবজ্রের দোহাকোষ ও কৃষ্ণাচার্য্যের দোহাকোষ ও অবহটে রচিত 'ডাকার্ণব'; নেপাল রাজদরবার হইতে আবিষ্কৃত চারিখানি প্রাচীন পুঁথির সংগ্রহ।

মূল্য পনের টাকা

পণ্ডিত সত্যীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত

শ্রীশ্রীপদকম্পতরু

বৈষ্ণব পদাবলীর বৃহত্তম আকরগ্রন্থ। পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ।

দ্বিতীয় সংস্করণ (যন্ত্রস্থ)

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা

১ম হইতে ১১শ খণ্ড

সাহিত্যিক-জীবনী ও প্রামাণ্য গ্রন্থসূচী

মূল্য : ১২৫'০০

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

২৪৩/১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,

কলিকাতা-৬

ফোন : ৩৫-৩৭৪৩

বাঙালী জাতির সারস্বত-সাধনার পীঠভূমী
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের দ্ব্যশীতিতম
বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে আমাদের
সহযোগিতা ও শুভেচ্ছা জানাই

ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০ ০১২

শ্রীমদনমোহন কুমার, সম্পাদক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত।
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও, ৭২-১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে
অভিযোজন ও প্রণয়ন কর্তৃক মুদ্রিত।

